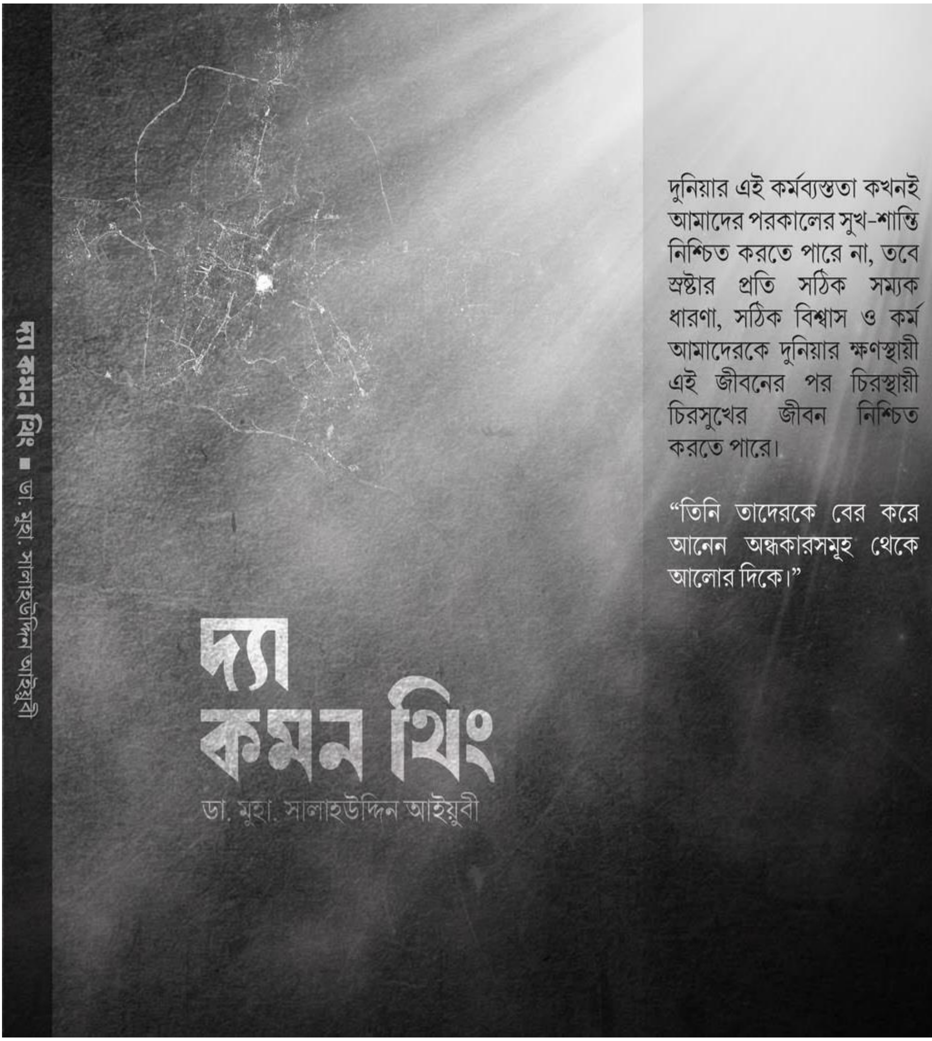
দ্যা কমন থিং ■ ডা. মুহা. সালাহউদ্দিন আইয়ুবী
দুনিয়ার এই কর্মব্যস্ততা কখনই আমাদের পরকালের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতে পারে না, তবে স্রষ্টার প্রতি সঠিক সম্যক ধারণা, সঠিক বিশ্বাস ও কর্ম আমাদেরকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের পর চিরস্থায়ী চিরসুখের জীবন নিশ্চিত করতে পারে।
“তিনি তাদেরকে বের করে আনেন অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে।”
দ্যা
কমন থিং
ডা. মুহা. সালাহউদ্দিন আইয়ুবী

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে কিছু কথা আজও হুবহু এক রয়ে গেছে।

কি সেই কথা?

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে একজন শেষ নবীর ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে।

কে সেই সর্বশেষ নবী?

“দ্যা কমন থিং”

সংকলক

ডা. মুহাঃ সালাহউদ্দিন আইয়ুবী

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ ইব্রাহীম

কৃষিবিদ তানভীর কবির

প্রারম্ভিক

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব, যার শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এসেছে।

যে স্রষ্টা আমাদেরকে সৃষ্টি করে মায়ের গর্ভ থেকে অতি যত্নে দুনিয়াতে নিয়ে এসেছেন, চলাফেরার, কথা বলার, খাবারের স্বাদ গ্রহণ করার সামর্থ্য দিয়েছেন। যে স্রষ্টা আমাদেরকে সুন্দর একটি পরিবার দিয়েছেন, যেখানে আমরা পরম যত্নে লালিত-পালিত হয়েছি। যে স্রষ্টা আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, যে দুনিয়া ছেড়ে আমরা আবার তার কাছেই ফিরো যাবো, সেই স্রষ্টার ব্যাপারে আমাদের সম্যক ধারণা থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা থেকেই আমার এই বইটি। কারণ স্রষ্টাকে জানার মাঝেই তার সন্তুষ্টি।

আমার বিশ্বাস, এই বইটি আমাদেরকে সকল ধর্মগ্রন্থের আলোকে স্রষ্টার ব্যাপারে কিছু সুস্পষ্ট ধারণা দিবে, যেগুলোকে পুঁজি করে আমরা জীবনের অন্তিম মুহূর্তে স্রষ্টার নিকট তার সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যেতে পারবো।

দুনিয়ার এই কর্মব্যস্ততা কখনই আমাদের পরকালের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতে পারে না, তবে স্রষ্টার প্রতি সঠিক সম্যক ধারণা, সঠিক বিশ্বাস ও কর্ম আমাদেরকে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী এই জীবনের পর চিরস্থায়ী চিরসুখের জীবন নিশ্চিত করতে পারে।

সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। তার অশেষ করুণায় দীর্ঘ সময়ের শ্রম ও প্রতীক্ষার পর অবশেষে বইটি পূর্ণতা পেল।

আমার বিশ্বাস আমার এই নগণ্য গবেষণা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার বাণীর নিকটবর্তী হতে মানবজাতিকে সাহায্য করবে। আমি দোয়া করি এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মহান স্রষ্টা তার দরবারে কবুল করুন এবং একে আমার পিতামাতা এবং আমার পরিবারের, পাঠকদের এবং সকল শুভাকাঙ্খীর নাজাতের ওসিলা করে দিন।

সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা তারই জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের রব।

-ডা. মুহাঃ সালাহউদ্দিন আইয়ুবী

সংকলক

দ্যা কমন থিং

সূচিপত্র

- অন্বেষণ

১। ধর্মগ্রন্থগুলোতে সৃষ্টিকর্তার ধারণা

- ইসলাম ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার ধারণা
- হিন্দু ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার ধারণা
- শিখ ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার ধারণা
- জরথুস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার ধারণা
- ইয়াহুদী ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার ধারণা
- খ্রিষ্ট ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার ধারণা

২। ধর্মগ্রন্থগুলোতে সর্বশেষ নবীর ভবিষ্যৎবাণী

- হিন্দু ধর্মগ্রন্থে অন্তিম অবতারের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী
- জরথুস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থে সর্বশেষ নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী
- বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে সর্বশেষ নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী
- প্রচলিত যাবুর শরীফে সর্বশেষ নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী
- ইহুদী (ইয়াহুদী) ও খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থে সর্বশেষ নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী

৩। কুরআনের আলোকে আধুনিক বিজ্ঞানকে পর্যালোচনা

১। মানব সৃষ্টির রহস্য

২। তিনটি পর্দার অভ্যন্তরে সুরক্ষিত ভ্রূণ

৩। মেরুদন্ড ও পাঁজরের মধ্য থেকে নির্গত তরল পদার্থ

৪। সৃষ্টির রহস্য ও পানি

৫। মাটি থেকে মানুষের সৃষ্টি
৬। দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি- কোনটি আগে?
৭। মহাবিশ্বের আদি অবস্থা
৮। বিগব্যাং (মহাবিস্ফোরণ)
৯। সূর্যের নিজস্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ
১০। সম্প্রসারণশীল বিশ্বজগৎ
১১। পৃথিবীর আকৃতি
১২। সমুদ্রের গভীরে অন্ধকার
১৩। পিপীলিকার জীবন প্রণালী
১৪। মৌমাছির জীবনপ্রণালী
১৫। পাখিদের ভাষা
১৬। পিঁপড়া কাচের তৈরি
১৭। রহস্যময় মাছি
১৮। উচ্চতায় শ্বাসকষ্ট
১৯। পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা
২০। ফিঙ্গার প্রিন্ট (Finger Print)
২১। বেদনা গ্রাহী ইন্দ্রিয় (Pain Receptor)
২২। মিথ্যাচারী, পাপী কেশগুচ্ছ
২৩। লোহার রহস্য
২৪। ব্ল্যাকহোল (Black Hole)
২৫। চাঁদের আলোর রহস্য
২৬। সমুদ্রের পানির রহস্য
২৭। থিওরী অফ রিলেটিভিটি
২৮। গবাদিপশুর দুধ উৎপন্ন হওয়ার রহস্য
২৯। পানি চক্র

৩০। পর্বতের গঠন ও কাজ

৩১। আকাশ নিরাপত্তার ছাদ

৩২। ভূমির সাতটি স্তর

৩৩। গাছের লিঙ্গ

৩৪। গর্ভদানকারী বাতাস

৩৫। গাছের নিঃশ্বাস (ফটোসিনথেসিস)

৩৬। ইরাম শহরের রহস্য

৩৭। মহাশূন্য বিজয়

৩৮। এলিয়েনের ব্যাপারে কুরআনের ব্যাখ্যা

৩৯। ফিরআউন

৪। হিন্দুধর্মগ্রন্থ: আত্মজিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা

- হিন্দু ধর্মগ্রন্থের আলোকে দেবদেবী পূজা
- হিন্দু ধর্মগ্রন্থে জন্মান্তর ও কর্মফল

৫। খ্রিষ্টধর্মগ্রন্থ: আত্মজিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা

- **বিবেকের কাঠগড়ায় খ্রিষ্ট ধর্মগ্রন্থ**

১। পবিত্র বাইবেল; পরিচিতি

২। খ্রিষ্ট ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়

৩। আল্লাহর সঙ্গে শরীক করার পরিণতি

৪। স্রষ্টার কোনো তুলনা নেই

৫। ঈসার ঈশ্বরত্বের প্রমাণ কি?

৬। ঈসা মসীহ আল্লাহর বান্দা ও নবী ছিলেন

৭। ঈসা আল্লাহর গোলাম ছিলেন

- **খ্রিষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদখণ্ডন**

ভূমিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ: যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদির মাধ্যমে ত্রিত্ববাদ খণ্ডন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: খ্রিষ্টের বাক্যের দ্বারা ত্রিত্ববাদ খণ্ডন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বের পক্ষে পেশকৃত বাক্যাবলীর অসারতা প্রমাণ

৬। ইসলাম ধর্মগ্রন্থ: আত্মজিজ্ঞাসা ও পর্যালোচনা

- **কিছু সংশয় ও তার নিরসন**

  ১। মাযহাব কী এবং কেন।

  ২। ইসলামী শরীয়তে জিহাদ।

  ৩। ইসলামী শরীয়তে দাসপ্রথা।

  ৪। স্ত্রীগণ শষ্যক্ষেত্র- সর্বোত্তম উপমা না মর্যাদাহানি?

  ৫। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অমুসলিমদের কাছ থেকে জিযিয়া।

  ৬। উম্মুল মুমিনিন

- **শালীন, সুশৃঙ্খল ও ভারসাম্যপূর্ণ একটি সমাজ বিনির্মাণ**

  ১। ইসলামী শরীয়তে পর্দার বিধান।

  ২। ইসলামে পিতামাতার মর্যাদা।

  ৩। ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা।

  ৪। ইসলামী শরীয়তে শাস্তির বিধান।

  ৫। বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ।

৭। কুরআনুল কারীমে ইবরাহীম (আ.) ও তার প্রত্যাবর্তন।

৮। ইসলাম মানবতার ধর্ম- ‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, তোমরা সবাই মুক্ত’।

কোন এক বেদুঈনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: 'স্রষ্টা যে আছে তার প্রমাণ কি?' সে উত্তরে বলেছিল, 'উটের বিষ্ঠা দেখে উট আছে এর প্রমাণ পাওয়া যায়, পায়ের চিহ্ন দেখে পথিকের পথ চলার প্রমাণ পাওয়া যায়; তাহলে এই যে বড় বড় নক্ষত্র বিশিষ্ট আকাশ, বহু পথ বিশিষ্ট যমীন, বড় বড় ঢেউ বিশিষ্ট সমুদ্র কি সেই মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়না?

(আর রাযী ২/৯১)

অন্বেষণ

আপনি কি মনে করেন, যে স্রষ্টা সমগ্র মানবজাতি, সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তার উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে হতে পারে?

যে স্রষ্টার সৃষ্টি এতো সুশৃঙ্খল সে স্রষ্টার উপাসনার বা ইবাদাতের ধরণ কিভাবে এতো বিক্ষিপ্ত, এতো বিশৃঙ্খল হতে পারে!

নিঃসন্দেহে কোন এক ধর্মের অনুসারীরা সত্যপথে আছে। আসুন, সত্য অনুসন্ধানী একটি নিরহংকার ও নিরপেক্ষ হৃদয় নিয়ে একটু বিশ্লেষণমূলক যাচাই করে দেখার চেষ্টা করি।

প্রথমেই দেখা যাক, ধর্ম গ্রন্থগুলোতে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কিরূপ ধারণা উল্লেখ রয়েছে-

(আমরা কোনো ধর্মকে বিচার করি ঐ ধর্মের অনুসারীদের দ্বারা।

আসলেই কি তাই?

কোনো ধর্মকে জানতে হবে ধর্মগ্রন্থের ভিত্তিতে। সেই ধর্মের অনুসারীদেরকে দিয়ে নয়।)

❐ ধর্মগ্রন্থগুলোতে সৃষ্টিকর্তার ধারণা

ইসলাম ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার ধারণা

কোনো ধর্মকে বোঝার সবথেকে উপযুক্ত পন্থা হল, সেই ধর্মের মূল উৎসগুলোকে জানা অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থগুলোকে জানা। সেরূপ ইসলামকে বোঝার সবচেয়ে উপযুক্ত পন্থা হল, ইসলামের মূল উৎস অর্থাৎ পবিত্র কুরআন (সৃষ্টিকর্তার বাণী) সম্পর্কে জানা।

পবিত্র কুরআনে (১১২ নং) সূরা ইখলাসের ১ থেকে ৪ নং আয়াতে আছে,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

অর্থ: বলো, তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ

অর্থ: আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ

অর্থ: তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থ: আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।

কুরআনে আরও রয়েছে,

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

অর্থ: এটা মানুষদের জন্য একটি বার্তা। আর যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, নিশ্চয়ই তিনি একমাত্র ইলাহ, আর যেন বোধশক্তিসম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা ইবরাহিম, আয়াত: ৫২)

قُلْ اِنَّمَآ اَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا.

অর্থ: বলো, 'আর তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ।' অতএব, যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরিক না করে। (সূরা আল-কাহ্ফ, আয়াত: ১১০)

وَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ.

অর্থ: আর তোমাদের ইলাহ্ই একমাত্র ইলাহ। তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময়, অসীম দয়ালু। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৬৩)

اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ.

অর্থ: নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক। (সূরা আস্-সাফ্ফাত, আয়াত: ৪)

قُلْ اِنَّمَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ج فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

অর্থ: (হে নবী) বলো, 'আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে?' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৮)

اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَط وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا.

অর্থ: নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ একমাত্র আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। সকল বিষয়েই তাঁর জ্ঞান পরিব্যাপ্ত। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৯৮)

لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ج فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.

অর্থ: যদি আসমান-যমিন এই দুয়ের মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্য থাকত, তবে উভয়টি ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব, তারা যা বলে, আরশের অধিপতি আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২২)

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ.

অর্থ: আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোনো ইলাহ নেই। যদি থাকত, তবে অবশ্যই প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা আরোপ করে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। (সূরা আল মু'মিনুন, আয়াত: ৯১)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ.

অর্থ: তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, অতি পবিত্র, শান্তিদাতা, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত। তারা যা শরীক করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান। (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ২৩)

الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا. وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً لَّا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا.

অর্থ: যিনি আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, এবং তাঁর রাজত্বে কোনো অংশীদার নেই। তিনি

সৃষ্টি করেছেন সমস্ত কিছু, অতঃপর তা পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে। আর তারা গ্রহণ করেছে, তাঁর পরিবর্তে কত ইলাহ, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না; বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তারা ক্ষমতা রাখে না, নিজেদের ক্ষতি বা উপকার করার এবং ক্ষমতা রাখে না মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানের উপর। (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ২-৩)

فَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَلَهٗٓ اَسْلِمُوْا ط وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ.

অর্থ: তোমাদের ইলাহ তো একমাত্র ইলাহ; সুতরাং তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করো এবং সুসংবাদ দাও বিনীতদেরকে। (সূরা আল হাজ্জ, আয়াত: ৩৪)

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ

হিন্দুধর্ম পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মসমূহের অন্যতম। হিন্দুধর্মের প্রাচীন নাম সনাতনধর্ম। হিন্দুধর্মকে বৈদিক ধর্মও বলা হয়। কারণ বেদ হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি।

হিন্দুধর্মে দুই ধরনের গ্রন্থ রয়েছে- শ্রুতি ও স্মৃতি।

শ্রুতি হচ্ছে যেটা প্রকাশিত হয়েছে, যেটা সবাই বুঝতে পেরেছে, যেটা মানুষ শুনেছে। হিন্দু বিশেষজ্ঞদের মতে, শ্রুতি হলো ঈশ্বরের বাণী। এটি হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র ও প্রাচীন।

শ্রুতি দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত- বেদ ও উপনিষদ।

বেদ এসেছে সংস্কৃত শব্দ 'বিদ' থেকে যার অর্থ 'জানা'। বেদ শব্দটির অর্থ হল 'জ্ঞান'। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে বেদকে সবচেয়ে শুদ্ধতম ও পবিত্র গ্রন্থ বলে বিবেচনা করা হয়। কোন হিন্দুধর্মগ্রন্থই বেদকে বাতিল করে না। হিন্দু পণ্ডিতদের মতে, বেদ ও অন্যান্য হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে যদি কোনো বৈপরীত্য দেখা দেয় তাহলে বেদের মত-ই গ্রহণ করা হবে। তাদের মতে, "হিন্দুধর্ম" কে বলা উচিত 'সনাতনধর্ম' যার অর্থ চিরন্তনধর্ম অথবা 'বৈদিকধর্ম' অর্থাৎ বেদের ধর্ম। একে প্রাচীনকালে আর্যধর্মও বলা হতো। স্বামী বিবেকানন্দের মতে, এই ধর্মের অনুসারীদের 'বেদানুসারী' বলে পরিচয় দেওয়া উচিত।

বেদ প্রধানত চার প্রকার– ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ।

উপনিষদ বলা হয়- বৈদিক যুগের অন্তিম পর্যায়ে রচিত রচনাবলিকে। (পৌরাণিক অভিধান: ৬৮)

উপনিষদ এসেছে সংস্কৃত শব্দ থেকে। উপা অর্থ কাছে, নি অর্থ নিচে এবং ষদ অর্থ বসা। অর্থাৎ 'কাছে এসে বসা'। একসময় একদল শিষ্য গুরুর কাছ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য গুরুর নিকট বসে থাকতো। এটাকে বলা হয় উপনিষদ।

পৃথিবীতে দু'শোর বেশি উপনিষদ রয়েছে। তবে হিন্দুরীতি বলে এর সংখ্যা হল একশ আট। এগুলোর মধ্যে কিছু উপনিষদকে প্রধান উপনিষদ বলা

হয়েছে। কেউ বলে প্রধান উপনিষদ দশটি, কেউ বলে বারোটি। প্রধান ১২টি উপনিষদ প্রাচীন বলে গণ্য হয়। ১. ঐতরেয় ২. কৌষীতকি ৩. ছান্দোগ্য ৪. কেন ৫. তৈত্তিরীয় ৬. কঠ ৭. শ্বেতাশ্বতর ৮. বৃহদারন্যক ৯. ঈশ ১০. প্রশ্ন ১১. মুন্ডক ১২. মাণ্ডুক্য উপনিষদ।

অপরদিকে স্মৃতি অর্থ- 'যা মনে রাখা হয়'। হিন্দু বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই স্মৃতি নামক গ্রন্থগুলো মানুষ লিখেছে অর্থাৎ ঋষিরা এবং এটাকে ঈশ্বরের বাণী হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। আর এর অবস্থান শ্রুতির পরে। স্মৃতি; ব্যক্তির, সম্প্রদায়ের ও সমাজের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠা করে, যা তাদের প্রাত্যহিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এগুলো ধর্মশাস্ত্র নামেও পরিচিত।
স্মৃতির মধ্যে পুরাণ ও ইতিহাস (মহাকাব্য) সহ বিভিন্ন ধরনের লেখা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হিন্দুধর্মের দুটি ইতিহাস বা মহাকাব্য রয়েছে- একটি হলো রামায়ণ এবং আরেকটি হলো মহাভারত।

রামায়ণ একটি মহাকাব্য যা রামের জীবন গাঁথা বর্ণনা করে।

মহাভারত আরেকটি মহাকাব্য যেখানে কৃষ্ণের জীবন কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে।

পুরাণ শব্দের অর্থ হলো 'প্রাচীন'। পুরাণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ইতিহাস ও হিন্দু দেব-দেবীদের জীবন ইতিহাস রয়েছে। বেদের মতোই পুরাণ ঈশ্বরের অবতীর্ণ গ্রন্থ বলে বিবেচিত, যেগুলো বেদের সাথে একই সময়ে বা কাছাকাছি সময়ে এসেছে।

পুরাণ প্রধানত ২ ভাগে বিভক্ত – মহাপুরাণ ও উপপুরাণ

মহাপুরাণ ১৮টি। যথা: ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড।

উপপুরাণের সংখ্যাও ১৮টি। যথা: সনৎকুমার, নর-সিংহ, নারদীয়, শিব, দুর্বাসা, কপিল, মানব, ঔষনস, বরুণ, কালিকা, শাম্ব, নন্দী, সৌর, পরাশর, আদিত্য, মহেশ্বর, ভগবত ও বশিষ্ট। (পৌরানিক অভিধান: পৃ-৩০১)

পুরাণগুলোর মধ্যে প্রধান গ্রন্থটি হলো 'ভবিষ্যপুরাণ'। এটিকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয় কারণ এতে ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে পূর্বাভাস রয়েছে। ভবিষ্য পুরাণকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের বাণী হিসেবে মনে করেন।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে **ভাগবতগীতা** সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সুপরিচিত গ্রন্থ। ভাগবতগীতা বা শ্রীমদ্ভাগবদগীতা বা গীতা একটি ৭০০ শ্লোকের ধর্মগ্রন্থ। এটি মহাকাব্য মহাভারতের একটি অংশ।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার ধারণা

এবার জানা যাক, হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কিরূপ ধারণা দেওয়া হয়েছে-

বেদঃ
হিন্দুধর্মের সকল গ্রন্থের মধ্যে বেদকেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হিসেবে ধরা হয়। বেদ প্রধানত চার প্রকার। যেমন- ১. ঋগবেদ ২. সামবেদ ৩. যজুর্বেদ ৪. অথর্ববেদ।

ঋগবেদঃ
সকল বেদের মধ্যে প্রাচীনতম হলো 'ঋগবেদ', হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এটাকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করে। লক্ষণীয়-

১. "জ্ঞানীরা **এক স্রষ্টাকে** বিভিন্ন নামে ডাকে"। (ঋগবেদ- মণ্ডল ১, সূক্ত ১৬৪, মন্ত্র ৪৬)

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ४६ ॥

Indraṁ mitraṁ varuṇam-agnim-āhuratho divyaḥ sa suparṇo garutmān. Ekaṁ sad viprā bahudhā vadantyagniṁ yamaṁ mātariśvānam-āhuḥ.

"Reality is one, Truth is one, Ishvara is one and only One, not more than one. The learned and the wise speak of It in many ways."

(RIGVEDA-English translation by Dr. Tulsi Ram M.A., Ph.D. London, U.K.)

২. "জ্ঞানী সন্যাসীরা তাদের মন ও চিন্তা-ভাবনাকে সেই সুমহান সত্যের প্রতি নিয়োগ করে, যা সর্বব্যাপী, মহান ও সর্বজ্ঞ। তিনি **একক**, সবকিছুর কার্যকলাপ জানেন, সবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজের প্রতি চালনা করেন, সত্যিই তিনি সর্বশক্তিমান স্রষ্টা।" (ঋগবেদ- মণ্ডল ৫, সূক্ত ৮১; ঋগবেদ সংহিতি ভলিউম-৬, পৃ: ১৮০২ ও ১৮০৩ স্বমী সত্য প্রকাশ স্বরস্বতী সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার)

৩. 'যিনি সবকিছুর স্রষ্টা, কারো কাছ থেকে জন্ম নেননি, তিনি **এক**'। (ঋগ্বেদ- মণ্ডল ১, সূক্ত ১৬৪, মন্ত্র ৬; রমেশ চন্দ্র দত্ত, তথাগত থেকে পুনর্মুদ্রন ২০১৮)

৪. 'যিনি প্রকৃত স্রষ্টা, তিনি দেবগণের ও সবকিছুর উপরে। যিনি দ্যুলোক ও ভূলোকেরও উপরে আছেন, যিনি দ্যুলোক ও ভূলোক ধারণ করেন, যিনি অন্নের প্রভু ও প্রজার সৃষ্টিকর্তা, যিনি সূর্যের আকাশ পরিক্রমের পূর্ব থেকে আছেন এবং যিনি স্বয়ম্ভু, তিনি কে? সকল দেবগণের উপরস্থ সকল দেবগণের পুর্বস্থ **এক ঈশ্বরেরই** স্তুতি করা হয়েছে।' (ঋগ্বেদ- মণ্ডল ১০, সূক্ত ৩১, মন্ত্র ৮)

৫. "য এক ইত্তমু ষ্টুহি কৃষ্টিনাং বির্চষণিঃ"

য एक इत्तमु ष्टुहि कृष्टीनां विचर्षणिः।
पतिर्जज्ञे वृषक्रतुः ॥ १६ ॥

Ya eka it tamu ṣṭuhi kṛṣṭīnāṁ vicarṣaṇiḥ.
Patirjajñe vṛṣakratuḥ.

"O man, invoke, admire and celebrate that one alone who is unique by himself, ever watchful guardian of the people, generous performer and showerer of blissful fruits of his action, and who emerges and rises as the protector and ruler of all." (RIGVEDA-English translation by Dr. Tulsi Ram M.A., Ph.D. London, U.K.)

'উপাসনা করো, বন্দনা করো ওই ঈশ্বরের যিনি সবকিছু দেখেন, যিনি **এক ও একক**, যিনি মানুষের অধিপতি।' (ঋগ্বেদ- মণ্ডল ৬, সূক্ত ৪৫, মন্ত্র ১৬, পৃষ্ঠা ৫০; হরফ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৫, এ-১২৬ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭; ঋগ্বেদ সংহিতাঃ ৩০১ পৃষ্ঠা। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তী সম্পাদিত, তথাগত ৯১ / ১ বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮)

৬. "মা চিদন্যদ্বি শংসত সখায়ো মা রিষণ্যত, ইন্দ্রমিৎস্তোতা বৃষণং সচা সুতে মুহুরুক্থা চ শংসত।"

मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत ।
इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत ॥ १ ॥

Mā cidanyad vi śaṁsata sakhāyo mā riṣaṇyata. Indramit stotā vṛṣaṇaṁ sacā sute muhurukthā ca śaṁsata.

"O friends, do not worship any other but One."

(RIGVEDA-English translation by Dr. Tulsi Ram M.A., Ph.D. London, U.K.)

"তোমরা অন্যের নাম উচ্চারণ করো না, অন্যের উপাসনা (ইবাদত) করো না, বরং ইবাদত করো **একমাত্র** তাঁরই।" (ঋগ্বেদ সংহিতা- মণ্ডল ৮, সূক্ত ১, মন্ত্র ১, পৃষ্ঠা ১৮৬-১৮৭। বেদ: রমেশচন্দ্র দত্ত অনুবাদিত, হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা- ৭০০০০৭, প্রথম প্রকাশ: মহালয়া, ১৪ আশ্বিন ১৩৮৫। ঋগ্বেদ সংহিতা: ৩৭৫ পৃষ্ঠা। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মণি চক্রবর্তী সম্পাদিত, তথাগত ৯১/১ বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮)

যজুর্বেদ:

যজুর্বেদের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো লক্ষণীয়-

১. "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ। হিরণ্যগর্ভ ইত্যেষ মা মা হিংসীদিত্যেষা যস্মান্ন জাত ইত্যেষঃ॥"

न तस्य प्रतिमाऽअस्ति यस्य नाम महद्यशः । हिरण्यगर्भऽ-
इत्येष मा मा हिंसीदित्येषा यस्मान्न जातऽइत्येषः॥३॥

Na tasya pratimā'asti yasya nāma mahadyaśaḥ. Hiraṇyagarbha'ityeṣa mā mā hiṁsīdityeṣā yasmānna jāta'ityeṣaḥ.

"There is none and nothing like Him, no picture, no icon, no simile, no metaphor. Great is His Name, mighty His glory."

(YAJURVEDA-English translation by Dr. Tulsi Ram M.A., Ph.D. London, U.K.)

"স্রষ্টার কোনো প্রতিমূর্তি বা সাকার রূপ নেই। স্রষ্টার তুলনা দেয়ার কোনো বস্তু নেই। তাঁর মহৎ যশ আছে। কেউ তাকে হিংসা করে না।" (শুক্ল যজুর্বেদ-সংহিতা, ৩২/৩, পৃষ্ঠা ২২৪, শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা- ৭০০০০৭)

২. "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসংভূতিমুপাসতে। ততো ভুয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাঃ রতাঃ।"

अन्धन्तमः प्र विशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते ।
ततो भूयऽइव ते तमो यऽउ सम्भूत्याᳬ रताः॥९॥

Andhaṁ tamaḥ pra viśanti ye'sambhūtim-upāsate. Tato bhūya iva te tamo ya'u sambhūtyāṁ ratāḥ

"Down into the darkest dark do they fall who worship only the primordial prakriti. Still deeper and darker do they fall who worship only the existential forms and are lost therein."

(YAJURVEDA-English translation by Dr. Tulsi Ram M.A., Ph.D. London, U.K.)

"অন্ধকারে প্রবেশ করবে তারা, যারা প্রকৃতির পূজা করে (প্রকৃতিঃ আগুন, পানি, বাতাস)। আর যারা স্বাম্ভুতি পূজা করে, তারা আরো বেশী অন্ধকারে প্রবেশ করবে (স্বাম্ভুতিঃ টেবিল, পাখা, মানুষের হাতে গড়া জিনিস)।" (যজুর্বেদ ৪০/৯, শুক্ল যজুর্বেদ-সংহিতা ৪০/৯, পৃষ্ঠা ২৫৬, শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী)

৩. "যেহেতু তিনি চিরঞ্জীব, তাই তাঁকেই উপাসনা করতে হবে তার কোন **প্রতিকৃতি (প্রতিমা/মূর্তি) নেই**, তাঁর গৌরব মহিমান্বিত। তিনি একাই সূর্যের মত সকল আলোকজ্জল বস্তু প্রতিপালন করেন।" (যজুর্বেদ, দেবি চাঁদ এম. এ পৃ. ৩৭৭)

৪. "স পর্যগাছুক্রমকায়মব্রণমস্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্, কবির্মনীষী পরিভুঃ স্বয়ম্ভর্যাথাতথ্যতাহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃসমাভ্যং"

स पर्य्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरꣳशुद्धमपापविद्धम् ।
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽअर्थान् व्यदधा-
च्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥

Sa paryagācchukramakāyamavraṇam asnāviraṁ śuddhamapāpaviddham. Kavirmanīṣī paribhūḥ svayambhūryāthātathyato'arthān vyadadhācchāśvatībhyaḥ samābhyaḥ

"The Supreme Soul is omnipresent, omnipotent, without body."

(YAJURVEDA-English translation by Dr. Tulsi Ram M.A., Ph.D. London, U.K.)

"তিনিই বিশুদ্ধ স্রষ্টা, যিনি জ্ঞানদাতা, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। যিনি প্রকৃত শরীর রহিত এবং তিনি সকল পাপ থেকে পবিত্র। যিনি একইরূপে অনন্তকাল থেকে আছেন এবং থাকবেন, তাঁর অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। সেই মহান স্রষ্টাই **একমাত্র উপাস্য**।" (শুক্ল যজুর্বেদ: ৪০/৮, পৃষ্ঠা ২৫৬। বেদ, শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা- ৭০০০০৭)

অথর্ববেদ:

অথর্ববেদের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো লক্ষণীয়-

১. "এক হ দেবো মানসি প্রবিষ্টাঃ" (অথর্ববেদ, ১০/২৯)

অর্থাৎ "যিনি মানুষের অন্তরের খবর জানেন, তিনি এক।"

২. "প্রকৃতপক্ষে তুমি সুমহান, সত্যিই **অদ্বিতীয়**, তোমার ক্ষমতা সুবিশাল, আর যেহেতু তুমি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী তাই তোমার বড়ত্বকে সম্মান করি; সত্যিই তুমি সুমহান, প্রবল ক্ষমতাধর প্রভূ তুমি"। (অথর্ববেদ সংহতি, ভলিউম-২, William Dmight Whitney Page. 910)

উপনিষদ:

১. "There is no master of his in the world, no ruler of his, not even a sign of him. He is the cause, the lord of the lords of the organs, and there is of him neither parent nor lord." (THE UPANISHADS translated by F. Max Muller)

"No one in the world is His master or lord, nor has anybody any control or rule over Him. There is no sign by which He can be inferred, (He being formless and the subtlest). He is the cause of the creation of all things, i.e., of this entire universe and the master (or controller) of it and of all creatures. He has

no creator of His own Self, (He being Unborn and without beginning), nor is there any one who is His master or lord." (NINE UPANISHADS with *English Translation* by Prem Nath Chadha)

न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्।
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः ॥ ९ ॥

"না কছ্য কচুজ জানিত তনা কধিপহ" অর্থাৎ "তার কোনো **মাতা-পিতা নেই**, কোনো প্রভুও নেই" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, অধ্যায় ৬, অনুচ্ছেদ ৯, দ্বিতীয় খন্ড পৃ. ২৬৩)

২. "নৈনাম উর্ধভাম না তির্যনকাম না মধ্যে না পরিজাগ্রতভাত না তস্য প্রাতিমে অস্তি যস্য নম মহত ইয়াছা" অর্থাৎ "তার কোন **প্রতিকৃতি নেই** এবং তার নাম মহিমান্বিত"। (The Principal উপনিষদ কৃত এস. রাধাকৃষ্ণ পৃ. ৭৩৬, প্রাচ্যের পবিত্র গ্রন্থবলী, ভলিউম-১৫, উপনিষদ ২য় খন্ড পৃষ্ঠা-২৫৩)

৩. "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো।
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদবিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্বেষাং যে নন্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে॥"

न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति नो मनः।
न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्।
अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि।
इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद् व्याचचक्षिरे ॥ ३ ॥

"Him our eyes cannot see, nor words express; He cannot be grasped even by the mind. We do not know, we cannot understand, Because he is different from the known And he is different from the unknown." (The Upanishads Translated by Eknath Easwaran)

স্রষ্টাকে **চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না**। বাক্য দ্বারা তাকে প্রকাশ করা যায় না। মন দ্বারাও পরিমাপ করা যায় না। তিনি ইন্দ্রিয়-মনের অগোচর। স্রষ্টা

ইন্দ্রিয় দ্বারা বিদিত সকল বস্তু হতে পৃথক, ইন্দ্রিয়াদির অগোচর বিষয়েরও উপরে।' (কেন উপনিষদ, ১.৩-৪)

৪. "যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥"

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यति।
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ ६॥

"That which cannot be perceived by the eye, but by which the eye is perceived- That alone know as Brahman(Creator) and not that which people here worship." ("The Upanishads- A New Translation" by Swami Nikhilananda)

'চক্ষুদ্বারা যাকে দেখা যায় না, কিন্তু দর্শনবিষয় সমূহের দ্বারা অনুভব করা যায়, তাকেই তুমি স্রষ্টা বলে জানবে। 'তিনিই স্রষ্টা' বলে লোকে যে সকল অনাত্মা বস্তুর উপাসনা করে তিনি স্রষ্টা নন, অথবা তাকে স্রষ্টা বলে জানবে না।' (কেন উপনিষদঃ ১/৭, পৃষ্ঠা ৩৯। অতুল চন্দ্র সেন, হরফ প্রকাশনী, অতুল চন্দ্র গুপ্ত, রিডার্স ওয়েজ, ঢাকা-১১০০)

৫. "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহুনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च॥ ११॥
एको वशी निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति।
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्॥ १२॥

"He is the one God, hidden in all beings, all-pervading, the self within all beings, watching over all works, dwelling in all beings, the witness, the perceiver, the only one, free from

qualities. He is the one ruler of many who (seem to act, but really do) not act; he makes the one seed manifold. The wise who perceive him within their self, to them belongs eternal happiness, not to others." (THE UPANISHADS translated by F. Max Muller)

'স্রষ্টা এক, একক ও অদ্বিতীয়। তিনি সবকিছু জানেন এবং সবকিছু দেখেন। তিনি অন্তর্যামী। তিনি সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। একটি বীজকে বহুরূপে প্রকাশ করেন।' (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদঃ ৬/১১-১২, পৃষ্ঠা ৩৯৮-৩৯৯। অতুল চন্দ্র সেন, হরফ প্রকাশনী, অতুল চন্দ্র গুপ্ত, রিডার্স ওয়েজ)

৬. "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম্, অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদম্। নিত্যং বিতুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং, তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥"

यत् तदद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रं तदपाणिपादम्। नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद् भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः॥ ६॥

"That which cannot be seen, nor seized, which has no family and no caste, no eyes nor ears, no hands nor feet, the eternal, the omnipresent (all-pervading), infinitesimal, that which is imperishable, that it is which the wise regard as the source of all beings." (THE UPANISHADS translated by F. Max Muller)

'সে অদৃশ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগম্য, কর্মেন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য, কারণহীন, রূপহীন, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং হস্ত, পদ ইত্যাদি কর্মেন্দ্রিয় বর্জিত, অবিনাশী, ব্যাপক, সর্বভূতগত, সব কিছু উৎপত্তির কারণ- সেই স্রষ্টাকে জ্ঞানীগণ জানেন।' (মুণ্ডক উপনিষদ, ১.১.৬)

৭. "তার আকৃতি দেখা যায় না, কেউ তাকে চোখে দেখতে পায় না।"

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्।
हृदा हृदिस्थं मनसा य एनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ २०॥

“The form of Him stands not within the vision and none beholdeth Him by the eye; but by the heart and the mind, for in the heart is His station; who thus know Him, they become immortal.” (Kena and Other Upanishads by Sri Aurobindo)

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, অধ্যায় ৪, শ্লোক ২০)

৮.

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको
विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्वाः ।
ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे
ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्येत् ॥२॥

“It is he who, being one **only**, rules over every germ (cause), over all forms, and over all germs.” (Shvetashvtara Upanishad 5.2) (THE UPANISHADS translated by F. Max Muller)

‘প্রকৃত স্রষ্টা এক, তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি সমস্ত সৃষ্টিকে বেষ্টন করে আছেন।’ (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৫.২)

৯.

य एको जालवानीशत इशनीभिः
सर्वांल्लोकानीशत ईशनीभिः ।
य एवैक उद्भवे सम्भवे च
य एतद् विदुरमृतास्तेभवन्ति ॥१॥

“The non-dual Ensnarer rules by His powers. Remaining one and the same, He rules by His powers all the worlds during their manifestation and continued existence. They who know this become immortal.” (Shvetashvtara Upanishad 3.1) ("The Upanishads- A New Translation" by Swami Nikhilananda)

“Those who know the Supreme Lord who is one (matchless), rules over all the worlds, that is, the entire universe, by His

infinite powers and immutable laws.” (Shvetashvtara Upanishad 3.1) (NINE UPANISHADS with *English Translation* by Prem Nath Chadha)

‘যিনি এক, অদ্বিতীয়, তিনি ঐশী শক্তি দ্বারা শাসন করেন, যিনি স্বীয় ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবে সমস্ত লোক নিয়ন্ত্রণ করেন, তার তত্ত্ব যারা জানে তারা অমরত্ব (স্বর্গ লাভ) হন।’ (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৩.১)

১০. ‘স্রষ্টা অদ্বিতীয়, তিনি শুরু থেকেই আছেন এবং সবকিছু ধ্বংসের পর থাকবেন।’ (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৪.১১)

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको
यस्मिन्निदं सं च वि चैति सर्वम् ।
तमीशानं वरदं देवमीड्यं
निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ ११ ॥

“One attains great peace when he realises that Effulgent Adorable Lord, the bestower of all blessings, who alone is the master (Controller) of all wombs (or species of beings), in whom all this universe dissolves at the time of *pralai* (destruction or end) and in whom it again re-appears in manifold forms (at the time of re-creation).” (Shvetashvtara Upanishad 4.11) (NINE UPANISHADS with *English Translation* by Prem Nath Chadha)

১১. ‘প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা এক’ (ঈশ উপনিষদ, ৪)

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् ।
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥

“No one can perceive, by eyes or other senses, the one unshakable Lord.” (ISH UPNISHAD, 4) (NINE UPANISHADS with *English Translation* by Prem Nath Chadha)

১২. ‘এই জগতের স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই।’ “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ঃ” (ছান্দোগ্য উপনিষদ: ৬/২/১, পৃষ্ঠা ৫৭৭)

হিন্দুধর্ম মতে, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় **'একমেবা দ্বিতীয়ম্'** এর মধ্য দিয়ে এ সত্য প্রকাশ হয়েছে। (হিন্দুর ধর্ম কথা, ২৭পৃষ্ঠা। ছান্দোগ্য উপনিষদঃ ৬/২/১, পৃষ্ঠা ৫৭৭। অতুল চন্দ্র সেন, হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০ ০৭; অতুল চন্দ্র গুপ্ত, প্রকাশক, রিডার্স ওয়েজ, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০)

ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বর এক- এর অর্থঃ তাঁর সঙ্গে কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়। (একত্ববাদ সম্পর্কে আরো দেখুন, ঋগ্বেদঃ ১/১৬৪/৬, ২/১২/৫, ৩/৫৫/২২, ৫/৮৫/৬, ১০/৩১/৮, ১০/৮১/৮, ১০/৮২/৩, ১০/১২১/১, ১০/১২৯/৬, ১/৬৪/৪৬, ১০/১১৪/৫, ৬/৬৮/৯, ১০/১২৫/১-৮, ১০/৯০/১-১৬; যজুর্বেদঃ ৩২/৩, ৪০/৭-৯; অথর্ববেদঃ ৫৮/৩; শ্রীমদ্ভগবতগীতা (যথাযথ): ৭/২০, ১০/৩, ৭/২১; শ্রীমদ্ভগবত মহাপুরাণঃ ১১/৩, ৭/১৩-১৪, ৩/১০-১১, ৩/৪২; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদঃ ৬/৯, ৪/১৭, ৬/১১, ৬/১৫, ৬/১৭, ছান্দোগ্য উপনিষদঃ ৬/১, তৈত্তিরীয় উপনিষদঃ ১/১, ঐতরিয় উপনিষদঃ ১/১, কঠ উপনিষদঃ ২/১১, ২/১০, ২/১, ২/১২, ২/১৩, ২/৯, ২/১)

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে শির্কের শাস্তি

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে প্রকৃত স্রষ্টার সঙ্গে শরীক করার শাস্তি বিষয়ে বলা হয়েছে, 'তিনি **এক এবং অদ্বিতীয়**, তাঁর দ্বিতীয় বা অতিরিক্ত কিছুই নেই। এই সত্য যে অস্বীকার করবে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, মহাক্ষতির মধ্যে পতিত হবে।' "মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" (কঠ উপনিষদঃ ২/১১, পৃষ্ঠা ১২৫। হরফ প্রকাশনী ও রিডার্স ওয়েজ, ঢাকা)
'নানা' শব্দের অর্থঃ পৃথক, ভিন্ন (separate, different) অর্থাৎ স্রষ্টা এক এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই, ছেলে-মেয়ে কেউ নেই।

"যিনি জগতের সকল কিছুর স্রষ্টা, **নিরাকার**, প্রথমেও ছিলেন এবং শেষেও থাকবেন, যিনি অন্তরের খবর জানেন, যারা তাঁকে **এক ও অদ্বিতীয়** বলে না জানে, বিশ্বাস না করে, তারা দুঃখই ভোগ করবে।" "ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্ য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদঃ ৩/১০, পৃষ্ঠা ৩৭৫। অতুল চন্দ্র সেন, হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা- ৭০০০ ০৭; অতুল চন্দ্র গুপ্ত, রিডার্স ওয়েজ, ৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০)

অন্যত্র বলা হয়েছে, ‘যে ঈশ্বর-কে এক বলে বিশ্বাস না করে, সে মৃত্যু হতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় (নরকবাসী হয়)।’ (কঠ উপনিষদ: ২/১০, পৃষ্ঠা ১২৪)

হিন্দুধর্মে একত্ববাদ বিশ্বাসের মাঝে চির শান্তি ও মুক্তি লাভ

প্রকৃত স্রষ্টার একত্ববাদ বিশ্বাস করা প্রসঙ্গে বেদে বলা হয়েছে, ‘ঈশ্বরের একত্ব যে জানে ও বিশ্বাস করে তার শোক বা মোহ থাকবে না।’ “তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনু পশ্যত।” (শুক্ল যজুর্বেদ: ৪০/৭, পৃষ্ঠা ২৫৬। বেদ, শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা- ৭০০০০৭)

অন্যত্র বলা হয়েছে, “If a man has discerned him, who being one only, rules over every germ (cause), in whom all this comes together and comes asunder again, who is the lord, the bestower of blessing, the adorable god, then he passes for ever into that peace.” (THE UPANISHADS translated by F. Max Muller)

‘অদ্বিতীয় প্রকৃত স্রষ্টা, প্রত্যেক স্থানে অধিষ্ঠিত, সবকিছুর উৎপত্তি তিনিই করেছেন, এই সমস্ত জগৎ তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই ধ্বংস করবেন। সেই স্রষ্টাকে যে নিশ্চিতরূপে জানবে সে চিরশান্তি ও মুক্তি লাভ করবে।’ (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ: ৪/১১ এবং ১৪ ও ২০, ৩/৪ পৃষ্ঠা ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৭। অতুল চন্দ্র সেন, হরফ প্রকাশনী, অতুল চন্দ্র গুপ্ত, রিডার্স ওয়েজ, ঢাকা-১১০০)

ধর্মগ্রন্থের বর্ণনায়, দেবদেবীরা তার কিছুই করেনি।

শিখ ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার ধারণা

শিখধর্ম একটি আর্য ও অবৈদিক ধর্ম। এটি হিন্দু ধর্মেরই একটি শাখা, যা গুরু নানক কর্তৃক পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রবর্তিত হয়। শিখধর্ম সংগঠিত হয়েছিল পাকিস্তানের এলাকায় এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলে, যা পঞ্চনদের অববাহিকা। গুরু নানক একটি ক্ষত্রিয় (যোদ্ধা গোত্রে) হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

'শিখ' এবং 'শিখবাদ'-এর সংজ্ঞা

'শিখ' শব্দটি 'শিষ্য' শব্দ থেকে উদ্ভূত। শিষ্য অর্থ ভক্ত বা অনুসারী। শিখধর্ম দশজন গুরুর ধর্ম। প্রথম গুরু হলেন গুরু নানক এবং ১০ম ও শেষ গুরু হলেন গুরু গোবিন্দ শিং। শিখদের পবিত্র গ্রন্থ 'শ্রী গুরুগ্রন্থ', যাকে 'আদি গ্রন্থসাহেব' ও বলা হয়ে থাকে।

শিখ ধর্মের মৌলিক বিশ্বাস

ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা দিতে শিখরা তাদের পবিত্র গ্রন্থের শুরুতে 'মূলমন্ত্র' উদ্ধৃত করে থাকে- এটা তাদের মৌলিক বিশ্বাস, যা গুরু গ্রন্থ সাহেব-এর শুরুতে উল্লিখিত আছে।

গুরুগ্রন্থ সাহেব- ভলিউম ১, জাপূজী এর প্রথম শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে-

੧	1	੧
[2]੧ਓ[4] [3]	There is but[3] one[2] God[4].	ਵਾਹਿਗੁਰੂ[4] ਕੇਵਲ[3] ਇਕ[2] ਹੈ।
ਸਤਿਨਾਮੁ[5] ਕਰਤਾ[6] ਪੁਰਖੁ[7] [8]ਨਿਰਭਉ[9] [11]ਨਿਰਵੈਰੁ[10] [12]ਅਕਾਲ[13] ਮੂਰਤਿ[14] ਅਜੂਨੀ[15] ਸੈਭੰ[16]	True[5] is His Name, creative[6] His personality[7] and [12]immortal[13] His form[14]. He is without[8] fear[9], sans[11] enmity[10], unborn[15] and self-illumined[16].	ਸੱਚਾ[5] ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਰਚਨਹਾਰ[6] ਉਸ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀ[7] ਅਤੇ [12]ਅਮਰ[13] ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ[14]। ਉਹ [8]ਨਿਡਰ[9], ਕੀਨਾ[10]-ਰਹਿਤ[11], ਅਜਨਮਾ[15] ਤੇ ਸ੍ਵੈ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ[16] ਹੈ।

"One Universal Creator God. The Name Is Truth. Creative Being Personified. No Fear. No Hatred. Image Of The Undying, Beyond Birth, Self-Existent."

"ঈশ্বর মাত্র **একজন** যাকে বলা হয় সত্যিকার সৃষ্টিকর্তা, তিনি ভয় ও ঘৃণা থেকে উর্ধ্বে। তিনি অমর, তিনি জাতকহীন, তিনি স্বয়ম্ভু, তিনি মহান এবং করুণাময়।"

শিখধর্ম তার অনুসারীদেরকে কঠোরভাবে একত্ববাদের দীক্ষায় দীক্ষিত করে। এ ধর্ম এই সার্বভৌম বিমূর্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, যাকে 'এক ওমকারা' বলে।

'ওমকারা' পরিচয় প্রকাশে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লিখিত হয়েছে-

'করতার'- স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা।

'সাহিব'- প্রভু।

'অকাল'- আদি-অন্তহীন।

'সত্যনামা'- পবিত্র নাম।

'পরওয়ারদিগার'- প্রতিপালক।

'রহীম'- দয়াময়।

'করিম'- সদাশয়।

তাঁকে 'ওয়াহি গুরু' অর্থাৎ একক সত্য ঈশ্বরও বলা হয়। শিখধর্ম 'অবতারবাদ'-এ বিশ্বাস করে না। 'অবতারবাদ' হলো ঈশ্বরের মানবাকৃতিতে পৃথিবীতে আগমন সংক্রান্ত মতবাদ। তাদের মতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কখনো অবতার রূপে মানব আকৃতিতে পৃথিবীতে আগমন করেন না। তারা মূর্তি পূজারও ঘোর বিরোধী।

জরথুস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার ধারণা

জুরথুস্ত্রীয় ধর্ম প্রাচীন আর্য ধর্মের অন্তর্গত একটি ধর্ম। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে পারস্যে এ ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। এ ধর্মমতের অনুসারীর সংখ্যা কম হলেও সারা বিশ্বে এক লক্ষ ত্রিশ হাজারের কম নয়। এটা প্রাচীন ধর্মগুলোর একটি। ইরানি পন্ডিত জরস্টারকে এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ধরা হয়। এ ধর্ম **'পারসি ধর্ম'** বা **'মাজুসী ধর্ম'** হিসেবেও পরিচিত। এ ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ হলো **'দসতির'** ও **'আবেস্তা'**। জরথুস্ত্রীয় ধর্মে 'ঈশ্বর' **'আহুরা মাজদা'** নামে পরিচিত। 'আহুরা' অর্থ প্রভু, আর 'মাজদা' অর্থ প্রাজ্ঞ। আর তাই 'আহুরা মাজদা' অর্থ 'প্রাজ্ঞ প্রভু'। 'আহুরা মাজদা' দ্বারা এক অদ্বিতীয় প্রভুকে বুঝানো হয়ে থাকে।

দসতীর অনুসারে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য

দসতীর অনুসারে 'আহুরা মাজদা'র নিম্নের গুণাবলি রয়েছে-

১. তিনি **একক**। ২. কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। ৩. তিনি আদি অন্তহীন।

৪. তাঁর পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র কিছুই নেই। ৫. তাঁর কোনো **আকার-আকৃতি নেই**। ৬. দৃষ্টি তাকে **প্রত্যক্ষ করতে পারে না** এবং কল্পনা শক্তিও তাঁকে আয়ত্ত করতে অক্ষম। ৭. তিনি মানবীয় ধারণা-কল্পনার বহু উর্ধ্বে।

৮. তিনি মানুষের নিজের চেয়েও নিকটতর।

'আবেস্তা' অনুসারে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য

'আবেস্তা'-তে 'গাথা' ও 'ইয়াসনা' **আহুরা মাজদা**'র যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছে তা হলো-

১. **সৃষ্টিকর্তা** (ইয়াসনা ৩১: ৭, ১১), (ইয়াসনা ৪৪:৭), (ইয়াসনা ৫০:১১) (ইয়াসনা ৫১:৭)

২. সর্বশক্তিমান- **শ্রেষ্ঠ** (ইয়াসনা ৩৩:১১), (ইয়াসনা ৪৫:৬)

৩. করুণাময়- **'হুদাই'** (ইয়াসনা ৩৩:১১), (ইয়ানা ৪৮:৩)

৪. দানশীল- 'স্পেন্তা' (ইয়াসনা ৪৩: ৪, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫), (ইয়াসনা ৪৪:২), (ইয়াসনা ৪৫:৫), (ইয়াসনা ৪৬:৯), (ইয়াসনা ৪৮:৩)

ইয়াহুদী ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার ধারণা

ইয়াহুদী ধর্মের অনুসারীদেরকে 'ইয়াহুদী' নামে অভিহিত করা হয়। তারা নিজেদেরকে মূসা (আ.) প্রচারিত ধর্মে বিশ্বাসী বলে দাবি করে।

১. নিম্নোক্ত শ্লোকটি বাইবেল 'পুরাতন নিয়ম' এর 'ডিউটারোনমি' "Deuteronomy" অধ্যায়ে উদ্ধৃত মূসা (আ.) এর উপদেশনামা থেকে গৃহীত।

"শামা ইজরাঈলিউ আদোনাই ইলা হাইনো আদনা ইশাদ।"

উল্লিখিত শ্লোকটি হিব্রু ভাষার বাইবেল পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃত। এর অর্থ-

"Hear, O Israel: The Lord is our God, the Lord alone." (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

"Hear, O Israel: The LORD…LORD is one!" **(The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr.)

"ইসরাঈলীরা শোনো, আমাদের প্রভু ঈশ্বর **একক**।" (বাইবেল, ডিউটারোনমি ৬:৪)

২. বাইবেলের 'ঈসাইয়্যাহ' "Isaiah" অধ্যায়ের নিম্নোক্ত শ্লোকগুলো লক্ষ করুন-

"I, I am the Lord, and besides me there is no savior." (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

"আমি, আমিই **একমাত্র** প্রভু এবং আমি ছাড়া অন্য কোনো ত্রাণকর্তা নেই।" (বাইবেল, ঈসাইয়্যাহ ৪৩:১১)

৩. "I am the LORD, and there is no other; There is no God besides Me." **(The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

"I am the Lord, and there is no other;
besides me there is no god." (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

"আমি-ই প্রভু, এবং এ ছাড়া আর কেউ নেই, আমি ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই।" (বাইবেল, ঈসাইয়্যাহ ৪৫:৫)

৪. "I am God, and there is no other;
I am God, and there is no one like me." (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

"I am God, and there is no other;
I am God, and there is none like Me." **(The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

"আমি-ই ঈশ্বর এবং এ ছাড়া আর কেউ নেই; আমি-ই ঈশ্বর এবং আমার সদৃশ কেউ নেই।" (বাইবেল, ঈসাইয়্যাহ ৪৬:৯)

৫. ইয়াহূদি ধর্মে প্রতিমা পূজাকে নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহে নিন্দা করা হয়েছে-

"You shall not make for yourself an idol, whether in the form of anything that is in heaven above, or that is on the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or worship them; for I the Lord your God am a jealous God." (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

"আমার পাশাপাশি তুমি অন্য কাউকে ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করবে না; তুমি নিজের জন্য কোনো প্রতিমা তৈরি করবে না; অথবা ঊর্ধ্বাকাশে অথবা পৃথিবীতে আছে অথবা ভূগর্ভে জলে আছে এমন কোনো কিছুর সদৃশ স্থির করবে না; তুমি তাদের সামনে বিনীত হবে না, আর না তাদের দর্শন করবে; কেননা আমি-ই একমাত্র প্রভু, তোমার ঈশ্বর, ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর......।" (বাইবেল, এক্সোডাস ২০:৩-৫)

৬. বাইবেলের ডিউটারোনমিতে একই কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে-

"You shall have no other gods before Me.

You shall not make for yourself a carved image—any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth; you shall not bow down to them nor serve them. For I, the LORD your God, am a jealous God." **(The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

"আমার পাশাপশি অন্য কাউকে ঈশ্বর হিসেবে গ্রহণ করবে না; তুমি কোনো কিছুর প্রতিমা তৈরি করবে না; অথবা ঊর্ধ্বাকাশে, পৃথিবীতে অথবা ভূগর্ভে জলে যা কিছু আছে তার কোনো কিছুর সদৃশ তৈরি করবে না; এসবের সামনে তুমি কখনো বিনীত হবে না, আর তাদের উপাসনাও করবে না; কেননা, আমি **একমাত্র** প্রভু, তোমার ঈশ্বর, ঈর্ষাপরায়ণ ঈশ্বর..... ।" (বাইবেল, ডিউটারোনমি ৫:৭-৯)

৭. বাদশাহ দাউদ (আ.) বললেন,

"O LORD, there is none like You, nor is there any God besides You." (1 chronicles 17:20) **(The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

"There is no one like you, O Lord, and there is no God besides you." (1 chronicles 17:20) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

"হে আল্লাহ, তোমার মত আর কেউ নেই এবং তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।" (১ খান্দাননামা ১৭:২০)

৮. "O Lord, God of Israel, there is no God like you in heaven above or on earth beneath." (1 king 8:23) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

"LORD God of Israel, there is no God in heaven above or on earth below like You." (1 king 8:23) **(The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

"ইসরাইলের মাবুদ, উপরে বেহেশতে কিংবা নিচে দুনিয়াতে তোমার মত মাবুদ আর কেউ নেই।" (১ বাদশাহ্‌নামা ৮:২৩; আরো দেখুন, যিশাইয়া ৪৩:১১,

৪৫:১২, ৫১:১২, ৪৩:১১, ৪৫:১২, হিজরত ২০:৩-৪, লেবীয় ১৯:১৮, যিরমিয় ২৪:৭, দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৫, ৪:৩৫, ৬:১৩, ১০:২০)

খ্রিষ্ট ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার ধারণা

সর্বপ্রথম নির্দেশ: ঈশ্বর এক-অদ্বিতীয়

একদা বাইবেলের একজন লিপিকার যীশুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ঈশ্বরের সর্বপ্রথম নির্দেশ কোনটি?

"One of the scribes came near and heard
them disputing with one another, and seeing
that he answered them well, he asked him,
Which commandment is the fi rst of all?" (Mark 12:28)
(THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

এর উত্তরে তিনি তা-ই পুনরুক্তি করলেন যা মূসা (আ.) বলেছিলেন-

'শামা ইসরাঈলু আদোনাই ইলা হাইনো আদনা ইখাত'

অর্থ- 'হে ইসরাঈলীরা শোনো! আমাদের প্রভু ঈশ্বর একক প্রভু।' (মার্ক ১২:২৯)

"Jesus answered, "The first is, 'Hear, O Israel:
the Lord our God, the Lord is one." (Mark 12:29)
(THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

"We know that an idol is nothing in the world, and that there is no other God but one." **(The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

"We know that no idol in the world really exists and that there is no God but one." (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)
(1 corinthians 8:4)

"আমরা জানি জগতে প্রতিমা আসলে কিছুই নয় আর ঈশ্বরও মাত্র একজন ছাড়া আর কেউ নেই।" (১ করিন্থীয় ৮:৪)

"And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent." (THE NEW

OXFORD ANNOTATED BIBLE**, The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

ঈসা বললেন, "তোমাকে অর্থাৎ একমাত্র সত্য আল্লাহকে আর তুমি যাকে পাঠিয়েছ সেই ঈসা মসীহকে জানতে পারাই অনন্ত জীবন।" (ইউহোন্না ১৭:৩ আরো দেখুন মথি ৪:১০, ৬:৬, ১২:৫০, ২২:৩৭, মার্ক ৯:৪০, ১২:২৯, লূক ১:৪৯, ৪:৮, ৫:২১, ৯:৫০, ১০:২৭, ২৫, ২৮, ৪১-৪৪, ইউহোন্না ৫:৪৪, ৮:৪১, ১৭:৩, ২০:১৭, রোমীয় ১৩:৯, ১৬:২৭, ১ করিন্থীয় ১:৬, গালাতীয় ১:১০, ৫:১৪, ফিলীপীয় ৪:৬, ইফিষীয় ৪:৬, ১ তিমথীয় ১:১, ১৭, ২:৪, ৬:১৫-১৬, ইয়াকুব ৪:১২, এহুদা/যিহুদা/যুদ ১:২৫, প্রকাশিত কালাম ২২:৯)

"You shall not bow down to them nor serve them. For I, the LORD your God, am a jealous God." **(**Deuteronomy 5:9)

(The MacArthur Daily Bible by John F. MacArthur, Jr)

"তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর পূজাও করবে না, সেবাও করবে না, কারণ কেবলমাত্র আমি আল্লাহই তোমাদের মাবুদ।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৯, ৭, হিজরত ২০:৫)

"You shall not make for yourself an idol,
whether in the form of anything that is in
heaven above, or that is on the earth beneath,
or that is in the water under the earth." (Exodus 20:4)
(THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

"পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মূর্তি তৈরি করবে না, তা আকাশের কোন কিছুর মত হোক বা মাটির উপরের কোন কিছুর মত হোক কিংবা পানির মধ্যেকার কোন কিছুর মত হোক।" (হিজরত ২০:৪, আরো দেখুন, লেবীয় ১৯:৪, ইয়ারমিয়া ২:১১, ৭:৯, ৩১, ৩২:৩৫-৩৭, দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৫-২০, ৩২, ১২:৩২, জবুর শরীফ ১০৫:৪, ১ বাদশাহনামা ১৮:৪০, ২ বাদশাহনামা ১৭:১৭, প্রজ্ঞাপুস্তক ১১:১৫, রোমীয় ১:২৩)

যীশু খ্রিষ্টের নামানুসারে খ্রিষ্টধর্মের নামকরণ করা হয়েছে। খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা ঈসা (আ.) কে ঐশ্বরিক গুণসম্পন্ন সত্তা ও উপাস্যের যোগ্য মনে করে।

খ্রিষ্টধর্মের ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়নে জানা যায় যে, ঈসা (আ.) কখনো নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেন নি। মূলত বাইবেলের নতুন নিয়মে এ জাতীয় দাবি সম্বলিত একটি বাক্যও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে তিনি বলেছেন 'আমি ঈশ্বর' অথবা 'আমাকে উপাসনা করো।' বরং বাইবেলে এমন একাধিক বাক্য রয়েছে যা এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। দেখা যাক, বাইবেলে উদ্ধৃত তার বাক্যগুলোতে কী আছে-

"My Father is Greater than I." (John 14:28)
(The MacArthur Daily Bible by John F. MacArthur, Jr)

"আমার পিতা আমার চেয়ে মহান।" (যোহন ১৪:২৮)

"My Father is Greater than all." (John 10:29)
(The MacArthur Daily Bible by John F. MacArthur, Jr)

"আমার পিতা সকলের চেয়ে মহান।" (যোহন ১০:২৯)

"...... I cast out devils by the spirit of God...." (Matthew 12:28)
"... আমি সকল মন্দ আত্মাকে তাড়াই ঈশ্বরের শক্তিতে...।" (মথি ১২:২৮)

".......I cast out devils with the finger of God......" (Luke 11:20)
"...... ঈশ্বরের সাহায্যেই আমি মন্দ দূর করি।" (লূক ১১:২০)

"I can of Myself do nothing. As I hear, I judge; and My judgment is righteous, because I do not seek My own will but the will of the Father who sent Me." (John 5:30)
(The MacArthur Daily Bible by John F. MacArthur, Jr)

"আমি নিজ থেকে কিছুই করতে পারি না; আমি যেমন শুনি তেমন-ই বিচার করি এবং আমার বিচার সঠিক। কেননা আমি নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে চাই না, বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, সেই পিতার ইচ্ছে অনুসারেই আমি কাজ করতে চাই।" (ইউহোন্না ৫:৩০)

যীশু খ্রিস্টের মিশন- তিনি এসেছিলেন আইনকে পূর্ণ করতে

যীশু কখনো নিজের ঐশ্বরিকতার দাবি করেন নি। অর্থাৎ তিনি নিজেকে 'ঈশ্বর' বা 'ঈশ্বরের পুত্র' বলে দাবি করেন নি। তিনি তাঁর মিশনের প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার করে বলেছেন। ইতিপূর্বেকার কিতাব তাওরাতকে পূর্ণতা দানের জন্য ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছেন।

মথি লিখিত সুসমাচারের (Gospel) নিম্নোক্ত বর্ণনায় ঈসা (আ.) এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে-

"Do not think that I have come to abolish the law or the prophets; I have come not to abolish but to fulfill. For truly I tell you, until heaven and earth pass away, not one letter, not one stroke of a letter, will pass from the law until all is accomplished." (Matthew 5:17-18)
(THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

"তোমরা মনে করো না যে, আমি আইন (মূসার তাওরাতের বিধান) অথবা নবীদের বিধান ধ্বংস করতে এসেছি। আমি ধ্বংস করতে আসিনি, বরং সেসব **পূর্ণ করতে** এসেছি। আমি তোমাদেরকে সত্যই বলছি- আকাশ ও পৃথিবী যতদিন চলতে থাকবে ততদিন সেই বিধানের কোনো একটি মাত্রা বা একটি বিন্দুও মুছে যাবে না, যতক্ষণ না পরিপূর্ণ হয়।" (বাইবেল, মথি ৫:১৭–১৮)

যীশু ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ

বাইবেল নিচের শ্লোকগুলোতে যীশুর মিশনের ঐশ্বরিক প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছে-

".......and the word which you hear is not Mine but the Father's who sent Me." (John 14:24)
(**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

অর্থ: ".... এবং তোমরা যা আমার থেকে শোনো, তা-তো আমার কথা নয়, বরং সেসব কথা পিতার যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" (বাইবেল, যোহন ১৪:২৪)

“And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent.” (John 17:3) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

অর্থ: “এবং এটাই শাশ্বত জীবন যে, তারা তোমাকে তথা সত্য ঈশ্বরকে আর তুমি যাকে পাঠিয়েছ সেই যীশু খ্রিষ্টকে জানবে।” (বাইবেল, যোহন ১৭:৩)

যীশু তার ওপর দেবত্ব আরোপের বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। বাইবেলে উল্লিখিত নিচের ঘটনার প্রতি লক্ষ করুন-

“And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?”

And he said unto him,

“Why callest thou me good? There is none good but one, that is God; but if thou will enters into life, keeps the commandments.”

অর্থ: ‘এবং, দেখো, একজন লোক আসলো এবং যীশুকে বললো- ওহে ভালো প্রভু! আমাকে এমন ভালো কাজ সম্পর্কে বলুন, যা করলে আমি অনন্ত জীবন লাভ করতে পারবো।’

যীশু তাকে বললেন, ‘আমাকে ভালো বলছো কেন, এক ছাড়া কেউ ভালো নেই, আর তিনি হলেন ‘ঈশ্বর’; তুমি যদি অনন্ত জীবন লাভ করতে চাও, তবে তাঁর সব আদেশ পালন করো।’

এ বিবরণ দ্বারা যীশুর ‘ঈশ্বর’ হওয়া সংক্রান্ত খ্রিষ্টানদের মতবাদ এবং যীশুর আত্মত্যাগের মাধ্যমে তাদের পরিত্রাণ লাভের মতবাদ বাইবেল প্রত্যাখ্যান করেছে।

যীশু মানবজাতির চূড়ান্ত মুক্তি লাভের জন্য স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার ওপর জোর দিয়েছেন। (বাইবেল, মথি ৫:১৭-২০)

নাজারাথবাসী যীশু- ঈশ্বরের মনোনীত একজন মানুষ

“Men of Israel, hear these words: Jesus of Nazareth, a Man attested by God to you by miracles, wonders, and signs which

God did through Him in your midst, as you yourselves also know” (Acts 2:22)
(The MacArthur Daily Bible by John F. MacArthur, Jr)

অর্থ: ‘হে ইসরাঈলীরা এ কথাগুলো শোনো : নাজারাথবাসী যীশু, **ঈশ্বরের মনোনীত একজন মানুষ** যিনি ঈশ্বরের অলৌকিক, আশ্চর্যজনক নিদর্শন। ঈশ্বর তার দ্বারা যা করেছেন তা তোমাদের মধ্য থেকেই করেছেন যা তোমরা নিজেরাই জানো।’ (প্রেরিত ২:২২)

পর্যালোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসা ১ : তবে কে আমাদের সৃষ্টিকর্তা ?

এখন ধর্মগ্রন্থগুলোর ভেতরে যে ধারণাগুলো সাদৃশ্যপূর্ণ, অন্তত সেই ধারণাগুলোতে আমরা অটুট বিশ্বাস রাখতে পারি। হিন্দু, শিখ, জরথুস্ত্রীয়/পারসি, ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মগ্রন্থগুলো যাচাই করে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, সেটা হল- স্রষ্টা এক, অদ্বিতীয় এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

একই স্কুলে দু-প্রধান শিক্ষক, একদল সৈন্যের দু-জন সেনাপতি এবং একই রাজত্বে দু-রাজার কর্তৃত্ব পরিচালনার সংবাদ আমাদের গোচরীভূত হয় না এবং স্বভাবত তা হতে পারে না। তখন আকাশ ও পৃথিবীর এ বিশাল রাজত্ব কি করে দুজন বা ততোধিক স্রষ্টার কর্তৃত্বে পরিচালিত হতে পারে?

এ যমীন, যাতে আমরা বসবাস করি; এ চন্দ্র, যা রাতের বেলা আমাদের দৃষ্টিপথে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়; এ সূর্য, যা প্রতিদিন উদয় হয় ও অস্ত যায়; এ অগণিত তারকারাজী,যা ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আকাশে পরিদৃশ্যমান হয়, এ সমস্তের ঘূর্ণনের মধ্যে একটি সুশৃঙ্খলিত নীতি বিদ্যমান রয়েছে। তাই রাত বা দিনের আগমন কখনো আপন আপন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দেখা যায় না।

চাঁদ কখনো পৃথিবীর সাথে ধাক্কা খায় না। সূর্য কখনো আপন গন্তব্য পথ ছেড়ে এক কদমও এদিক ওদিক যায় না। এ অসংখ্য ভ্রাম্যমাণ তারকারাজি এক বিরাট শৃঙ্খলায় আবদ্ধ এবং এক নির্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী আপন নির্দিষ্ট পথে গতিশীল। কেউ আপন পথ হতে এক চুল পরিমাণও টলতে সমর্থ নয়।

একবার এ পৃথিবী ও আমাদের আপন অস্তিত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এ ধূলির ধরায় আমাদের জীবনধারণের সব বিচিত্র কর্মকাণ্ড ও কতকগুলো বিধি-ব্যবস্থার সীমার মধ্যে আবদ্ধ। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রত্যেক জিনিসকে আপন সীমায় বেঁধে রেখেছে। উক্ত শক্তির অভাবে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টির সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।

বাতাস আপন কর্তব্য-কর্মে অবিরাম নিযুক্ত রয়েছে। পানিও তার নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করছে। আলোর করণীয় কাজও যথারীতি সম্পন্ন হচ্ছে। এভাবে বছরের ঋতুগুলোও আপন কর্তব্য প্রতিপালনে রত। মাটি, পাথর, বিদ্যুৎ, বাষ্প, গাছ ও জন্তু-জানোয়ার ইত্যাদি কারো নিজ সীমার বাইরে চলার শক্তি নেই।

এ সুবৃহৎ রাজত্বের প্রত্যেকটি বিভাগ বিশেষ শৃঙ্খলার সাথে অন্য বিভাগের সাথে মিলিত হয়ে আপন কর্তব্য কাজ সম্পাদন করছে।

এখন গভীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক যে, এ রাজত্বের প্রতিটি বিভাগ ও ক্ষেত্র এতোটা সুশৃঙ্খলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত কেন? কেন এখানে কোনো প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি হয়নি? উত্তরে আপনার ভেতরকার মানুষটি নিঃসন্দেহে বলে উঠবে যে, উপরোক্ত সমস্ত কারখানার স্রষ্টা ও অধিকারী হচ্ছেন একজন মাত্র স্রষ্টা। এ এক স্রষ্টার আদেশই সকলের উপর কাজ করছে এবং সমস্ত কিছুকে এক শৃংখলায় বেঁধে রেখেছে।

এ বিরাট বিশ্বের অস্তিত্ব কখনো এমনিতেই গড়ে ওঠেনি, বরং এর পেছনে রয়েছে একজন শক্তিশালী স্রষ্টা- যিনি এক ও অদ্বিতীয়।

সৃষ্টিকর্তা পবিত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলেছেন-

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

বলুন, "হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন কথার দিকে আসো যেটি **আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান**।"

হিন্দু, শিখ, জরথুস্ত্রীয়/পারসি, ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও ইসলাম ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে- স্রষ্টা এক, অদ্বিতীয় এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, স্রষ্টা এক, অদ্বিতীয় এবং তার সমতুল্য কেউ নেই তবে আপনি আত্মসমর্পণ করলেন। এখানে আত্মসমর্পণ করার অর্থ হচ্ছে, এক স্রষ্টার কাছেই নিজেকে, নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা।

যুগে যুগে পৃথিবীতে অনেক নবী-রাসূলগণ এসেছিলেন। তারা সবাই এসেছিলেন আত্মসমর্পণের ধর্ম নিয়ে। সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন। শেষ নবীর পূর্বে আগত সকল নবী-রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ সকল আসমানী

কিতাব একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য ও কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই সকল আসমানী কিতাব বা পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে নাযিল হলেও পরবর্তীতে সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন যুগে মানুষ তাদের মনগড়া কথার দ্বারা সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সেই আত্মসমর্পণের ধর্মগুলোকে বিকৃত করে ফেলে। সে কারণে প্রায়শই দেখা যায়, আমাদের চারপাশের মানুষগুলো শিশুকাল থেকে এক স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ না করে একাধিক স্রষ্টার আরাধনা ও বিভিন্ন মনগড়া কথার অনুসরণ করে। কিন্তু সত্য হলো, প্রত্যেকটি শিশু আত্মসমর্পণের ধর্ম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে প্রতিকূল পরিবেশ তাকে স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন কথার সংমিশ্রণ ঘটলেও তারা ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে যেটা পরিবর্তন করতে পারেনি সেটা হল- স্রষ্টার গুণাবলী ও সর্বশেষ নবীর ভবিষ্যৎবাণী।

ইতোমধ্যে স্রষ্টার গুণাবলী আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে ধর্মগ্রন্থগুলোতে সর্বশেষ নবীর ভবিষ্যৎবাণী আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রশ্ন আসতে পারে, কেন স্রষ্টা একাধিক নবী-রাসূলগণ প্রেরণ করলেন?

এক এক যুগে স্রষ্টা তাঁর রাসূলদের কাছে কিতাব নাযিল করেছেন যা এক এক সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য ছিল পথপ্রদর্শক। স্রষ্টা তাঁর বান্দাদের কাছে দ্বীনের বিধি-নিষেধ সহজ করার জন্য তা অল্প অল্প করে তার রাসূলদের কাছে কিতাব রূপে নাযিল করেন। তিনি সর্বশেষ যে রাসূলের কাছে কিতাব নাযিলের মাধ্যমে তাঁর দ্বীনের বিধি-নিষেধগুলোকে পূর্ণাঙ্গতা দান করবেন তাঁর ব্যাপারে সকল ধর্মগ্রন্থেই তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছেন।

সৃষ্টিকর্তা প্রত্যেক নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে শেষ নবীর আগমন সম্পর্কে মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন। পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থগুলো বিশ্লেষণ করলে শেষ নবীর ভবিষ্যৎবাণী পাওয়া যায়।

এবার দেখা যাক ধর্মগ্রন্থগুলোতে সর্বশেষ নবী সম্পর্কে কিরূপ ধারণা দেওয়া হয়েছে।

❒ ধর্মগ্রন্থগুলোতে সর্বশেষ নবীর ভবিষ্যৎবাণী

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে অন্তিম অবতারের আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী

হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে কল্কি অবতার বা অন্তিম অবতারের আগমন সম্পর্কে জানানো হয়েছে। চলুন দেখা যাক, হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে কি কি ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে।

কল্কি অবতারের নাম

ঋগ্বেদে বলা হয়েছে,

নরাশংসমিহ প্রিয়মস্মিন্ যজ্ঞ উপ হ্বয়ে।
মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতম্॥ ৩॥

Narāśaṁsamiha priyamasmin yajña upa hvaye.
Madhujihvaṁ haviṣkṛtam.

"নরাশংসমিহ প্রিয়ই স্মিন্যজ্ঞ উপহ্বয়ে। মধুজিহ্বৎ হবিষ্কৃকতম্॥" (ঋগ্বেদ-সংহিতা ১.১৩.৩)
মন্ত্রের টীকায় বলা হয়েছে, 'নরাশংস' অর্থ 'মানবপ্রশংসিত'। (ঋগ্বেদ সংহিতা, অনুবাদ- রমেশচন্দ্র দত্ত, ১০/১৪/১, পৃষ্ঠা ৪৫৫, হরফ প্রকাশনী, ৫২১ পৃষ্ঠা, তথাগত)

অথর্ববেদে এসেছে, "ইদং জন্য উপ শ্রুত **নরাশংস** স্তবিষ্যতে" "ওহে নরগণ, তোমরা করহ শ্রবণ, প্রশংসার্হ ব্যক্তি (নরাশংস) সদা প্রশংসিত হন।" (অথর্ববেদ, ২০/৯/৩১/১, পৃষ্ঠা ৪৭২, হরফ প্রকাশনী, শ্রীদিলীপ মুকোপাধ্যায়, অক্ষয় লাইব্রেরী, ৭৯/১এ, মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা- ৭০০ ০০৯, পৃষ্ঠা ১১৭৬। আরো দেখুন, সামবেদ-সংহিতা, উত্তরার্চিক, ১১.১৩৪৯; ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১.১৩.৩; যজুর্বেদ-সংহিতা, ২৯.২৭)

হিন্দু শাস্ত্রে কল্কি অবতারের নাম **'নরাশংস'**। 'নরাশংস' বাংলায় 'প্রসংশিত', আরবীতে এর অর্থ 'মুহাম্মাদ'। ড. শ্রীবাস্তব বলেন, (সংস্কৃত) 'নর' অর্থ 'পুরুষ' এবং 'আশংস' অর্থ 'প্রশংসিত' অর্থাৎ 'প্রশংসিত পুরুষ'। তিনি দেব জাতির অন্তর্ভূক্ত নন; মানুষের মধ্য থেকে হবেন। (বেদ ও পুরাণে আল্লাহ্ ও হযরত মোহাম্মাদ, ১৫-১৬ পৃষ্ঠা। মূল: ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়, অনুবাদ: অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশকাল ১৯৯৯)

অথর্ববেদে এসেছে, 'এষ ইষায় **মামহে** শতং নিষ্কান্ দশ স্রজঃ।' 'মামহ' আরবি 'মুহাম্মাদ' এর সংস্কৃত রূপ। (অথর্ববেদ, ২০ কাণ্ড, ৯ অনুবাক, ৩১, সূক্ত, ৩ মন্ত্র; কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব, ৬৬ পৃ.)

'মামহ' ঋগ্বেদেও এসেছে। 'অনস্বন্তাসৎপতির্মামহে মে গাবা চেতিষ্ঠো অসুরো মঘোনঃ' (ঋগ্বেদ ৫.২৭.১)

অথর্ববেদের অন্যত্র কল্কি অবতারকে 'রেভ' (প্রশংসাকারী) নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

'বচ্যস্ব **রেভ** বচ্যস্ব কৃক্ষে ন পক্কে শকুনঃ' 'সত্য বিস্তার করো রেভ, সত্য বিস্তার করো। পক্ষী যথা গায় শুষ্ক বৃক্ষের উপর।' (অথর্ববেদ, ২০.৯.৩১.৪)

'মুহাম্মাদ' অর্থ: অধিক প্রশংসিত, অনেক প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী। ইসলাম ধর্মে সর্বশেষ নবীর নাম 'মুহাম্মাদ'। (সূরা ফাত্‌হ, আয়াত: ২৯)

সামবেদে আছে, "মদৌ বর্তিতা দেবাদকারান্তে প্রকৃত্তিতা। বৃষাণাংভক্ষয়েৎ সদামেদা শাস্ত্রে চ স্মৃতা"। যে দেবের নামের প্রথম অক্ষর 'ম' এবং শেষ অক্ষর 'দ' হবে এবং যিনি গরুর মাংস ভক্ষণ করাকে সর্বকালের জন্য বৈধ ঘোষণা করবেন, তিনিই হবেন শাস্ত্রানুযায়ী শেষ ঋষি।" (কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব ২৩ পৃষ্ঠা; শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ, ১২.২.১৮, পৃষ্ঠা ১৯৫০, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর)

হিন্দুধর্মের শতাব্দীর সংস্কারক শ্রী শ্রী বালক ব্রহ্মাচারী সামবেদের উল্লিখিত উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'মুহাম্মাদ' নামের প্রথম অক্ষর 'ম' এবং শেষ অক্ষর 'দ' হওয়ায় তাঁকে মান্য করা আমাদের শাস্ত্রেরই নিদের্শ। তিনিই গরুর মাংস খাওয়াকে বৈধ ঘোষণা করেছেন।

'আহমাদ' নামেও তাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে,

अ॒हमिद्धि पि॒तुष्परि॑ मे॒धामृ॒तस्य॑ ज॒ग्रभ॑।

अ॒हं सूर्य॑इवाजनि ॥ १० ॥

Ahamiddhi pituṣpari medhāmṛtasya jagrabha.
Ahaṁ sūrya ivājani.

'আহমিদ্ধি পিতুস্পরি মেধামৃতস্য জগ্রভ। **অহং সূর্য ইবাজ্রনি॥'** (ঋগ্বেদ-সংহিতা, ৮/৬/১০, পৃষ্ঠা ২০১, হরফ প্রকাশনী; অথর্ববেদ, ২০/৯/৩১/১, পৃষ্ঠা ৪৭২, হরফ প্রকাশনী, অক্ষয় লাইব্রেরী, পৃষ্ঠা ১১৭৬)

'আহমাদ' অর্থ অধিক প্রশংসনীয়। 'আহমাদ' মুহাম্মাদ (সা.)-এরই একটি নাম। এ নামটিও কুরআনে রয়েছে। (সূরা সফ, আয়াতঃ ৬)

পিতামাতা ও জন্মস্থান

কলিযুগে[১] **'শম্ভল'** নামক গ্রামে **বিষ্ণুযশা** নামে ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে **কল্কি অবতার** জন্মগ্রহণ করবেন। (পুরাণকোষ ২ঃ ১৮৮-১৮৯ পৃ.)

"শম্ভলে বিষ্ণুযশসো গৃহে প্রাদুর্ভবাম্যহম্। **সুমত্যাং** মাতরি বিভো! কন্যায়াং ত্বন্নিদেশতঃ॥" "তিনি **শম্ভল**গ্রামের অধিবাসী **বিষ্ণুযশার** ঔরসে **সুমতির** গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন।" (কল্কিপুরণম্ ২.৪; পৃ. ১২-১৩। অনুবাদক পণ্ডিত প্রবর জঁগন্মোহন তর্কালঙ্কার, প্রকাশক, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২ডি. মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা)

---

১. কলিযুগ- যে যুগ সর্বাংশই পাপেপূর্ণ। (শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ, দ্বাদশ স্কন্দ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৯, শ্লোক, পৃষ্ঠা. ১৯৫৩; দেখুন, কল্কিপুরাণম্, ২.৬-৯; আরো দেখুন, মহাভারত, শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত বেনিমাধব শীল'স লাইব্রেরী, বনপর্ব্ব, একোননবত্যধিকশততম অধ্যায়, পৃ. ৫৮১-৫৮৩)
হিন্দুধর্মীয় শাস্ত্রমতে, যুগ চারটি। ১. সত্যযুগ- যে যুগে কোনো পাপের লেশমাত্র নেই। ২. ত্রেতাযুগ- যে যুগ এক-তৃতীয়াংশ পাপাচ্ছন্ন। ৩. দ্বাপরযুগ- যে যুগ দুই-তৃতীয়াংশ পাপাচ্ছন্ন। ৪. কলিযুগ। (শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ, দ্বাদশ স্কন্দ, দ্বিতীয় অধ্যায়)

প্রথমত: তার বাবার নাম হবে “বিষ্ণুযশা”। এর অর্থ ‘মালিকের দাস’; আরবিতে যার অর্থ ‘আব্দুল্লাহ’।
মুহাম্মাদ (সা.) এর পিতার নাম ‘আব্দুল্লাহ’ এবং আব্দুল্লাহ অর্থ- ‘মালিকের দাস’।

দ্বিতীয়ত: তার মায়ের নাম হবে “সুমতি”। ‘সুমতি’ সংস্কৃত শব্দের অর্থ ‘প্রশান্ত’, ‘প্রশান্তি’,‘শান্তি’; যার আরবি অর্থ ‘আমিনা’।
মুহাম্মাদ (সা.) এর মায়ের নাম ‘আমিনা’; আমিনা অর্থ ‘শান্তি’, ‘নিরাপদ’।

তৃতীয়ত: তিনি জন্ম নিবেন “শম্ভল” নামক একটি গ্রামে।
‘শম্ভল’ অর্থ ‘সংরক্ষিত এলাকা’ যা আরবিতে دار الامن (দারুল আমান), بلد الامين (বালাদুল আমীন)। মক্কা কে কুরআনে “দারুল আমান” নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আমরা জানি, নবী (সা.) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।
‘শম্ভল’ বলা হয়, এমন স্থানকে যা নিজের প্রতি অন্যকে আকৃষ্ট করে রাখে। মক্কা শরীফে বায়তুল্লাহ থাকার কারণে মক্কা সকল মানুষকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে রেখেছে।
মুহাম্মাদ (সা.) আরব দেশে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন।

অধ্যাপক ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় বলেন, পৌরাণিক, হিন্দুশাস্ত্রে পৃথিবীকে সাতটি দ্বীপে বিভক্ত করা হয়েছে। আর এর মধ্যে একটি দ্বীপের নাম ‘শম্ভল দ্বীপ’। শম্ভলদ্বীপের অবস্থান আরব এবং এশিয়া মাইনরে। (কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব ৪৭-৪৮ পৃষ্ঠা। মূল: ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়, অনুবাদ: অধ্যাপক ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬ তম সংস্করণ ২০০৮)

কল্কি অবতারের জন্ম তারিখ

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে এসেছে, “তিনি মাধব মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশ তারিখে জন্মগ্রহণ করবেন।”

মাধব মাস মানে বৈশাখ মাস, ‘বিক্রমী ক্যালেন্ডার’ মতে বৈশাখ মাসকে ‘বসন্ত’ বলা হয়। বসন্তের আরবী রূপান্তর হলো ربيع, ‘রবি’। শুক্লপক্ষ বলা

হয় প্রথম অংশকে, আরবীতে اول 'আওয়াল'। দু'টিকে একত্রিত করলে হবে 'রবিউল আওয়াল' ربيع الاول।

দ্বাদশ তারিখ মানে ১২ তারিখ। "**দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য মাধবে** মাসি মাধবঃ জাতংদদৃশতুঃ পুত্রং পিতরৌ হৃষ্টমানসৌঃ" "বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীর দ্বাদশীতে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর জন্মে তাঁর মাতা এবং দাদা অতিশয় আনন্দিত হবেন।" (কল্কি পুরাণম্ ২/১৫ পৃষ্ঠা ১৫। পণ্ডিত প্রবর জঁগন্মোহন তর্কালঙ্কার সম্পাদিত নবভারত পাবলিশার্স ৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯)

লক্ষণীয়, কল্কি অবতারের জন্মগ্রহণে তাঁর মাতা এবং দাদা আনন্দিত হবেন। এখানে পিতার কথা বলা হয়নি। কারণ, পিতা তখন দুনিয়াতে থাকবেন না। মুহাম্মাদ (সা.) এতীম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। (সূরা দুহা, আয়াত: ৬)

সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (সা.) প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ১২ই রবিউল আওয়াল জন্মগ্রহণ করেন। (সীরাতে মুস্তফা, ইদ্রিস কান্ধলবী রহ.)

উত্তরায়ণ বেদে বলা হয়েছে, "লা ইলাহা হরতি পাপম্ ইল্ইলাহা পরম পাদম্, জন্ম বৈকুণ্ঠ অপ ইনুতি ত জপি নাম মুহাম্মদ।" (কল্কি অবতার ২৫ পৃ.)

অন্তিম অবতারের বৈশিষ্ট্য

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে কল্কি অবতার, অর্থাৎ অন্তিম অবতারের অনেক গুণাবলি-বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। মহাপুরাণের একটি বর্ণনায়,

১. তিনি অশ্বারোহী হবেন।
২. বিশ্বমানব হবেন।
৩. তরবারি হস্তে পরিচিত দুষ্টদের দমন করবেন।
৪. তাঁর চেহারা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হবে।
৫. সকল সৎগুণের অধিকারী হবেন।
৬. তাঁর দেহ এত কান্তিময় হবে যে, এর বর্ণনা দেয়া সম্ভব নহে। অর্থাৎ তিনি অধিক সুন্দর হবেন।

৭. খৎনা করা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করবেন।
৮. তাঁর শরীর থেকে সুগন্ধি বের হবে।
৯. তাঁর সংস্পর্শে ধন্য মানুষের মন নির্মল ও পবিত্র হবে।
১০. দস্যু দমন কাজ সমাপ্ত হলে গ্রামে গঞ্জে নিবাসকারীরা দলে দলে তাঁর ধর্মে দিক্ষিত হবে।

"সম্ভলগ্রামমুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি॥
অশ্বমাশুগমারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ
অসিনাসাধুদমনমষ্টৈশ্বর্যগুণান্বিতঃ
বিচরন্নাশুনা ক্ষোণ্যাং হয়েনাপ্রতিমদ্যুতিঃ
নৃপলিঙ্গচ্ছদো দস্যূন্ কোটি শো নিহনিষ্যতিঃ
অথ তেষাং ভবিষ্যন্তি মনাংসি বিশাদানি বৈ।
বাসুদেবাঙ্গরাগাতিপুণ্যগন্ধানিলস্পৃশাম্
পৌরজানপদানাং বৈ হতেম্বখিলদস্যুষ্যুঃ।"

(শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ ১২/২/১৯-২১, ১৯৫০-১৯৫১ পৃ., গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, গোবিন্দ ভবন ১৫১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা- ৭০০০০৭)

ভাগবত (১২/২) মন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নরূপ:

১. তিনি অশ্বারোহী হবেন: ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একটি ঘোড়া ছিল, যাকে 'আলমুরতাজিয' বলে ডাকা হত। (মুসতাদরাকে হাকিম: ৪২০৭)

২. বিশ্বমানব হবেন: মুহাম্মাদ (সা.) সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তিনি বিশ্বমানব ও বিশ্বনবী। (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৮)

৩. তরবারি হস্তে পরিচিত দুষ্টদের দমন করবেন:

ইবনু ইসহাক রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর তরবারির নাম ছিল 'যুলফিকার'। (ইবনে হিশাম ৩.৭৯; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৬.২৫)

নবীজির (সা.) সীরাত থেকে জানা যায়, তিনি ও তার সাহাবীরা বদর, খন্দক, খায়বার ও বিভিন্ন যুদ্ধে পরিচিত দুষ্টদের দমন করেন।

আবু তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত, বদরের যুদ্ধে মক্কার পরিচিত ও প্রসিদ্ধ দস্যুদের মধ্য থেকে ২৪ জনকে হত্যা করা হয় এবং তাদের মৃতদেহকে আবর্জনাপূর্ণ কূপে নিক্ষেপ করা হয়। (বুখারী, মাগাযী: ৩৯৭৬; মুসলিম: ৭১১৬)

৪. তাঁর চেহারা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হবে: জনৈক লোক বলল, মুহাম্মাদ (সা.) এর চেহারা ছিল তরবারির ন্যায়। জাবির ইবনু সামুরা (রা.) বললেন, না, তাঁর চেহারা ছিল সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় (উজ্জ্বল)।
(সহীহ মুসলিম, ফযিলত অধ্যায়: ৫৯৭৮)

৫. সকল সৎগুণের অধিকারী হবেন: মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে মহান স্রষ্টা বলেন, 'হে নবী! নিশ্চয়ই আপনি অধিষ্ঠিত রয়েছেন মহান চরিত্রে।' (সূরা কলম, আয়াত: ৪)

৬. তাঁর দেহ এত কান্তিময় হবে যে, এর বর্ণনা দেয়া সম্ভব নহে। অর্থাৎ তিনি অধিক সুন্দর হবেন: আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) লোকদের মধ্যে মাঝারি গড়নের ছিলেন- বেশি লম্বাও ছিলেন না বা বেঁটেও ছিলেন না। তাঁর শরীরের রং গোলাপী ধরণের ছিল, ধবধবে সাদাও নয় কিংবা তামাটে বর্ণেরও নয়; উজ্জ্বল ফর্সা ছিলেন। মাথার চুল কোঁকড়ানোও ছিলনা, আবার একেবারে সোজাও ছিলনা। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর উপর ওহী অবতরণ শুরু হয়। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব: ৩৫৪৭; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল: ৫৯৪৮)

৭. খতনা করা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করবেন: সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (সা.) খতনা করা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। (তাফসীরে কুরতুবী: ১.৭৬)

৮. তাঁর শরীর থেকে সুগন্ধি বের হবে: আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আমি রেশম ও পশমের মিশ্রণে প্রস্তুতকৃত কাপড়ও নিজ হাতে স্পর্শ করেছি এবং খাঁটি রেশমি কাপড়ও স্পর্শ করেছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতের চেয়ে অধিক নরম ও কোমল কিছু স্পর্শ করিনি। আমি কস্তুরির ঘ্রাণও নিয়েছি এবং আতরের ঘ্রাণও নিয়েছি কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শরীরের ঘাম থেকে অধিক

সুঘ্রাণযুক্ত কিছুই পাইনি। (সহীহ মুসলিম, ফযিলত অধ্যায়: ৫৯৪৭; সুনানে তিরমিযি: ২০১৫)

৯. তাঁর সংস্পর্শে ধন্য মানুষের মন নির্মল ও পবিত্র হবে: মুহাম্মাদ (সা.)-এর সংস্পর্শে ধন্য সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যারা নিজেদের ব্যক্তি জীবনে, শাসন ক্ষেত্রে, খিলাফত পরিচালনায় এবং মানুষের সঙ্গে কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে ইনসাফ ও সততার এবং ন্যায় ও ধার্মিকতার এমন সব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, যার বিন্দুমাত্র নযীর দুনিয়ার কোনো জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আল্লাহ তা'আলা সাহাবাদের প্রশংসা করে কুরআনে অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। (দেখুন- সূরা হুজুরাত, আয়াত: ৭; সূরা বায়্যিনাহ, আয়াত: ৮; সূরা মায়িদা, আয়াত: ১১৯; সূরা তাওবাহ, আয়াত: ১০০; সূরা ফাত্হ, আয়াত: ১৮; সূরা মুজাদালাহ, আয়াত: ২২)

১০. দস্যু দমন কাজ সমাপ্ত হলে গ্রামে গঞ্জে নিবাসকারীরা দলে দলে তাঁর ধর্মে দিক্ষিত হবে: আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ١ وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا ٢

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি মানুষকে দেখবেন দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে (ইসলাম ধর্ম) প্রবেশ করছে।" (সূরা নাসর, আয়াত: ১-২)

নবীজির সীরাতগ্রন্থ থেকে জানা যায়, মক্কা বিজয়ের পর হক ও বাতিলের পার্থক্য সকলের সামনে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হলে দলে দলে মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

১. ঐশীজ্ঞানপ্রাপ্ত (কবি) এবং দানবীর হবেন: "নরাশংসঃ সুষুদতীমং যজ্ঞমদাভ্যঃ। **কবির্হি** মধুহস্ত্যঃ॥" (ঋগ্বেদ ৫.৫.২)।

কবি শব্দটির অর্থ, পরোক্ষ জ্ঞানপ্রাপ্ত, ঈশ্বরের দূত। 'ক' অর্থ ঈশ্বর। 'ক' বা ঈশ্বরের সঙ্গে যিনি সম্পর্কযুক্ত এবং ঈশ্বরকে যিনি বিশেষভাবে জানেন, তিনিই কবি- এ অর্থটি গ্রহণ করেছেন ধর্মাচার্য ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায়। এম. এ সংস্কৃত বেদ ডি ফিল. রিসার্চ স্কলার সংস্কৃত বিভাগ, প্রয়াগ

বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ, ভারত। (বেদ পুরাণের আল্লাহ ও হজরত মোহাম্মাদ, পৃ. ২০)

কুরআন মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে আগত জ্ঞানভাণ্ডার- যা মুহাম্মাদ (সা.) কে দান করা হয়। তিনি ওহী তথা স্রষ্টা প্রদত্ত জ্ঞান ছাড়া কিছুই বলতেন না।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ٣ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ٤

"তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এটা তো ওহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা আন-নাজ্‌ম, আয়াত: ৩-৪)

২. তিনি বিজয়ী, তাঁর শত্রুরা হবে পালায়নকারী: " প্র রেভাসো মনীষা বৃষা গাব ইবেরতে। অমোতপুত্রকা এষামমোত গা ইবাসতে॥ (অথর্ববেদ, ২০.৯.৩১.৫)

খন্দক বা গাযওয়ায়ে আহযাবে নবী (সা.) এবং তার সাহাবীরা বিজয় লাভ করেন এবং কাফিররা পলায়ন করে। (দেখুন- আর-রাহিকুল মাখতুম)

৩. সত্যযুগ আরম্ভ: "যখন কল্কি অবতার আগমন করবেন তখন সত্যযুগের আরম্ভ হবে আর প্রজাগণ স্বাভাবিকভাবেই সত্ত্বগুণসম্পন্ন হয়ে যাবেন।" (শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ, ১২.২.২৩)

নবী (সা.) ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার কারণে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। আর তাতে সত্যযুগ তথা নিষ্পাপযুগ শুরু হয়।

ঐতিহাসিকগণ মহানবী (সা.) এর যুগকে সোনালী যুগ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. মূর্তিপূজা লোপকারী: কল্কি অবতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন। পূর্ব যুগে ব্রাহ্মণ পূজারীগণের নানাবিধ অলংকার দ্বারা ভূষিত দেবমূর্তিদের পূজা বিলুপ্ত করবেন।

"বেদা ধর্ম্মঃ কৃতযুগং দেবা লোকাশ্চরাচরাঃ হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ সুসন্তুষ্টাঃ কল্কৌ রাজনি চাভবন্॥ নানাদেবাদিলিঙ্গেষু ভূষণৈর্ভূষিতেষূ চ। ইন্দ্রজালিকবদ্-বৃত্তিকল্পকাঃ পূজকাঃ জনাঃ॥ ন সন্তি মায়ামোহাঢ্যাঃ পাষণ্ডাঃ সাধুবঞ্চকাঃ।

তিলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গাঃ কল্কৌ রাজনি কুত্রচিৎ॥” (কল্কিপুরাণম্, তৃতীয় অংশ, ষোড়শোহধ্যায়, ২-৪ মন্ত্র, পৃ. ২৯৫)

গীতায় এসেছে, যাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিকৃত হয়ে গেছে কেবল তারাই মূর্তিপূজা করে।
“কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ তং তং নিয়মামাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া” (গীতা, ৭.২০)

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) মসজিদে হারামে (মক্কা) প্রবেশ করেন। হাজরে আসওয়াদের দিকে ধীর কদমে এগিয়ে গিয়ে সেখানে চুম্বন করেন। অতঃপর কাবা ঘর তাওয়াফ করেন। কাবা ঘরের চারপাশে শত বছরের ভেল্কি নিয়ে নির্জীব দাঁড়িয়ে ছিল নিষ্প্রাণ পাথরের তৈরি তিনশ’ ষাটটি মূর্তি। তিনি সেগুলোকে ধনুকের মাথা দিয়ে সামান্য গুঁতো দিতে লাগলেন আর বড় অসহায় হয়ে একটির উপর আরেকটি উপুড় হয়ে, কাত হয়ে, চিত হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল। তাঁর যবান মুবারক থেকে ধ্বনিত হচ্ছিল

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.

“সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয়ই মিথ্যা এমন জিনিস, যা বিলুপ্ত হওয়ারই।” (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত: ৮১)

(দেখুন, সহীহ বুখারী, হা.নং: ৪৭২০)

উপরিউক্ত গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যগুলো একমাত্র মুহাম্মাদ (সা.) ব্যতিত অন্য করোর মধ্যে পাওয়া যায় না। বেদ-পুরানে ‘কল্কি অবতার’ মুহাম্মাদ (সা.) ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। (কল্কি অবতার সম্পর্কে আরো দেখুন, সামবেদ ১/৭/৬৪, ১১/১/৩; ঋগ্বেদ ১/১৮/৯, ৩/১৩/৩, ১/১৪/৩, ১/২০/৯, ৫/৬/২, ২/৩/২, ৭/২/২; অথর্ববেদ ২০/১২৭/২; কল্কি পুরাণম্ ৩/১-৩; শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ ১/৩/২৪)

অন্তিম অবতারের আগমন সম্পর্কে আরও কিছু ভবিষ্যৎবাণী

ভবিষ্য পুরাণ

প্রতিস্বর্গ পর্ব ৩, খন্ড ৩, অধ্যায় ৩, শ্লোক ৫ থেকে ৮ এ বলা হয়েছে :

"একজন **ম্লেচ্ছ** আসবেন তার সঙ্গীদের সাথে নিয়ে **মরুস্থল** থেকে। তার নাম হবে **মুহাম্মাদ**"

'ম্লেচ্ছ' সংস্কৃত শব্দটির অর্থ 'বিদেশি'। তিনি আসবেন সঙ্গীদের নিয়ে- এখানে 'সঙ্গী' মানে 'সাহাবাদের' কথা বলা হয়েছে। আসবেন মরুস্থল থেকে। সংস্কৃত 'মরুস্থল' শব্দের অর্থ বালিময় স্থান বা মরুভূমি (আরব)।

ভবিষ্য পূরাণের পর্ব ৩, খন্ড ৩, অনুচ্ছেদ ১০-১৭ তে উল্লেখ রয়েছে:

"ম্লেচ্ছদের বসবাসের স্থান নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে যে শত্রুরা আগে রাজত্ব করত সেখানে এসেছে আরও শক্তিশালী শত্রু। আমি একজনকে পাঠাবো যার নাম হবে মুহাম্মাদ। **মানুষকে সরল পথে পরিচালিত করবেন**। হে রাজা ভোজ, তুমি পিশাচের রাজ্যে কখনই যাবে না। কারণ আমি আমার দয়া দিয়েই তোমাকে পবিত্র করব। তারপর দেবতুল্য একজন মানুষ ভোজ রাজার কাছে এসে বলল যে, আর্য ধর্ম এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে। এটা হবে ঈশ্বর পরমাত্মার আদেশে। আমার অনুসারীদের **খাতনা দেয়া হবে**। মাথার পিছনে কোন **টিকি থাকবে না**। তারা **মুখে দাড়ি রাখবে**। তারা একটি বিপ্লব করবে। তারা **প্রার্থনার জন্য ডাকবে**। তারা সব **হালাল খাবার খাবে**। তারা বিভিন্ন পশুর মাংস খাবে তবে **শূকরের মাংস ব্যতীত**। তারা লতাপাতার দ্বারা নিজেদের পবিত্র করবে না, নিজেদের পবিত্র রাখবে যুদ্ধের মাধ্যমে। তাদের সম্প্রদায়কে বলা হবে মুসলমান"

এ ভবিষ্যৎবাণী আর কারো কথা বলছে না, বলছে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর কথা।

আমরা জানি, মুসলিমরা খাতনা করে, তারা মুখে দাড়ি রাখে। তারা প্রার্থনার জন্য ডাকবে, আহ্বান জানাবে অর্থাৎ আযানের কথা বলা হচ্ছে। মুসলিমরা আযান দেয়।

তারা হালাল খাদ্য গ্রহণ করে, বিভিন্ন প্রাণীর মাংস খায় তবে শূকরের মাংস ব্যাতীত।

পবিত্র কুরআনে সূরা আনআম এর ১৪৫ নং আয়াতে এবং সূরা নাহল এর ১১৫ নং আয়াতে উল্লেখ আছে-

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.

"তোমাদের জন্য হারাম (অবৈধ) করা হয়েছে মৃত পশু, **শুকরের মাংস**, রক্ত এবং যে পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নাম নেয়া হয়েছে।" (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১১৫)

তারপর বলা হয়েছে, তিনি হবেন পৃথিবীর মানুষের পথ প্রদর্শক।

স্রষ্টা কুরআনের ৩৪ নং সূরা-সাবার ২৮ নং আয়াতে বলেছেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا وَّلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .

"আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সমগ্র মানবজাতির দূত, সংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। তবে অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।"

ভবিষ্যপুরাণের আরও কিছু ভবিষ্যৎবাণী

"এতস্মিন্নন্তরে **ম্লেচ্ছঃ** আচার্য্যেণ সমন্বিতঃ। **মহমদ** ইতি খ্যাত শিষ্য শাখা সমন্বিতঃ॥ নৃপশ্চৈব মহাদৈনং মরুস্থলনিবাসিনম্। গংগাজলৈশ্চ সংস্নাপ্য পঞ্চগব্য সমন্বিতৈঃ॥ চন্দনাদিভিরভ্যর্চ্যৈ তুষ্টা মনসা হরম্ ॥ নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থলনিবাসিনে। ত্রিপুরাসুরনাশোয় বুমায়াপ্রবর্তিনে॥ ম্লেচ্ছৈগুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দরূপিনে। ত্বং মাং হী কিং করং বিদ্বিশরণার্থমুপাগতম্ ॥"

"পৈশাচং দেহসাস্থায় ভোজরাজং হি সোৎব্রবীৎ॥ আর্যধর্মো হি তে রাজন্ সর্বধর্মোত্তমঃ স্মৃতঃ। ঈশাজ্ঞায়া করিষ্যামি পৈশাচং ধর্মদারুণম্॥ **লিঙ্গচ্ছেদী শিখানীনঃ** শ্মশ্রুধারী স দূষকঃ। উচ্চালাপী সর্বভক্ষী ভবিষ্যতি জনো মম॥ বিনা কৌলং চ পশবস্তেষাং ভক্ষ্যা মত্তা মম। **মুসলেনৈব** সংস্কারঃ কুশৈরির ভবিষ্যতি॥ তস্মান্মুসলবন্তো হি জাতয়ো ধর্মদূষকাঃ। ইতি পৈশাচধর্মশ্চ ভবিষ্যতি ময়াকৃতঃ॥ ইত্যুক্তা প্রমযৌ দেবঃ স রাজ গেহমায়য়ৌ॥"

অর্থ: "রাতে এক দেবদূত পৈশাচদেহ ধারণ করে রাজা ভোজকে বললেন, হে রাজন! যদিও তোমার ধর্ম সর্বাপেক্ষা উত্তম ধর্ম। কিন্তু এখন ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে তাকে পৈশাচ ধর্ম নামে স্থাপিত করবে। এবার **লিঙ্গচ্ছেদিত টিকিবিহীন** শ্মশ্রুধারী, উচ্চস্বরে আহ্বানকারী আমার প্রিয় হবে। তিনি

বিশুদ্ধ পশু ভক্ষনকারী হবেন, কুশ দ্বারা যুদ্রূপ সংস্কার হয়, তদ্রূপ তিনি মুসল দ্বারা সংস্কার করবেন। এভাবে **মুসলমান** জাতি **কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম** সমূহকে **সংস্কার করবেন**। এটা আমার পৈশাচ ধর্ম হবে।”

(ভবিষ্যপুরাণম্, পৃ. ৩৭৬-৩৭৯; কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব, পৃ. ৬৩-৬৪; বেদ ও পুরাণে আল্লাহ ও হযরত মোহাম্মাদ, পৃ. ৫৯-৬০)

অথর্ববেদ

কাণ্ড ২০, সূক্ত **১২৭**, মন্ত্র ১-৪: এটাকে বলা হয় ‘কুন্টাক শুক্তাক’[২]।

মন্ত্র ১: “তিনি হলেন **নরাশংস**। তিনি **কাওরাসা**, যাকে রক্ষা করা হয়েছে **ষাট হাজার নব্বই** জন শত্রুর হাত থেকে।”

মন্ত্র ২: “তিনি **উটে চড়া** ঋষি।”

মন্ত্র ৩: “তিনি মহাঋষি।”

মন্ত্র ৪: “তিনি **বৈশবী বের**।”

প্রথম মন্ত্রে বলা হচ্ছে, ‘তিনি নরাশংস’। ‘নরাশংস’ অর্থ প্রশংসিত; আরবিতে এর অর্থ ‘মুহাম্মাদ’। (ইতোপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।)

এর পরে বলা হচ্ছে, তিনি হলেন “কাওরাসা”। ‘কাওরাসা’ শব্দের অর্থ হলো ‘শান্তির রাজপুত্র’। সীরাতগ্রন্থ থেকে জানা যায়, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা ও মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এর অন্য অর্থ হল “অভিবাসী” বা “হিজরতকারী”। আমরা জানি, নবী (সা.) মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। তিনি অভিবাসী ছিলেন।

এরপর বলা হয়েছে, তাকে রক্ষা করা হয়েছে ৬০ হাজার ৯০ জন শত্রুর হাত থেকে। আমরা জানি, তখন মক্কায় যে সকল লোক নবী (সা.) এর বিপক্ষে ছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ হাজার।

---

২. কুন্টাক অর্থ ‘পেটের ভেতর লুকানো গ্রন্থি’। অর্থাৎ এ মন্ত্রগুলোর অর্থ লুকানো আছে। কুন্টাক এর একটি অর্থ- ‘দুর্দশা থেকে মুক্ত’। আরেকটি অর্থ- **‘শান্তি’**। ইসলামেরও একই অর্থ ‘শান্তি’। কুন্টাক এর আরেকটি অর্থ **‘পৃথিবীর কেন্দ্র’**। আমরা জানি, যে পবিত্র **মক্কা শহর** পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত।

দ্বিতীয় মন্ত্রে বলা হচ্ছে, 'তিনি হবেন উটে চড়া ঋষি'।

সীরাতগ্রন্থ থেকে জানা যায়, নবী মুহাম্মাদ (সা.) কাসওয়া নামক উটনির ওপর আরোহণ করে মদিনায় হিজরত করেন। মক্কা বিজয়ের দিন নবীজি (সা.) তার কাসওয়া নামক উটনিতে আরোহণ করে তাওয়াফ করেন। (সহীহ ইবনে হিব্বান, হা.নং: ৩৮২৮)

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, বিদায় হজ্জের দিন আমি রাসূল (সা.) কে তার কাসওয়া নামক উটনিতে আরোহণরত অবস্থায় ভাষণ দিতে দেখেছি। (সুনানে তিরমিযী, হা.নং: ৩৭৮৬)

(কোন ভারতীয় ঋষি বা ব্রাহ্মণ কখনোই উটের পিঠে উঠবেন না কারণ, উটে চড়া ব্রাহ্মণদের জন্য নিষিদ্ধ।
মনুস্মৃতি ১১ অধ্যায়ের ২০২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "একজন ব্রাহ্মণ কখনোই উট বা গাধার পিঠে চড়তে পারবে না"
অর্থাৎ তিনি এমন কেউ যিনি বিদেশি, ভারতের অধিবাসী নন।)

তৃতীয় মন্ত্রে বলা হয়েছে, 'তিনি হবেন মহাঋষি'।

চতুর্থ মন্ত্রে বলা হয়েছে, 'তিনি হবেন বের'। বের অর্থ–"যিনি প্রশংসা করেন"। নবী (সা.) এর আরেক নাম "আহমাদ"। আহমাদ এর একই অর্থ- "যিনি প্রশংসা করেন"।

অথর্ববেদ- কাণ্ড ২০, সূক্ত ২১, ৬ নং মন্ত্রে "আহযাবের যুদ্ধ" উল্লেখ রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে-

"এই ঋষিকে **১০ হাজার** শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করা হবে আর তিনি **লড়াই না করেই** জয়ী হবেন। তিনি একজন **কারু**।"

সংস্কৃত "কারু' শব্দের অর্থ "যে ব্যক্তি প্রশংসা করে"। এর আরবি অর্থ- "আহমাদ" যেটা ছিল নবী (সা.) এর আরেক নাম।

বলা হয়েছে তিনি লড়াই ব্যতীত এই যুদ্ধে জিতবেন। আহযাবের যুদ্ধে লড়াই না করেই মুসলিমরা জয়লাভ করে। আমরা জানি, আহযাবের যুদ্ধে শত্রু পক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ হাজার।

অথর্ববেদের কাণ্ড ২০, সূক্ত ২১, ৭ নং মন্ত্রে আছে,

“মহান ঈশ্বর ক্ষমতাচ্যুত করবেন **২০ জন** রাজাকে আর তিনি **আবান্দু** কে ৬০ হাজার ৯০ জন শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করবেন।

সংস্কৃত “আবান্দু” অর্থ “এতিম”। আবান্দু শব্দের আরেকটা অর্থ হলো “প্রশংসনীয়”। নবী (সা.) এর নাম ছিল মুহাম্মাদ, যার অর্থ হলো “প্রশংসনীয়” এবং তিনি এতিম ছিলেন।

আরো বলা হয়েছে, ঈশ্বর ২০ জন রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করবেন। আর আমরা জানি, তখনকার দিনে মক্কাতে আনুমানিকভাবে ২০টি আলাদা গোত্র ছিল। মুহাম্মাদ (সা.) সবাইকে জয় করেন। আর সে সময় নবী (সা.) এর বিরোধীদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০ হাজার।

ঋগ্বেদ

১নং গ্রন্থের ৫৩ নং অনুচ্ছেদের ৯ নং মন্ত্র; এখানে তাকে বলা হয়েছে “**সুষরামা**”। এর অর্থ “যে ব্যক্তি প্রশংসনীয়”। ‘মুহাম্মাদ’ নামের অর্থ “যে ব্যক্তি প্রশংসনীয়”।

নবীজির কথা ভবিষ্যৎবাণী করে অগ্নি পুরাণের ৬৪ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে, “ঋষি তার মায়ের দুধ পান করবেন না”।

আমরা জানি, নবী মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর মায়ের দুধ পান করেন নি। আর বিবি হালিমা ছিলেন তার দুধমাতা। এছাড়াও নবী (সা.) কে বলা হয়েছে আহমাদ অর্থাৎ “যিনি প্রশংসা করেন”।

উত্তরচিকার ১৫০০ নং মন্ত্রে, ইন্দ্রের ২ নং অধ্যায়ের ১৫২ নং মন্ত্রে, যজুর্বেদের ৩১ নং অধ্যায়ের ১৮ নং অনুচ্ছেদে, বেদের ৮ নং গ্রন্থের ৬ নং অনুচ্ছেদের ১০ নং মন্ত্রে, অথর্ববেদের ৮ নং গ্রন্থের ৫ নং অনুচ্ছেদের ১৬ নং মন্ত্রে এবং ২০ নং গ্রন্থের ১২৬ নং অনুচ্ছেদের ১৪ নং মন্ত্রে আছে যে, নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আহমাদ এর পাশাপাশি আরেক নামে ডাকা হয়েছে। আর সেটা হলো “নরশাংসী”। এর প্রথম অংশ “নর” অর্থ “মানুষ বা ব্যক্তি” আর “শাংসা” অর্থ “যে মানুষ প্রশংসনীয়”। এভাবে নবী (সা.) কে হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোর বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন- ঋগ্বেদের ১ নং গ্রন্থের ১৩ নং অনুচ্ছেদের ৩ নং মন্ত্রে, ১৮ নং অনুচ্ছেদের ৯ নং মন্ত্রে, ১০৬ নং অনুচ্ছেদের ৪ নং মন্ত্রে, ১৪২ নং

অনুচ্ছেদের ৩ নং মন্ত্রে, ২ নং গ্রন্থের ৩ নং অনুচ্ছেদের ২ নং মন্ত্রে ,১০ নং গ্রন্থের ৬৪ নং অনুচ্ছেদের ৩ নং মন্ত্রে, ১৮২ নং অধ্যায়ের ৫৭ নং অনুচ্ছেদে, যজুর্বেদের ২০ নং অধ্যায়ের ৩৭ নং অনুচ্ছেদে, ৫৭ নং অনুচ্ছেদে, ২১ নং অধ্যায়ের ৩১ নং অনুচ্ছেদে, ৫৫ নং অনুচ্ছেদে, ২৮ নং অধ্যায়ের ২ নং অনুচ্ছেদে, ১৯ নং অনুচ্ছেদে, ৪২ নং অনুচ্ছেদে- এছাড়া আরো অনেক জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ভাগবত পুরাণ

১২ নং খন্ডের ২ নং অধ্যায়ের ১৮ থেকে ২০ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে,

"**বিষ্ণুযশা** নামে একজন মহৎ হৃদয়ের ব্রাহ্মণ, যে **শম্ভল** নামক একটি গ্রামের প্রধান, তার ঘরে জন্মাবে কল্কি। তাকে ঈশ্বর উৎকৃষ্ট গুণাবলী দেবেন। আর ঈশ্বর তাকে দিবেন **আটটি অলৌকিক গুণ**। তিনি সাদা **ঘোড়ায় চড়বেন**। তার ডান হাতে থাকবে একটি **তরবারি**।"

বলা হয়েছে, তিনি শম্ভলের প্রধান ব্যক্তির ঘরে জন্ম নিবেন। আমরা জানি, তিনি ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশে প্রধান ব্যক্তির ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন।

কল্কি অবতারের পিতামাতা ও জন্মস্থান নিয়ে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

আরো বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর তাকে দেবেন অতি উৎকৃষ্ট গুণাবলী এবং আটটি অলৌকিক শক্তি।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মতে এ আটটি অলৌকিক শক্তি হলো- জ্ঞান, আত্মসংযম, জ্ঞান বিতরণ, অভিজাত বংশ, সাহসিকতা, কম কথা বলা, মহানুভবতা এবং পরোপকারিতা। এ ৮ টি গুণের সবগুলোই সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

এরপর বলা হয়েছে, কল্কি অবতার একটি সাদা ঘোড়ায় চড়বেন।

আমরা জানি, নবীজি বোরাকে চড়েছিলেন, যখন তিনি মিরাজে যান। (সহীহ বুখারী)

এরপর আরও বলা হয়েছে যে, তার ডান হাতে থাকবে একটি তরবারি। আমরা জানি, মুহাম্মাদ (সা.) যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং আত্মরক্ষার জন্য তার ডান হাতে তরবারি থাকতো।

এরপর ভাগবত পুরাণে প্রথম খন্ডের ৩ নং অধ্যায়ের ২৫ নং মন্ত্রে উল্লেখ রয়েছে, "কলিযুগে যখন রাজারা হবে ডাকাতের ন্যায়, তখন **বিষ্ণুযশের** ঘরে জন্ম নিবে কল্কি।"

এছাড়াও পুরাণের ২ নং অধ্যায়ের ৪ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে,

"**বিষ্ণুযশা** নামে এক ব্যক্তির ঘরে, যিনি মহৎ হৃদয়ের ব্রাক্ষণ, যিনি **শম্ভল** গ্রামের প্রধান, তার ঘরে জন্ম নিবে কল্কি।"

কল্কি পুরাণ

২ নং অধ্যায়ের ৫ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে,

"কল্কিকে **চারজন** সাহায্য করবে"

এখানে মুহাম্মাদ (সা.) এর ৪ জন সাহাবীর কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন- "আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুম"।

৭ নং মন্ত্রে বলা হয়েছে,

"কল্কিকে যুদ্ধক্ষেত্রে **দেবদূতরা** সাহায্য করবে"

পবিত্র কুরআনের ৩ নং সূরা আলে ইমরান এর **১২৩** থেকে **১২৫** নং আয়াতে এবং ৮ নং সূরা আনফাল এর ৪ থেকে ৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- বদরের যুদ্ধে ফেরেশতারা নবীজিকে সাহায্য করেছিলেন আর মুসলমানরা সেই যুদ্ধে জয় লাভ করে।

কল্কি পুরাণের ২ নং অধ্যায়ের **১১** নং মন্ত্রে বলা হয়েছে,

"বিষ্ণুযশা নামক এক ব্যক্তির ঘরে **সুমতির গর্ভে** কল্কি অবতার জন্মাবে"

আবার **১৫** নং মন্ত্রে আছে,

"তিনি মাধব মাসের দ্বাদশ দিনে জন্ম নিবেন"

ধর্মাচার্য অধ্যাপক ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় লিখেছেন, যে ইসলাম গ্রহণ করে না এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর ধর্মমতকে মানে না, সে প্রকৃতপক্ষে হিন্দুও নয়। কারণ হিন্দু ধর্মগ্রন্থে কল্কি অবতার পৃথিবীতে আগমনের পর তাঁকে ও তাঁর ধর্মমতকে মানতে বলা হয়েছে।

ধর্মাচার্য্য অধ্যাপক ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় আরও বলেন, বেদ-পুরাণে উল্লেখিত 'কল্কি অবতার' মুহাম্মাদ (সা.) ছাড়া আর কেউ নয়।

হিন্দুধর্মগ্রন্থে অল্লো উপনিষদে 'আল্লাহ', 'রাসূল', 'মুহাম্মাদ' তিনটি আরবী শব্দযোগে যে শ্লোকটি রয়েছে, তাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁরই রাসূল। (কল্কি অবতার ১১-১৪ পৃ.)

হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসূরিন্দ্রাঃ

অল্লো জ্যৈষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং ব্রহ্মাণং অল্লাম

অল্লো রসূল মুহাম্মদ রকং বরস্য অল্লো অল্লাম

আদাল্লাং বুকমেকং অল্লাবুকংল্লান লির্খতকমঃ"

এবার দেখা যাক জরথুস্ত্রীয় ধর্মে সর্বশেষ নবীর আগমন সম্পর্কে কি বর্ণিত হয়েছে।

জরথুস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থে সর্বশেষ নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী

জরথুস্ট হলেন এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। এটাকে পারসিজমও বলা হয়। এটার উৎপত্তি হয়েছে আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে পারসিয়াতে। এ পারসিমজকে আরো বলা হয় মেগিয়ানিজম অথবা যে ধর্মের অনুসারীরা অগ্নিপূজা করে। পারসিদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হলো **দশাতির** এবং **আভেস্তা**। আভেস্তাকে আবার জেন্দ আভেস্তাও বলা হয়। দশাতির দুই ভাগ। ক্ষুরধা দশাতির ও করণ দশাতির। আভেস্তারও আবার দুই ভাগ, ক্ষুরধা আভেস্তা ও করণ আভেস্তা। অনেকে এগুলোকে বলে জেন্দ বা মহাজেন্দ। আপনারা যদি এই পারসি ধর্মগ্রন্থ পড়েন, সেখানে অনেক জায়গাতেই দেখবেন মুহাম্মাদ (সা.) এর কথা বলা আছে।

জেন্দ আভেস্তার নফারভাস্তি ইয়াস্তের ২৮ অধ্যায়ের ১২৯ অনুচ্ছেদে আছে– "তার নাম হবে '**আস্তাবেদ আরেতা**' অর্থাৎ 'জয়যুক্ত'। তার আরেকটা নাম হবে **সোশিম**।"

আমরা জানি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক যুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিলেন, তাই তিনিই আস্তাবেদ আরেতা। আস্তাবেদ আরেতার আরেক অর্থ হলো- প্রশংসাকারী। নবীজি (সা.) এর অপর নাম- 'আহমাদ'। আহমাদ শব্দের অর্থ 'যে প্রশংসা করে'।

বলা হয়েছে যে, তাকে এখানে ডাকা হবে সোশিম। ইতিহাসের বিশ্বকোষ অনুযায়ী 'সোশিয়েনথ' অর্থ 'যে লোক প্রশংসার যোগ্য বা যে প্রশংসা করেছে', যার আরবি অর্থ 'মুহাম্মাদ'।

জেন্দ আবেস্তার জামিয়াধ ইয়াস্তের ১৬ অধ্যায়ের ৯৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "তার বন্ধুরা চলে আসবে। অর্থাৎ আস্তাবেদ আরেতার বন্ধুরা। তারা শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, তারা চিন্তা ভাবনা করবে, ভালো কথা বলবে, ভালো কাজ করবে আর তাদের জিহ্বায় কোন মিথ্যা থাকবে না।"

এখানে নবীজির সাহাবীগণের কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ নবীজি (সা.) এর সহচরেরা, তারা ভালো মানুষ হবে। তারা চিন্তা ভাবনা করে কাজ করবে, ভালো কথা বলবে, ভালো কাজ করবে, তাদের জিহ্বায় মিথ্যা থাকবে না অর্থাৎ তারা মিথ্যা কথা বলবে না। আর আমরা জানি, সাহাবিগণ সর্বদা সত্য কথাই বলতেন।

দশাতিরেও মহানবী (সা.) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী আছে। এটা পারসিদের আরেকটা ধর্মগ্রন্থ। দশাতির মানে দশ, আর তিরমান খন্ড অর্থাৎ যে বইটির দশটি ভাগ আছে। এটা দস্তুর শব্দের বহুবচন আর এর অর্থ ধর্মীয় আইন। অর্থাৎ এ বইটিতে দশটি ভাগ আছে আর এটা ধর্মীয় আইন।

দশাতিরে উল্লেখ আছে- "পারসিরা যখন তাদের ধর্ম ত্যাগ করবে, যখন তারা নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে, তখন **মরুভূমি থেকে** একজন লোক আসবে, তার অনুসারীরা পারসিদের বশে আনবে। আর তারা পারসিদের রাজ্য জয় করবে। তারা মানুষ জাতির জন্য একটা অনুগ্রহ হবে। তারা তাদের মন্দিরের ভেতর অগ্নি পূজা করবে না। তারা **ইব্রাহীমের** ঈশ্বরের ঘরের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করবে। **তারা কখনো মূর্তি পূজা করবে না**। তারা পারসিয়ার প্রভু ও শাসক হবে। এছাড়াও তারা পারসিয়ার অন্যান্য ধর্মীয় স্থানেও রাজত্ব করবে। তাদের নবী খুব যুক্তিবাদী হবেন আর অলৌকিক কাজ করবেন।"

এ ভবিষ্যৎবাণীতে মুহাম্মাদ (সা.) এর কথাই বলা হয়েছে।

বুন্দাহিসোর ৩০ অধ্যায়ের ৬-২৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "**সোশিয়েন** হবেন শেষ নবী।"

'সোশিয়েন' অর্থ হলো 'প্রশংসনীয়' যার আরবি অর্থ 'মুহাম্মাদ'। আর এখানে উল্লেখ রয়েছে যে, মুহাম্মাদ (সা.) হবেন শেষ নবী।

এবার আসুন দেখি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে সর্বশেষ নবীর আগমন সম্পর্কে কি ভবিষ্যৎবানী করা হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে সর্বশেষ নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী

প্রায় সব বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থেই আছে যে, ভবিষ্যতে একজন মৈত্রেয় (Maitreya) আসবেন।

চিক্কভাতি সিনহনাদ সুতানতার ডি ১১১৭৬-এ বলা আছে, "আরেকজন বুদ্ধ আসবেন, তিনি **মৈত্রেয়**। তিনি পবিত্র, সবার উপরে, তিনি আলোকপ্রাপ্ত। তিনি খুব জ্ঞানী আর বিনয়ী। তিনি মঙ্গলজনক, যার রয়েছে বিশ্ব জগতের জ্ঞান। তিনি অলৌকিকভাবে আহরিত জ্ঞান পুরো পৃথিবীতে প্রচার করবেন। তিনি একটি ধর্ম প্রচার করবেন, যেটা শুরুতে গৌরবময় থাকবে, চরম সময়ে গৌরবময় থাকবে আর শেষেও গৌরবময় থাকবে। তিনি একটি জীবন দর্শন প্রচার করবেন, যেটা হবে সত্য এবং শাশ্বত। তার সাথে কয়েক হাজার সন্ন্যাসী থাকবে। যেখানে আমার সাথে কয়েক'শ সন্ন্যাসী থাকে।"

একথা আরো বলা হয়েছে Sacred Book of East এর ৩৫ নং খণ্ডের ২২৫ নং পৃষ্ঠায়- "একজন **মৈত্রেয়** আসবেন, যার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আর গুণ থাকবে।" এরপরে বলা হয়েছে যে, "তিনি হাজার হাজার মানুষকে নেতৃত্ব দেবেন যেখানে আমি দিয়েছি মাত্র কয়েক'শ মানুষকে।"

"He will be the leader of a brotherhood several thousands in number, as I am now the leader of a brotherhood several hundreds in number."

গসপেল অব বুদ্ধ এর ২১৭ ও ২১৮ নং পৃষ্ঠায় আরো আছে যে, "আনন্দ বুদ্ধকে প্রশ্ন করলেন, হে আশির্বাদ প্রাপ্ত! আপনি চলে গেলে কে আমাদের পথ দেখাবে? জবাবে গৌতম বুদ্ধ বললেন- আমি পৃথিবীর প্রথম বুদ্ধ নই। এমনকি শেষ বুদ্ধও আমি নই। ভবিষ্যতে আরেকজন বুদ্ধ পৃথিবীতে আসবেন, তিনি পবিত্র, সবার উপরে, আলোক প্রাপ্ত, এবং খুব জ্ঞানী আর

বিনয়ী হবেন। যিনি মঙ্গলজনক, যার রয়েছে বিশ্ব জগতের জ্ঞান। তিনি প্রচার করবেন সর্বোত্তম ধর্ম। তিনি যে ধর্ম প্রচার করবেন তা শুরুতে গৌরবময় থাকবে, চরম সময়ে গৌরবময় থাকবে আর শেষেও গৌরবময় থাকবে। তিনি যে ধর্ম প্রচার করবেন তার ভিত্তি হবে সত্য আর সেটাই হবে শাশ্বত জীবন দর্শন। আর তার থাকবে হাজার হাজার শিষ্য যেখানে আমার আছে মাত্র কয়েক'শ। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ তাকে প্রশ্ন করলেন, আমরা তাকে কিভাবে চিনতে পারব? বুদ্ধ উত্তর দিলেন, তাঁর নাম হবে **মৈত্রেয়**।"

"And the Blessed One replied : "I am not the first Buddha who came upon earth, nor shall I be the last.
.... Ananda said: How shall we know him? The Blessed One said: He will be known as Maitreya, which means he whose name is kindness."

সংস্কৃত শব্দ **'মৈত্রেয়'** অর্থ- ক্ষমাশীল, স্নেহময়, দয়ালু, করুণাময়। এ শব্দটির আরবি অর্থ হলো- **'রাহমাহ'**।

কুরআনে সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে নবী মুহাম্মাদ (সা.) কে সৃষ্টিজগতের **রাহমাহ** স্বরূপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ

অর্থ : আর আমি তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য **রহমত (রাহমাহ) স্বরূপ** প্রেরণ করেছি।

তাহলে বৌদ্ধ ধর্মে মাইত্রি সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)।

নবীজি সম্পর্কে বৌদ্ধ ধর্মে আরো অনেক ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে।

Sacred Book of East এর ১১ নং খন্ডের ৩৬ নং পৃষ্ঠায়, মহা পরিনিব্বান সুত্তা ২ নং অধ্যায়ের ৩২ অনুচ্ছেদে আছে, "হে আনন্দ তথাগতরা বা শিক্ষকরা জ্ঞান লুকিয়ে রাখবে না। জ্ঞানটা তোমাদের নিজের কাছে রেখে দেবে না। এটা প্রচার করতে হবে।"

আমরা জানি, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর কাছ থেকে ওহী হিসেবে যা পেয়েছিলেন, সেটা সবার মাঝে প্রচার করেছেন। আর সাহাবাগণকেও মানুষের মাঝে এগুলো প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

Sacred Book of East এর ১১ নং খণ্ডের ৫৭ নং পৃষ্ঠায়, মহা পরিনিব্বান সুত্তার ৫ নং অধ্যায়ের ৩৬ নং পদে বলা আছে যে, "গৌতম বুদ্ধের যেমন এক পরিচারক আছে আনন্দ, তেমনি **মৈত্রেয়রও** এক পরিচারক থাকবে।" "Then the Blessed One addressed the brethren, and said: 'Whosoever, brethren, have been Arahat-Buddhas through the long ages of the past, there were servitors just as devoted to those Blessed Ones as Ananda has been to me. And whosoever, brethren, shall be Arahat-Buddhas in the long ages of the future, there shall be servitors just as devoted to those Blessed Ones as Ananda has been to me."

ইতিহাস বা নবীজি (সা.) এর সীরাত থেকে আমরা জানি, নবীজি (সা.) এর পরিচারকের নাম ছিল হযরত আনাস (রা.)। তিনি ছিলেন মালিকের পুত্র। হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, আট বছর বয়সে আমার বাবা-মা আমাকে নবীজির হাতে তুলে দেন। তার মা নবীজিকে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! একে আপনার পরিচারক হিসেবে গ্রহণ করুন। হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, নবীজি (সা.) তাকে নিজের ছেলের মতই দেখতেন। আমরা জানি, হযরত আনাস (রা.) সব সময় নবীজির সঙ্গে থাকতেন, এমনকি বিপদের সময়ও।

যখন গৌতম বুদ্ধের দিকে একটা পাগলা হাতী তেড়ে এল আনন্দ তখন বুদ্ধের সামনে দাড়িয়েছেন। একইভাবে ওহুদের যুদ্ধের সময় শত্রুরা যখন নবীজিকে ঘিরে ফেলল, হযরত আনাস (রা.) তখন নবীজির পাশেই ছিলেন। তখন তার বয়স ছিল এগারো বছর। হুনাইনের যুদ্ধেও শত্রুর তীরন্দাজ বাহিনী যখন নবীজিকে ঘিরে ফেলে, আনাস (রা.) তখনো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাশেই ছিলেন।

গসপেল অব বুদ্ধ এর ২১৪ নং পৃষ্ঠায় আছে যে, "মৈত্রেয়র ছয়টি গুণ থাকবে। তিনি রাতের বেলা আলোকপ্রাপ্ত হবেন, আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার পর

উজ্জ্বল হবেন, তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা যাবেন, তিনি রাতের বেলা মারা যাবেন, মারা যাবার সময় তিনি উজ্জ্বল হবেন, মারা যাওয়ার পর এ পৃথিবীতে আর কখনো তাকে স্বশরীরে দেখা যাবে না।”

এ ছয়টি গুণাবলী মহানবী (সা.) এর মাঝে বিদ্যমান ছিল।

প্রথমতঃ তিনি রাতের বেলা আলোকপ্রাপ্ত হবেন। আমরা জানি, নবীজি (সা.) রাতের বেলায়ই প্রথম ওহী লাভ করেন। কুরআনের সূরা দুখানের ২ ও ৩ নং আয়াত এবং সূরা ক্বদরের ১নং আয়াতে আছে, কুরআন নাযিল হয়েছিল- মহিমান্বিত রাতে।

দ্বিতীয়তঃ আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি উজ্জ্বল হবেন। আমরা জানি, নবীজি (সা.) তখন উজ্জ্বল হয়েছিলেন, আলোকিত হয়েছিলেন।

তৃতীয়তঃ তিনি স্বাভাবিকভাবে মারা যাবেন। আমরা জানি, তার ওফাত স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিল।

চতুর্থতঃ তিনি মারা যাবেন রাতের বেলা। আয়েশা (রা.) এর হাদীস থেকে আমরা জানি যে, নবীজির ঘরে প্রদীপে তেল ছিল না, তিনি পাশের বাড়ি থেকে তেল ধার নিয়েছিলেন। অর্থাৎ নবীজি (সা.) এর ওফাতের সময় রাত ছিল।

পঞ্চমতঃ তিনি মারা যাওয়ার সময় উজ্জ্বল হবেন। হযরত আনাস (রা) বলেছেন যে, নবীজি (সা.) ওফাতের সময় খুব উজ্জ্বল ছিলেন।

সবশেষেঃ মারা যাবার পর তাকে আর কখনো স্বশরীরে পৃথিবীতে দেখা যাবে না। আমরা জানি, নবী মুহাম্মাদ (সা.) আর ফিরে আসবেন না। মদিনায় তার রওজা রয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত এসকল কথা শুধুমাত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

Sacred Book of East এর ১০ নং খন্ডের ৬৮ নং পৃষ্ঠায় আরো বলা হয়েছে, “তথাগতরা শুধু প্রচার করবে।”

অর্থাৎ যে বুদ্ধরা আসবেন তারা শুধু প্রচার করবেন।

সূরা গাশিয়ার ২১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা নবীজি (সা.) কে ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন-

فَذَكِّرْ ۗ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ

অর্থঃ অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র।

ধর্মপরা মাত্তা সত্তার ১৫১-তে সর্বশেষ বুদ্ধ বা মৈত্রেয়র বর্ণনায় বলা আছে, "তিনি হবেন মানব জাতির প্রতি করুনা। তিনি হবেন ভদ্র, মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত, দয়ালু, আর তিনি হবেন সত্যবাদী।"

নবীজির সীরাত অধ্যয়ন থেকে জানা যায়, এ কথাগুলো সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আসুন এবার দেখি, প্রচলিত যাবুর শরীফে সর্বশেষ নবীর আগমন সম্পর্কে কি বলা হয়েছে।

প্রচলিত যাবুর শরীফে সর্বশেষ নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী

সামসঙ্গীত মালা/গীতসংহিতা, প্রচলিত যাবুর শরীফের ৪৫:১-৫, ৭, ৯, ১২, ১৬, ১৭ পদে বলা হয়েছে,

"(১) আমার অন্তর সুন্দর ভাবধারায় ভরে উঠেছে; **বাদশাহর উদ্দেশ্যে আমার কবিতা বেরিয়ে আসছে;** আমার **জিভ্ পাকা লেখকের লেখনী** হয়ে উঠেছে।

"My heart is overflowing with a good theme; I recite my composition concerning the King; My tongue is the pen of a ready writer." (Psalm 45:1)

(২) মানুষের মধ্যে তুমি **পরম সুন্দর;** তোমার দু'টি ঠোঁট **কথার মধুতে** ভেজা; আল্লাহর চিরকালের দোয়া তোমার উপর ঝরে পড়েছে।

"You are fairer than the sons of men; Grace is poured upon Your lips; Therefore God has blessed You forever." (Psalm 45:2)

(৩) হে বীর, তোমার কোমরে **তলোয়ার** বেধে নাও; গৌরব ও মহিমার সাজে তুমি সেজে নাও।

"Gird Your sword upon Your thigh, O Mighty One, With Your glory and Your majesty." (Psalm 45:3)

(৪) **সত্য, নম্রতা আর ন্যায়ের পক্ষে** তুমি নিজের মহিমায় বিজয়ীর মত যাত্রা কর; তোমার **ডান হাত** ভয়-জাগানো মহান কাজ করুক।

"And in Your majesty ride prosperously because of truth, humility, and righteousness; And Your right hand shall teach You awesome things." (Psalm 45:4)

(৫) বাদশাহর শত্রুদের বুকে তোমার ধারালো **তীর** বিঁধে যায়; তোমার শত্রুজাতি তোমার **পায়ের তলায়** পড়ে।

“Your arrows are sharp in the heart of the King’s enemies; The peoples fall under You.” (Psalm 45:5)

(৭) তুমি **ন্যায় ভালবাস** আর **অন্যায়কে ঘৃণা** কর; সেজন্য আল্লাহ্‌, তোমার আল্লাহ, তোমার সংগীদের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ তেলের মত করে তোমার উপর ঢেলে দিয়েছেন।

“You love righteousness and hate wickedness; Therefore God, Your God, has anointed You With the oil of gladness more than Your companions.” (Psalm 45:7)

(৯) তোমার **সম্মানিত মহিলাদের মধ্যে রাজকন্যারা** আছেন।

“Kings’ daughters are among Your honorable women.” (Psalm 45:9)

(১২) টায়ার শহরের লোকেরা **উপহার** নিয়ে আসবে; খুব ধনী লোকেরা তোমার রহমত চাইবে।

“And the people of Tyre will come with a gift; The rich among the people will seek your favor.” (Psalm 45:12)

(১৬) তোমার পূর্বপুরুষদের জায়গা তোমার ছেলেরা নেবে; মানুষের মধ্যে তুমি তাদের শাসনকর্তা করবে।

“Instead of Your fathers shall be Your sons, Whom You shall make princes in all the earth.” (Psalm 45:16)

(১৭) বংশের পর বংশ আমি তোমার নাম বাঁচিয়ে রাখব; সেজন্য বিভিন্ন জাতি যুগের পর যুগ তোমার প্রশংসা করবে।”

“I will make Your name to be remembered in all generations; Therefore the people shall praise You forever and ever.” (Psalm 45:17)

(**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr),
(THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

ইহুদী-খ্রিষ্টানরা একমত যে, এই গীতে দাউদ তাঁর পরের যুগে আগত একজন নবীর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বানী করেছেন। ইহুদীদের মতে এ সকল

গুণাবলির অধিকারী সেই প্রতিশ্রুত নবী এখনো আগমন করেন নি। প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতরা দাবি করেন যে, ঈসাই সেই প্রতিশ্রুত ভাববাদী। আর অতীত ও বর্তমান সকল যুগে বহু গবেষক দাবি করেন যে, মুহাম্মাদ (সা.)-ই সেই প্রতিশ্রুত নবী।

যাবুর শরীফের এই গীতে প্রতিশ্রুত নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর ধারাবাহিক পর্যালোচনা নিম্নরূপ-

প্রথম পদ (ওহীর সূচনা): প্রথম অংশে ওহীর সূচনার কথা বলা হয়েছে। আমরা জানি, নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর ওপর সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয় সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত; যার প্রথম আয়াতটি ছিল-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَۚ ١

"পড়ুন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

দ্বিতীয় অংশে 'জিভ্ পাকা লেখকের লেখনী' হওয়ার দ্বারা মহানবী (সা.) এর একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হলো- তিনি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও বা একান্ত নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা এমন অসাধারণ, অভূতপূর্ব সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ পাওয়া- তা যেন পাকা লেখকের লেখনী হয়ে যাওয়ার মতোই।

দ্বিতীয় পদ (তিনি সুন্দর): সৌন্দর্য সম্পর্কে আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) সুন্দরতম, শ্রেষ্ঠদাতা এবং সেরা বাহাদুর ছিলেন। (সহীহ মুসলিম ৫৮০৩, ৬১৪৬, ইবনে মাজাহ ২৭৭২)

আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে অধিক সুন্দর আর কিছুই আমি দেখিনি। মনে হত সূর্য তাঁর কপালে চমকাচ্ছে। আর যখন তিনি হাঁসতেন তখন চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে যেত। (সহীহ বুখারী ৫৫১০, ইবনে হিব্বান ৬৩০৯, মুসনাদে আহমদ ৮৬০৪, তিরমিযী ৩৪৪৮)

যদি আমরা চারিত্রিক সৌন্দর্য ধরে নেই, তবে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ٤

"নিশ্চয় তুমি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত"। (সূরা কলম, আয়াত: ৪)

নবী সহধর্মিনী উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা.) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চেয়ে উত্তম চরিত্রের কাউকে দেখিনি।' (আল-মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি: ২৫৭৮)

আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, 'একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সঙ্গে যাচ্ছিলাম। তখন তাঁর গায়ে মোটা পাড়ের একটি নাজরানি চাদর ছিল। এক বেদুইন তাঁর কাছে এসে চাদর ধরে হেঁচকা টান দেয়। আমি দেখি, এই প্রচণ্ড টানের ফলে তাঁর কাঁধ ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে চাদরের পাড়ের দাগ বসে যায়। তারপর সে বলে, "তোমার কাছে আল্লাহর যে সম্পদ আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দিতে বলো।" রাসূলুল্লাহ (সা.) তার দিকে তাকিয়ে হাসেন এবং তাকে কিছু দেওয়ার আদেশ দেন।' (সহীহুল বুখারী: ৩১৪৯, সহীহুল মুসলিম: ১০৫৭)

(তাঁর কথার মাধুর্য)- শত্রু-মিত্র সকলেই তাঁর কথার মাধুর্য ও ভাষার আকর্ষণীয়তার বিষয়ে একমত হয়েছেন। তাঁর কথার বর্ণনায় বর্ণনাকারীরা বলেছেন, "তিনি সবচেয়ে সত্যবাদী মানুষ ছিলেন"; যে কারণে সকলেই তাকে 'আল-আমিন' বলে ডাকত। 'আল-আমিন' অর্থ 'বিশ্বাসী'।

আনাস (রা.) বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমি নয় বছর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খিদমত করেছি। এই দীর্ঘ সময়ে কোনো দিন এমন হয়নি- আমি কোনো কাজ করেছি আর তিনি আমাকে বলেছেন, "এই কাজ কেন করেছ?" কিংবা আমি কোনো কাজ করিনি আর তিনি বলেছেন, "এই কাজ কেন করোনি?" (সহীহ বুখারী: ২৭৬৮, সহীহ মুসলিম: ২৩১০)

আনাস (রা.) আরেক হাদিসে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। একবার তিনি আমাকে একটি কাজে পাঠান। আমি বলি, আল্লাহর কসম, আমি যাবো না। কিন্তু আমার অন্তরে ছিল, রাসূলুল্লাহ (সা.) যে কাজে আমাকে পাঠাচ্ছেন আমি যাবো। তারপর আমি বের হয়ে হাঁটতে থাকি। একসময় বাজারে খেলাধুলারত কিছু ছেলেদের পাশ দিয়ে যাই। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.) পেছন থেকে আমার ঘাড় ধরেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি হাসছেন। তিনি বলেন, "আদরের আনাস, আমি যেখানে যেতে বলেছিলাম, তুমি কি সেখানে গিয়েছ?"

আমি বলি, "হ্যাঁ, আমি যাচ্ছি হে আল্লাহর রাসূল।" (সহীহ মুসলিম: ২৩১০)

তৃতীয় পদ (তরবারীধারী) অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মুহাম্মাদ (সা.) এর শরিয়তেই জিহাদের বিধান ছিল এবং আছে। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২১৬)

ইবনু ইসহাক রহ. বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর তরবারির নাম ছিল ‘যুলফিকার’। (ইবনে হিশাম ৩.৭৯; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াঃ ৬.২৫)

চতুর্থ পদ (সততা ও ধার্মিকতা): আমরা জানি যে, বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতা নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রকৃতিগত গুণ ছিল। তার জন্মগত সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার বিষয়ে মক্কার প্রসিদ্ধ কাফির নেতা নাদার ইবনে হারেস কুরাইশদেরকে বলেছিলেন, “মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যেই বড় হয়েছে। কিশোর বয়স থেকেই সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সন্তোষজনক স্বভাব ও আচরণের অধিকারী, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সত্যপরায়ণ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আমানতদার। এভাবে ছোট থেকে বড় হয়ে যখন তার মাথার চুল পাকার উপক্রম করল এবং তার নতুন ধর্ম নিয়ে সে আসল, তখন তোমরা বলছ যে, সে জাদুকর। আল্লাহর শপথ, সে কখনোই জাদুকর নয়। তোমরা তাকে বললে জ্যোতিষী। আল্লাহর শপথ, সে জ্যোতিষী নয়।” (সীরাতে ইবনে হিশাম, সীরাত- আর রাহীকুল মাখতুম)

৭ম হিজরী সালে (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে) রাসূলুল্লাহ (সা.) ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে তৎকালীন সকল রাজা ও শাসককে পত্র লেখেন। বাইজেন্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস (Heraclius) যখন পত্র পান তখন মক্কার কাফিরদের নেতা আবু সুফিয়ান বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। হেরাক্লিয়াস তাকে ডেকে নিয়ে পত্র-প্রেরক সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, “তিনি যে কথা বলছেন, সে কথা বলার আগে আপনারা কি তাকে কখনো মিথ্যা বলার কারণে অভিযুক্ত করেছেন?” আবু সুফিয়ান বলেন, “না।” (সহীহ বুখারীঃ ১২৯৫, সহীহ মুসলিমঃ ১৭৭৩)

(ডানহাতে আশ্চর্যজনক কাজ)- আমরা জানি, বদরের যুদ্ধের দিন এবং হুনাইনের যুদ্ধের দিন নবীজি (সা.) তাঁর ডান হাতে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে যুদ্ধরত কাফির সেনাবাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেন (সূরা আনফালঃ আয়াত ১৭)। এতে শত্রুবাহিনীর প্রত্যেক যোদ্ধার চক্ষু আক্রান্ত হয় এবং তারা চক্ষু সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে মুসলিম বাহিনীর সামনে তারা পরাজিত হয় এবং মুসলিম বাহিনী যুদ্ধরত অনেক শত্রুকে হত্যা করতে এবং অনেককে বন্দি করতে সক্ষম হয়। (সীরাত- আর-রাহীকুল মাখতুম)

পঞ্চম পদ (বাণগুলোর তীক্ষ্মতা): ইসমাঈলের বংশধররা প্রাচীনকাল থেকেই বাণ ব্যবহারের জন্য প্রসিদ্ধ। এ বিষয়টি কোনো ব্যাখ্যা-বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তীরন্দাযি বা তীর নিক্ষেপ ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রিয় কর্ম। তিনি বলতেন, "অচিরেই রোমান সাম্রাজ্য তোমাদের অধীনে আসবে। আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবেন (তিনিই তোমাদের বিজয় নিশ্চিত করবেন)। কাজেই তোমাদের কেউ যেন তার তীরগুলো নিয়ে খেলা করতে অক্ষম না হয়।" তিনি আরো বলতেন, "হে ইসমাঈলের সন্তানগণ, তোমরা নিক্ষেপ কর, কারণ তোমাদের পিতা (ইসমাঈল) তীরন্দায ছিলেন।" তিনি আরো বলতেন, "যে ব্যক্তি বাণ নিক্ষেপ শিক্ষা করার পরে তা ছেড়ে দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (সহীহ মুসলিম: ৪৭৯৭)

(শক্তি ও প্রতাপ)- নবী মুহাম্মাদ (সা.) পরিপূর্ণ দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) সুন্দরতম, শ্রেষ্ঠদাতা এবং সেরা বাহাদুর ছিলেন। (সহীহ মুসলিম: ৫৮০৩, ৬১৪৬, বায়হাকী: ১৮৩৪১, ইবনে মাজাহ: ২৭৭২)

দৈহিক শক্তির পাশাপাশি তিনি অতুলনীয় বীরত্ব ও সাহসের অধিকারী ছিলেন। ইবনু উমার (রা.) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চেয়ে অধিক সাহসী, বিপদগ্রস্ত মানুষকে রক্ষার জন্য অধিক আগ্রহী ও অধিক দানশীল আর কাউকে দেখিনি।"

আলি (রা.) বলেন, 'বদরের দিন যখন যুদ্ধ প্রবল আকার ধারণ করলো, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পেছনে আশ্রয় নিলাম। সেদিন তিনিই ছিলেন আমাদের মাঝে সবচেয়ে তীব্র আক্রমণকারী এবং তিনিই ছিলেন মুশরিকদের সবচেয়ে নিকটে।' (মুসনাদে আহমদ: ১০৪৫)

আল-বারা' ইবনে আযিব (রা.) বলেন, 'যখন যুদ্ধের প্রচণ্ডতা চলে আসত, আমরা রাসূল (সা.) এর পেছনে আত্মরক্ষা করতাম। আর আমাদের মাঝে তারাই ছিল বীর, যারা তাঁর সাথে সামনে এগিয়ে যেতেন।' (সহীহুল মুসলিম: ১৭৭৬)

আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, 'রাসূল (সা.) ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর। সবচেয়ে বেশি মহানুভব। সবার চেয়ে বেশি বীরত্বের অধিকারী। একরাতে

মদিনাবাসী বিকট একটি আওয়াজ শুনলো। সবাই আওয়াজের উৎসের দিকে দৌড়াতে লাগল। পথেই রাসূল (সা.) তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তিনি তখন ওদিক থেকে ফিরছিলেন, সবার আগেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। তখন তিনি আবু তালহার পালানবিহীন একটি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলেন। তাঁর ঘাড়ে তলোয়ার। তিনি বলছিলেন, ভয়ের কিছু নেই। তোমরা নির্ভয় হও।' (সহীহুল বুখারী: ২৯০৮, সহীহুল মুসলিম: ২৩০৭)

সপ্তম পদ (ধার্মিকদের প্রেম ও দুষ্টদের ঘৃণা): রাসূলুল্লাহ (সা.) যেমন তার সাহাবীদের ভালোবাসা পেয়েছেন তেমনি তিনি মক্কার কাফেরদের ষড়যন্ত্র এবং অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছেন।

মুহাম্মাদ (সা.) এর মধ্যে সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সর্বোত্তম মানবীয় গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল। জ্ঞান, কর্ম, বংশমর্যাদা, দৈহিক গুণাবলি ও মানসিক গুণাবলীর চরম উৎকর্ষতা ও পূর্ণতা তিনি পেয়েছিলেন।

নবম পদ (রাজকন্যাদের সেবা) সম্পর্কে আমরা জানি, মক্কার নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবা (রা.), আবু বকর (রা.) এর কন্যা আয়িশা (রা.) এবং উমর (রা.) এর কন্যা হাফসা (রা.) প্রমুখ নবীজি (সা.) এর স্ত্রী ছিলেন। (সীরাত- আর রাহীকুল মাখতুম)

দ্বাদশ পদ (উপহার-উপঢৌকন, ধনী প্রজাদের মিনতি/অনুগ্রহ চাওয়া): ইথিওপিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী (The Negus of Ethiopia), ওমান ও বাহরাইনের রাজা মুনযির ইবনু সাবী প্রমুখ ধনী প্রজা তার অধীনতা স্বীকার করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাঁর নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মিসরের আলেকজেন্দ্রীয়ার রোমান শাসক মুকাওকিস তাঁর জন্য দুইজন দাসী, একটি উন্নতজাতের খচ্চর, একটি সাদা-কালো রঙের গাধা, একটি ঘোড়া, কিছু মূল্যবান পোশাক উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেন। (সীরাত- আর-রাহীকুল মাখতুম)

ষষ্টদশ পদটিও নবীজি (সা.) এর ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকে ইমাম হাসান খিলাফত লাভ করেন। তারপর তাঁর বংশধর ইয়েমেন, হেজাজ, মিসর, মরক্কো, সিরিয়া, পারস্য, ভারত ও

অন্যান্য দেশে সর্বোচ্চ শাসন ক্ষমতা থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকারের নেতৃত্ব লাভ করেছেন। এখনো পর্যন্ত হেজাজ, ইয়েমেন ও অন্যান্য দেশে তাঁর বংশধরদের মধ্যে অনেকে শাসনক্ষমতা বা অন্যান্য নেতৃস্থানীয় পদ অলংকৃত করছেন। ভবিষ্যতে তাঁরই বংশ থেকে ইমাম 'মাহদী' আবির্ভূত হবেন। তিনি পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হবেন এবং তাঁর সময়ে পৃথিবীর সর্বত্র আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী হবে। (ইযহারুল হক, ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর অনূদিত)

সপ্তদশ পদ (পুরুষপরম্পরায় তাঁর নাম স্মরণ ও জাতিগণ কর্তৃক চিরকাল তাঁর প্রশংসা): যুগের পর যুগ হাজার হাজার মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রতিদিন পাঁচবার আযানের ধ্বনিতে সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করছেন, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল)। অগণিত মুসল্লী প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে অগণিতবার তাঁর জন্য দুরুদ ও সালাম পাঠ করছেন। অগণিত প্রচারক তাদের ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে তাঁরই প্রচার করছেন। জ্ঞানী-গুণী, শাসক-প্রশাসক সকলেই তাঁর রওজা মোবারকে উপস্থিত হচ্ছেন, তাঁকে সালাম জানাচ্ছেন এবং তাঁর শাফায়াত লাভের আশা করছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ؕ ٤

"আর আমি আপনার (মর্যাদা বৃদ্ধির) জন্য আপনার স্মরণকে সমুন্নত করেছি।" (সূরা ইনশিরাহ, আয়াতঃ ৪)

প্রিয় পাঠক, সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় একথা সুস্পষ্ট যে, উপরিউক্ত ভবিষ্যৎবাণী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আসুন এবার দেখি, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থে সর্বশেষ নবীর আগমন সম্পর্কে কি বলা হয়েছে।

ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মগ্রন্থে সর্বশেষ নবীর আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী

'ধর্মপুস্তক/পবিত্র বাইবেল/কিতাবুল মোকাদ্দস' ধর্মগ্রন্থের নাম। এই ধর্মগ্রন্থের দুইটি ভাগ রয়েছে- পুরাতন নিয়ম/العهد القديم/Old Testament ও নবসন্ধি বা নতুন নিয়ম/العهد الجديد/New Testament.

পুরাতন নিয়মে বা ওল্ড টেস্টামেন্টে আছে ঈসার জন্মের পূর্ব পর্যন্ত ইসরাঈল জাতির ইতিহাস অর্থাৎ সে সব নবীদের কথা বলা আছে, যারা ঈসা (আ.) এর পূর্বে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। আর নতুন নিয়মে বা নিউ টেস্টামেন্টে আছে ঈসা ও তার শিষ্যদের কার্যকলাপের বিবরণ।

খ্রিষ্টানদের বৃহৎ দল তিনটি, ক্যাথলিক বা সর্বজনীন, অর্থোডক্স বা গোঁড়া, প্রটেস্ট্যান্ট বা প্রতিবাদী। প্রত্যেকের বাইবেলের মধ্যে ব্যবধান আছে। যেমন, ক্যাথলিক- ৪৬ পুস্তক, অর্থোডক্স- ৫১ পুস্তক, প্রটেস্ট্যান্ট- ৩৯ পুস্তক। এখানে মনে রাখতে হবে যে, পুরাতন নিয়মটি মূলত ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ। ইহুদী বাইবেল বা 'তানাখ' (Tanakh/Tenak)- এর পুস্তক সংখ্যা ২৪। পুরাতন নিয়মের মূল ভিত্তি গ্রীক সেপ্টুআজিন্ট (Septuagint)- এর মধ্যে ৫৩টি পুস্তক, অর্থোডক্স পুরাতন নিয়মে ৫১টি পুস্তক, ক্যাথলিক বাইবেলে ৪৬টি পুস্তক এবং প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলে ৩৯টি পুস্তক।

কিতাবুল মোকাদ্দসে সর্বশেষ নবী

ওল্ড টেস্টামেন্ট

মূসা (আ.) বলেছেন, "মাবুদ আমাকে বললেন, আমি **তাদের ভাইদের মধ্য থেকে** তাদের জন্য **তোমার মত একজন নবী** দাঁড় করাব। তাঁর মুখ দিয়েই আমি আমার কথা বলব, আর আমি যা বলতে তাকে হুকুম দেব সে তা-ই তাদের বলবে। সেই নবী আমার নাম করে যে কথা বলবে কেউ যদি

আমার সেই কথা না শোনে, তবে আমি নিজেই সেই লোককে দায়ী করব।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৭-২২)

"I will raise up for them a Prophet like you from among their brethren, and will put My words in His mouth, and He shall speak to them all that I command Him. And it shall be that whoever will not hear My words, which He speaks in My name, I will require it of him." **(**Deuteronomy 18:18-19)

(The MacArthur Daily Bible by John F. MacArthur, Jr)

ঈশ্বর বলেছেন, আমি তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তাদের জন্য **তোমার মত** একজন নবী দাঁড় করাব। অর্থাৎ মূসা (আ.) এর মত হবে।

খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস, এ কথাগুলো বলা হয়েছে যীশু খ্রিষ্ট বা ঈসা (আ.) সম্পর্কে। তারা বলে, যে নবী আসবেন তিনি মূসা (আ.) এর মতো হবেন, আর ঈসা (আ.) ছিলেন মূসা (আ.) এর মতোই।

আবার ইহুদীরা দাবী করে যে, সেই প্রতিশ্রুত নবী এখনও আসেননি।

লক্ষ করলে দেখা যায়, এই ভবিষ্যদ্বাণী সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যমান নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর সাথে।

ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে "আমি **তাদের ভাইদের মধ্য থেকে** তাদের জন্য তোমার মত একজন নবী দাঁড় করাব।" বনি-ইসরাঈলদের ভাইয়ের বংশ হলো বনি-ইসমাঈল বংশ। (পয়দায়েশ ১৬:১৫-১৬, ২১:৩-৫)

শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি-ইসমাঈল তথা ইসরাঈলদের ভাইয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন।

এরপর বলা হয়েছে 'তোমার মত একজন নবী' অর্থাৎ শেষ নবী মূসার মতো হবেন। বাইবেলে আছে "বনি-ইসরাঈলদের মধ্যে মূসার মত আর কোন নবীর জন্ম হয়নি" (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:১০)। এটা প্রমাণ করে যে, শেষ নবী মূসার মতো হবেন এবং বনি-ইসরাঈল বংশে নয় বরং তাদের ভাইদের বংশে (বনি-ইসমাঈল বংশে) আসবেন।

এ সত্ত্বেও কেউ যদি দাবি করে যে, মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.); তারা দুজনেই আল্লাহর নবী ছিলেন। তাই এখানে যীশু বা ঈসা (আ.) সম্পর্কেই বলা হয়েছে। তবুও এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

কারণ এ ব্যাপারে এক হলেই যদি দাবী করা হয় যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত নবী, তাহলে বাইবেলে যতজন নবীর উল্লেখ আছে মূসা (আ.) এর পরে সবার ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। যেমন- সোলায়মান, ইজিফিয়েল, আইজেক, আইজায়া, দানিয়েল, হোসিয়া, জোয়েল, জন্দা ব্যাপ্টিস্ট।

লক্ষ্যণীয় যে, মুহাম্মাদ (সা.) নিঃসন্দেহে সামগ্রিকভাবে মূসার সদৃশ ছিলেন। বিষয়টি সহজে বুঝার জন্য নিচের ছকটি লক্ষ্য করুন-

হযরত মূসা (আ.)	হযরত মুহাম্মাদ (সা.)	হযরত ঈসা (আ.)
(১) মাতা-পিতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছেন।	(১) মাতা-পিতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছেন।	(১) পিতা ছাড়া শুধু মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছেন। (লূক ২:১-৭)
(২) বিবাহ করেছেন।	(২) বিবাহ করেছেন।	(২) বিবাহ করেন নি।
(৩) সন্তান-সন্ততির পিতা ছিলেন।	(৩) সন্তান-সন্ততির পিতা ছিলেন।	(৩) সন্তান-সন্ততি ছিল না।
(৪) স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছেন।	(৪) স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছেন।	(৪) আকাশে চলে গেছেন। (মথি ২৮ অধ্যায়)
(৫) সম্মানীত ও মর্যাদাবান নেতা এবং শাসক ছিলেন।	(৫) সম্মানীত ও মর্যাদাবান নেতা এবং শাসক ছিলেন।	(৫) তিনি সাধারণ নাগরিক ছিলেন, শাসক ছিলেন না। (যোহন ১৮:৩৬)
(৬) দুনিয়াতে আর আসবেন না।	(৬) দুনিয়াতে আর আসবেন না।	(৬) দুনিয়াতে আবার আসবেন। (মথি ২৪:১-৪৪)

নিউ টেস্টামেন্ট

ঈসা বলেছেন, “তোমাদের কাছে থাকতে থাকতেই আমি এসব কথা বললাম। কিন্তু সেই সহায়, পাক-রূহ্, যাকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দেবেন, তিনি সমস্ত বিষয়ে তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন এবং আমি যা যা বলেছি, সেসব স্মরণ করিয়ে দিবেন।” (ইউহোন্না ১৪:২৫-২৬)

“These things I have spoken to you while being present with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you.” (John 14:25-26)
(The MacArthur Daily Bible by John F. MacArthur, Jr)

উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয়। কারণ বাইবেলের পবিত্র আত্মা খ্রিষ্টানদের কিছুই শিক্ষা দেয়নি। (দেখুন, প্রেরিত ২৩:১-৫)

মুহাম্মাদ (সা.) এর ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণীটি পুরোপুরি প্রযোজ্য।

প্রথমতঃ তিনি মানুষকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় থেকে শুরু করে সবকিছু শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করলে জানতে পারবেন।

দ্বিতীয়তঃ ‘আমি যা বলছি সেই সব মনে করিয়ে দেবেন’। মুহাম্মাদ (সা.) ঈসা (আ.) এর কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। (দেখুন, কুরআন- সূরা সফ, আয়াতঃ ৬; সূরা মায়েদা, আয়াতঃ ১১৬; সূরা আলে ইমরান, আয়াতঃ ৪৫)

ইহুদী নেতা ও ইমামদের সামনে ইয়াহিয়ার সাক্ষ্য

“ইহুদী নেতাদের পক্ষ থেকে আগত ইমাম ও লেবীয়রা ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি কে?’ জবাবে ইয়াহিয়া অস্বীকার করলেন না

বরং স্বীকার করে বললেন, 'আমি মসীহ্ নই।' তখন তারা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে কে? আপনি কি নবী ইলিয়াছ?' তিনি বললেন, 'না, আমি ইলিয়াছ নই।' তারা বললেন, 'তাহলে আপনি কি **সেই নবী**[৩]**?'** জবাবে ইয়াহিয়া বললেন, 'না'।" (ইউহোন্না ১:১৯-২১)

"Now this is the testimony of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?"
He confessed, and did not deny, but confessed, "I am not the Christ."
And they asked him, "What then? Are you Elijah?"
He said, "I am not."
"Are you the Prophet?"
And he answered, "No." (John 1:19-21)
(The MacArthur Daily Bible by John F. MacArthur, Jr)

পাঠক লক্ষ্য করেছেন, এখানে মসীহ্ এবং ইলিয়াছ দুটি নাম আছে, তাহলে তৃতীয় প্রশ্নে 'সেই নবী' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে!

উল্লিখিত তিনজনের একজন ঈসা মসীহ, তাঁর আগমন হয়েছে। দ্বিতীয়জন ইলিয়াছ, তাঁর আগমনও হয়েছে (মথি ১৭:১২)। অর্থাৎ তৃতীয়জন হলেন, শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.)। ইহুদীরা তাঁরই অপেক্ষায় ছিল। (ইউহোন্না ১:১৯-২১)

ঈসা বললেন, "তবুও আমি তোমাদের সত্যি কথা বলছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না।" (ইউহোন্না ১৬:৭)

---

৩. পুরাতন নিয়ম তথা প্রচলিত তাওরাত, যবুর ও নবীদের কিতাবে 'সেই নবী' শিরোনামে যে সকল পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, এর সবগুলোই মুহাম্মাদ (সা.) এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। যেমন, "তাওরাতে উল্লেখিত মূসার সাক্ষ্য" শিরোনামে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। আরো বিস্তারিত জানতে দেখুন, দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৭-২২, ৩২:২১, ৩৩:২, যবুর ৪৫:২-৫, সোলায়মানের গজল ৫:১০-১৬, হবককুক ৩:৩, ইশাইয়া ২১:৭

"Nevertheless I tell you the truth. It is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper will not come to you." (John 16:7)
(The MacArthur Daily Bible by John F. MacArthur, Jr)

সাহায্যকারী বলতে কি পবিত্র আত্মাকে বোঝানো হয়েছে !!

ভবিষ্যৎ বাণীটি ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এখানে বলা হচ্ছে, আমি চলে গেলেই একজন সাহায্যকারী আসবেন। সাহায্যকারী আসার একমাত্র শর্তই হলো আমি চলে যাওয়া। তিনি চলে গেলে তারপরই সাহায্যকারী আসবেন। আমরা জানি, যীশুকে যখন ব্যাপ্টাইজ করা হয় পবিত্র আত্মা তখনো ছিল। এমনকি যীশুখ্রিষ্ট জন্মের পূর্বেও পবিত্র আত্মা সেখানে ছিল। যখন তিনি মায়ের গর্ভে ছিলেন। তাহলে সাহায্যকারী কখনো পবিত্র আত্মা হতে পারে না।

দুনিয়ার সকল মানুষ জানে, ঈসা (আ.) যাওয়ার পর মুহাম্মাদ (সা.) এর আগমন হয়েছে। সুতরাং এখানে স্পষ্টত তাঁরই কথা বলা হয়েছে।

কুরআনুল কারীম ও কিতাবুল মোকাদ্দসের সমন্বয়ে শেষ নবীর পরিচয়

তাওরাত ও ইঞ্জিলে শেষ নবীর কথা বিদ্যমান আছে; সহজে বুঝার জন্য কুরআন ও কিতাবুল মোকাদ্দসের সমন্বয়ে নিম্নের ছকটি লক্ষ্য করুন-

কিতাবুল মোকাদ্দস	কুরআনুল কারীম
(১) দুনিয়ার নেতা অর্থাৎ দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য তাঁর আগমন। (ইউহোন্না ১৬:১৩)	(১) হে মুহাম্মাদ! বলুন, আমি তোমাদের সকল মানুষের জন্য রাসূল। (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৮; সূরা শুরা, আয়াত: ৭)
(২) তিনি পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত নিয়ে আসবেন। (ইউহোন্না ১৬:১৩)	(২) আল্লাহ বলেন, আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম...। (সূরা মায়িদা, আয়াত: ৩)

(৩) সবার পরে আসবেন। ঈসা বললেন, আমি না গেলে... আসবেন না। (ইউহোন্না ১৬:১৩)	**(৩)** মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। (সূরা আহযাব, আয়াত: ৪০)
(৪) তিনি করুণাময় হবেন। (ইশাইয়া ৩২:১৭-১৮)	**(৪)** হে মুহাম্মাদ (সা.) আপনি বিশ্ববাসীর জন্য করুণা ও রহমত স্বরূপ। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)
(৫) ঈসাকে মহিমান্বিত করবেন। (ইউহোন্না ১৬:১৩-১৪)	**(৫)** মুহাম্মাদ (সা.) ঈসার মহিমা প্রকাশ করেছেন। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৪৫, ৫৫)
(৬) তিনি নিরক্ষর হবেন। (ইশাইয়া ২৯:১২)	**(৬)** শেষ নবী উম্মী ছিলেন তথা নিরক্ষর ছিলেন। (সূরা জুম'আ, আয়াত: ২)
(৭) বিদেশে প্রস্থান, অর্থাৎ তিনি স্বদেশ থেকে হিজরত করে মদিনায় যাবেন এবং দশ হাজার শিষ্যসহ আবার মক্কায় আসবেন। (হবককূক ৩:৩, দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২)	**(৭)** যারা ইতিহাস পড়েছেন, সবাই জানেন রাসূল (সা.) মদিনায় হিজরত করেছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় দশ হাজার সাহাবী নিয়ে এসেছিলেন। (সীরাত- আর রাহীকুল মাখতুম)
(৮) কিতাবুল মোকাদ্দসের বর্ণনায়, প্রতিশ্রুত নবীর বাহন হবে উট। (ইশাইয়া ২১:৭)	**(৮)** ইতিহাসে এটা স্পষ্ট যে, নবীজির বাহন ছিল উট।
(৯) তাঁকে না মানলে চরম শাস্তির কথা বলা হয়েছে। (দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৯, মথি ১২:৩২)	**(৯)** পবিত্র কুরআনে মুহাম্মাদ (সা.) কে না মানার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। (সূরা নিসা, আয়াত: ১১৫)
(১০) শেষ নবী যিনি হবেন, তিনি একথা স্বীকার করবেন যে, ঈসা	**(১০)** নিশ্চয় আল্লাহর কাছে ঈসা আদমের মতো। অর্থাৎ আদম

মসীহ মানুষ হয়ে এসেছিলেন। (১ ইউহোন্না ৪:১-২)	(আ.) যেমন মানুষ ছিলেন, তিনিও মানুষ। (সূরা আলে ইমরান, আয়াতঃ ৫৯)

ঈসা মসীহ নির্দিষ্ট জাতির জন্য প্রেরিত

ঈসা মসীহ সম্পর্কে প্রচলিত বাইবেলের নতুন নিয়মের মথি ১৫:২৪ পদে বলা হয়েছে,
"I have been sent only to the lost sheep of the people of Israel." (Matthew 15:24)
"আমাকে **কেবল বনি-ইসরাঈলদের** হারানো ভেড়াদের কাছেই পাঠানো হয়েছে।" (মথি ১৫:২৪; আরো দেখুন, মার্ক ১০:৪৭, লূক ১৮:৩৮)

শুধু তাই নয়; ঈসা তার শিষ্যদেরকেও নির্দিষ্ট মানুষের কাছে ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। "ঈসা সেই বারোজনকে এই সব হুকুম দিয়ে পাঠালেন, তোমরা অ-ইহুদীদের কাছে বা সামেরীয়দের কোন গ্রামে যেয়ো না, বরং ইসরাঈল জাতির হারানো ভেড়াদের কাছে যেয়ো।" (মথি ১০:৫-৬)

বনি-ইসরাঈল ছাড়া অন্য কাউকে দাওয়াত দেয়া তো দূরের কথা তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত, কথা-বার্তা বলাও তার ধর্মে নিষেধ করা হয়েছে। "তখন তিনি তাদের বললেন, আপনারা তো জানেন যে, একজন ইহুদীর পক্ষে একজন অ-ইহুদীর সংগে মেলামেশা করা বা তার সংগে দেখা করা আমাদের শরীয়তের বিরুদ্ধে।" (প্রেরিত ১০:২৮)

ঈসা/যীশুর নবুওয়াত বনি-ইসরাঈলের জন্য নির্দিষ্ট, এজন্য তিনি বনি-ইসরাঈল ছাড়া অন্য কাউকে তার ধর্মের দাওয়াত দেননি। এমনকি বনি-ইসরাঈল ছাড়া অন্যদেরকে তিনি চিকিৎসা সেবাও দেননি। (মথি ১৫:২১-২৮)

মোটকথা, ঈসার নবুওয়াত ও দাওয়াত শুধুমাত্র বনি-ইসরাঈলদের জন্য। অন্য কোনো বংশ বা গোত্রের লোকদের জন্য নয়।

মহানবী (সা.) সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বিশ্বনবী। সমগ্র দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য একমাত্র অনুসরণীয়-অনুকরণীয় ব্যক্তি। কিয়ামত অবধি তাঁর নবুওয়াত চলবে। এ সম্পর্কে কুরআনের কয়েকটি আয়াত দেখুন,

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ۨ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۠ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.

"(হে রাসূল! তাদেরকে) বলুন, হে মানুষ! আমি তোমাদের **সকলের প্রতি** সেই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, যার আয়ত্তে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর সেই রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, যিনি উম্মী নবী এবং যিনি আল্লাহ ও তার বাণীসমূহে বিশ্বাস রাখেন এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হিদায়াত লাভ কর।" (সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৮)

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"(হে নবী!) আমি আপনাকে **সমস্ত মানুষের জন্য** একজন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা।" (সূরা সাবা, আয়াত: ২৮)

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ.

"(হে নবী!) আমি আপনাকে **বিশ্ব জগতের জন্য** কেবল রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের প্রত্যেকের নবুওয়াতের মেয়াদকাল ছিল তার তিরোধানের পর পরবর্তী নবী বা রাসূলের আগমন পর্যন্ত। যেহেতু মুহাম্মাদ (সা.) শেষ নবী এবং তাঁর পরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না। সেজন্য সমগ্র মানবজাতির জন্য এবং কিয়ামত অবধি সময়ের জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছেন।

পবিত্রআত্মা বনাম পবিত্র-সত্ত্বা

খ্রিষ্টানগণ বলেন, 'ইনজিলে মুহাম্মাদ (সা.) এর সুসংবাদ দেওয়া হয়নি; পাকরূহের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। 'পেরাক্লিত' শব্দের অর্থ- সহায় বা সাহায্যকারী। ইনজিলে পেরাক্লিত উপাধী কেবল পাক রূহের বেলায় প্রয়োগ করা হয়েছে।'

ঈসা বলেছেন, "তবুও আমি তোমাদের সত্যি কথা বলছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সাহায্যকারী তোমাদের কাছে আসবেন না।" (ইউহোন্না ১৬:৭)

"Nevertheless I tell you the truth. It is to your advantage that I go away; for if I do not go away, the Helper will not come to you." (John 16:7)
(The MacArthur Daily Bible by John F. MacArthur, Jr)

"ঈসা বললেন, আমি পিতার কাছে চাইব, তিনি তোমাদের কাছে আর একজন সাহায্যকারীকে পাঠিয়ে দেবেন। সেই সাহায্যকারীই সত্যের রূহ।" (ইউহোন্না ১৪:১৬-১৭)

"And I will pray the Father, and He will give you another Helper, that He may abide with you forever, the Spirit of truth. ." (John 14:16-17)
(The MacArthur Daily Bible by John F. MacArthur, Jr)

এখানে স্পষ্ট যে, যার সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে, তিনি ঈসা না গেলে আসবেন না। বাইবেল থেকে জানা যায়, ঈসা যাওয়ার আগেই পাকরূহ্ অনেকবার এসেছেন এবং ঈসার বর্তমানেও পাকরূহ্ বিদ্যমান ছিলেন। পাকরূহ্ যখন দুনিয়াতেই আছে, তখন তার আসার সুসংবাদ দেওয়ার অর্থ কি? যিনি আছেন, তিনি আসবেন কেন? সুতরাং সাহায্যকারী বলতে মুহাম্মাদ (সা.)-কেই বোঝানো হয়েছে।

(ক) দুনিয়াতে পাকরূহের অবস্থান

দাউদ পাকরূহে পূর্ণ ছিলেন। (২ শামুয়েল ২৩:১-২)

গিদিয়োন পাকরূহে শক্তিশালী ছিলেন। (কাজীগণ ৬:৩৪)

বৎসলেল রূহ দ্বারা পূর্ণ ছিলেন। (হিজরত ৩১:৩)

নূনের ছেলে ইউসা পাক-রূহে পূর্ণ ছিলেন। (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:৯)

উস্তাদ কারিগরগণ পাকরূহে পূর্ণ। (হিজরত ২৮:৩)

সকল নবীরাই পাক-রূহের দ্বারা পরিচালিত। (২ পিতর ১:২১, আরো দেখুন, যবুর ৫১:১১, ১০৪:৩০, ১৩৯:৭, ১০৬:৩৩, ১৪৩:১০, ইফিষীয় ৪:৩০, ২ করিন্থীয় ৩:১৭, ২ পিতর ১:২১)

পদগুলো থেকে জানা যায়, পাকরূহ্ দুনিয়াতে অনেকবার এসেছেন এবং ঈসার বর্তমানেও পাকরূহ্ বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং যিনি আছেন, তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হবে কেন?

এতে প্রমাণিত হলো যে, সাহায্যকারী দ্বারা মুহাম্মাদ (সা.)-কেই বুঝানো হয়েছে।

(খ) ঈসার মধ্যে পাকরূহের অবস্থান

"পিতর বললেন, আপনারা এও জানেন যে, আল্লাহ নাসরতের ঈসাকে পাক-রূহ ও শক্তি দিয়ে অভিষেক করেছিলেন।" (প্রেরিত ১০:৩৮, আরো দেখুন, মথি ১:১৮, ৩:১৬, মার্ক ১:৯-১০, ১:১২, লূক ১:২৬-২৭, ৩:২১-২২, প্রেরিত ১:১-২, ১০:৩৮, ২:৩২, ইউহোন্না ৩:৩৯, ১:৩৩-৩৪)

তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া, ঈসা যার কাছে তরিকাবন্দী নেন, তিনি মায়ের গর্ভ থেকেই পাকরূহে পরিপূর্ণ ছিলেন। "কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান হবে এবং আঙ্গুর-রস বা সুরা কিছুই পান করবে না; আর সে মায়ের গর্ভ থেকেই পাক-রূহে পরিপূর্ণ হবে।" (লূক ১:১৫)

"ঈসার মা মরিয়ম এলিজাবেতের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়ে তাকে সালাম করলেন, তখন এলিজাবেতের গর্ভের শিশুটি নেচে উঠল। এলিজাবেত

পাক-রূহে পূর্ণ হয়ে জোরে জোরে বললেন, সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে তুমি ধন্যা এবং তোমার যে সন্তান হবে সেই সন্তানও ধন্য।" (লূক ১:৪১-৪৪)

(গ) শিষ্যদের মধ্যে পাকরূহের অবস্থান

"ঈসা শিষ্যদের বললেন, তোমরাই যে বলবে তা নয়, বরং তোমাদের পিতার রূহ তোমাদের মধ্য দিয়ে কথা বলবেন।" (মথি ১০:২০)

"ঈসা আরো বললেন, তোমাদের যখন মজলিস-খানায় এবং শাসনকর্তা ও ক্ষমতাশালী লোকদের সামনে নিয়ে যাবে, তখন কিভাবে নিজের পক্ষে কথা বলবে বা কি জবাব দেবে সেই বিষয়ে চিন্তিত হোয়ো না। কি বলতে হবে পাক-রূহই সেই মুহূর্তে তোমাদের শিখিয়ে দেবেন।" (লূক ১২:১১-১২; আরো দেখুন, মথি ১০:১৯-২০, মার্ক ১৩:১১, ইউহোন্না ২০:১২, ২০:২০-২২, লূক ২৪:৪৯, প্রেরিত ১৬:৬-৭, ১৬:৮-১০, ১ করিন্থীয় ১৪:২, ১৪:১৪-১৫, মথি ১০:১-৮)

(ঘ) সকল অনুসারীদের মধ্যে পাকরূহের অবস্থান

"ঈদের শেষের দিনটাই ছিল প্রধান দিন। সেই দিন ঈসা দাঁড়িয়ে জোরে জোরে বললেন, কারও যদি পিপাসা পায় তবে সে আমার কাছে এসে পানি খেয়ে যাক। যে আমার উপর ঈমান আনে, পাক-কিতাবের কথামত তার দিল থেকে জীবন্ত পানির নদী বইতে থাকবে। ঈসার উপর ঈমান এনে যারা পাক-রূহকে পাবে সেই পাক-রূহের বিষয়ে ঈসা এই কথা বললেন।" (ইউহোন্না ৭:৩৭-৩৯)

(আরো দেখুন, ১ করিন্থীয় ১৪:১-২, পয়দায়েশ ৬:৩, ইউহোন্না ৭:৩৭-৩৯, ১৪:১৬-১৮, ১ করিন্থীয় ৩:১৬, ৬:১৯, ইবরানি ৬:৪-৫, ইফিষীয় ১:১৩-১৪, রোমীয় ৮:১৪, ৮:২৬-২৭, ১ করিন্থীয় ১৪:২, ১৪:১৪, গালাতীয় ৫:১৬-১৮)

বাইবেলের বর্ণনায় দুনিয়ায় সৃষ্টির শুরু থেকে এ পর্যন্ত সবসময় পাকরূহ্ ছিল। যিনি আছেন তার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত!

পর্যালোচনা ও আত্মজিজ্ঞাসা ২ : তবে কে আমাদের সর্বশেষ নবী ?

সুতরাং প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থেই নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল, যিনি আসবেন সমগ্র মানবজাতির জন্য।

নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর আগমনের পূর্বে অবতীর্ণ সকল আসমানী কিতাব বা পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য ও কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নাযিল হয়। পরবর্তীতে সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন যুগের মানুষ তাদের মনগড়া কথার দ্বারা সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সেই আত্মসমর্পণের ধর্মগুলোকে বিকৃত করে ফেলে। সেকারণে প্রায়শই দেখা যায়, আমাদের চারপাশের মানুষগুলো শিশুকাল থেকে এক স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ না করে একাধিক স্রষ্টার আরাধনা ও বিভিন্ন মনগড়া কথার অনুসরণ করে। কিন্তু সত্য হলো, প্রত্যেকটি শিশু আত্মসমর্পণের ধর্ম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে প্রতিকূল পরিবেশ তাকে স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

সময়ের পরিক্রমায় বিভিন্ন কথার সংমিশ্রণ ঘটলেও তারা ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে যেটা পরিবর্তন করতে পারেনি সেটা হল- স্রষ্টার গুণাবলী ও সর্বশেষ নবীর ভবিষ্যৎবাণী।

পরবর্তীতে স্রষ্টা সমগ্র মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সকল ধর্মে প্রতিশ্রুত সেই অন্তিম অবতার বা শেষ নবীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন এবং তার কাছে পবিত্র কুরআন নাযিল করেন এবং সেটি নাযিল হয় সমগ্র মানবজাতির জন্য।

স্রষ্টা কুরআনে সূরা সাবার ২৮ নং আয়াতে বলেছেন,

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا

"আমিতো তোমাকে পাঠিয়েছি **সমগ্র মানবজাতির জন্য** রাসূল হিসেবে"

নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর সত্যতার সবথেকে বড় প্রমাণ হচ্ছে আল-কুরআন এবং কুরআনের সত্যতারও সবথেকে বড় প্রমাণ হচ্ছে স্বয়ং আল-কুরআন। কেননা কুরআনে যদি একটি ভুলও থাকে তবে কুরআন এবং নবী (সা.) মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবেন, যেহেতু কুরআন নবী (সা.) এর ওপর নাযিল হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কুরআনে একটিমাত্র ভুলও পাওয়া যায়নি, হোক সেটা বৈজ্ঞানিক কিংবা সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক কিংবা গাণিতিক কিংবা ঐতিহাসিক অর্থাৎ কুরআন যে স্রষ্টাপ্রদত্ত পবিত্র গ্রন্থ এবং নবী মুহাম্মাদ (সা.) যে সত্য এবং সকল ধর্মগ্রন্থে প্রতিশ্রুত সর্বশেষ নবী, এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

কুরআনের এই নির্ভুলতা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের একটি নিদর্শন, পরকালের প্রতি আস্থা তৈরি করবার একটি নিদর্শন, নবী (সা.) কে রাসূল হিসেবে মান্য করবার একটি নিদর্শন এবং একই সাথে এই নির্ভুল হওয়ার বিষয়টি কুরআনকে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে ব্যতিক্রমী, অনন্য ও মহান একটি ধর্মগ্রন্থ হিসেবে তুলে ধরে।

অবশিষ্ট সকল ধর্মগ্রন্থগুলো পরিবর্তিত ও বিকৃত হয়ে গেলেও কুরআন কখনো বিকৃত হবে না। আজ পর্যন্ত কুরআনের একটি আয়াত কিংবা একটি শব্দও পরিবর্তিত হয়নি, প্রথমবার যেভাবে সংকলিত করা হয়েছিল আজ পর্যন্ত ঠিক সেভাবেই সংরক্ষিত রয়েছে।

স্বয়ং স্রষ্টা কুরআনে সূরা হিজর এর ৯ নং আয়াতে বলেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

"নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষক।"

নবী-রাসূলগণ স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের জন্য আদর্শরূপে এসেছিলেন। অর্থাৎ তারা শিখিয়ে গিয়েছেন কিভাবে এক স্রষ্টার ইবাদাত করতে হবে। শেষ নবীর পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য যে সকল নবী-রাসূলগণ এসেছিলেন, ঐ সকল সম্প্রদায়ের জন্য স্রষ্টার একত্ববাদের পর আবশ্যক ছিল ঐ সকল নবী-রাসূলগণকে অনুসরণ করা।

নবী মুহাম্মাদ (সা.) যেহেতু সর্বশেষ নবী তাই স্রষ্টার একত্ববাদের পর আমাদের জন্য আবশ্যক নবী মুহাম্মাদ (সা.) কে অনুসরণ করা।

তাইতো, নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর আগমন পরবর্তী আজকের সময়ে আত্মসমর্পণ করতে হলে বলতে হয়, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সৃষ্টিকর্তা/আল্লাহ্ এক, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ (যার উপাসনা/ইবাদত করা হয়) নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) সৃষ্টিকর্তা/আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল[২]" যা আরবিতে "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু" এবং এটা 'কালেমায়ে শাহাদাত' নামে পরিচিত। শাহাদাত অর্থ 'সাক্ষ্য দেয়া'। অর্থাৎ আপনি সাক্ষ্য দিলেন যে, আপনি আত্মসমর্পণ করলেন। আত্মসমর্পণের আরবি অর্থ হলো 'ইসলাম'। এবং যে আত্মসমর্পণ করে তাকে বলা হয় 'আত্মসমর্পণকারী' যার আরবি অর্থ হলো 'মুসলিম'।

স্রষ্টাকে এক-অদ্বিতীয় জানার পর এবং তার নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে সর্বশেষ নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পর একজন মানুষ নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সমর্পণ করে দেয় এবং সে আত্মসমর্পণকারী বা মুসলিম হিসেবে পরিগণিত হয়।

মুসলিম হওয়ার দরজা হচ্ছে কালেমায়ে শাহাদাত। ইসলামে প্রবেশ করার পর ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- 'বিশ্বাস' তথা 'ঈমান'। আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে, **স্রষ্টা ফেরেশতাদের** মাধ্যমে তাঁর **রাসূলদের** নিকট **আসমানী কিতাব** প্রেরণ করেছেন এবং আপনি যদি বিশ্বাস করেন **মৃত্যুর পরের জীবনের** প্রতি এবং **তাকদীর** অর্থাৎ ভাগ্যের প্রতি তবেই আপনার ঈমান পরিপূর্ণ। কেননা ইসলামে ঈমানের ৬টি মূলনীতি হলো:

১. তাওহীদ অর্থাৎ সকল সৃষ্টির এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। তাকেই পালনকর্তা এবং ইবাদাতের একমাত্র হকদার বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস ও স্বীকার করা।

২. তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। (ফেরেশতাগণ নূরের তৈরী। অদৃশ্য সত্তা। তাঁদের সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। তাঁদের আহার নিদ্রার প্রয়োজন নেই। আল্লাহর যিক্‌র তাঁদের জীবন। আল্লাহর নির্দেশ পালনে তাঁরা সদা প্রস্তুত থাকেন।)

---

২. রাসূল তিনি, যিনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেন। শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্র বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছানোকে রিসালাত বলে।

৩. তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। (আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে পথহারা মানুষের হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূলগণের নিকট কিতাব পাঠিয়েছেন।)

৪. তাঁর রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। (আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে মানুষের হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা সকলেই স্রষ্টার একত্ববাদ তথা তাওহীদের বাণী প্রচার করে গেছেন।)

৫. পরকাল অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। (আল্লাহর হুকুমে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আবার সকলকে জীবিত করে একত্রিত করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেকের ভালো মন্দ কাজের হিসাব নেবেন। পৃথিবীতে যাঁরা ভাল কাজ করেন আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের জান্নাত দান করবেন। জান্নাত চির সুখময় স্থান। যারা মন্দ কাজ করে তাদের জাহান্নামে পাঠানো হবে। জাহান্নাম চরম কষ্টের স্থান।)

৬. তাকদীর অর্থাৎ ভাগ্যে বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তা'য়ালা অসীম ক্ষমতার অধিকারী। পৃথিবীর সকল কিছুর ভাগ্যলিপি তথা তাকদীর সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا.

'অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো, তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং ঈমান আনো সে কিতাবের প্রতি যে কিতাব তিনি তাঁর রাসূলের ওপর নাযিল করেছেন আর সে কিতাবের প্রতিও ঈমান আনো যে কিতাব তিনি এর আগে নাযিল করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখেরাতে অবিশ্বাস করে, সে তো দূরবর্তী গোমরাহিতে নিমজ্জিত হয়।' (সূরা নিসা: আয়াত ১৩৬)

মহানবী (সা.) ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

'ঈমান হলো, তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, আখেরাতের প্রতি এবং তাকদিরের ভালোমন্দের প্রতি।' (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

বিশ্বাস স্থাপনের পর যেগুলো ফরজ ইবাদাত যেমন- নামাজ, রামাদান মাসের রোজা, যাকাত, হজ্জ এই ইবাদতগুলো তার জন্য আবশ্যক হয়ে যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন, "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত-

১. এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল।

২. সালাত তথা নামাজ[৫] কায়েম করা।

৩. যাকাত প্রদান করা।

৪. বায়তুল্লাহ হজ্জ্ব পালন করা এবং

৫. রামাদান মাসের সিয়াম পালন করা (রোজা রাখা)।"

(সহীহ বুখারী- ৮, সহীহ মুসলিম- ১৬, তিরমিযী- ২৬০৯)

কেউ যদি ঈমান আনা অবস্থায় কিংবা ঈমান আনয়নের পর নিজের সাধ্যের মধ্যে ইবাদতরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তবে সে পরকালে চির সুখের জায়গা জান্নাতের অধিকারী হবে।

হযরত আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি যদি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ বা উপাস্য নেই) ঘোষণা দেয় এবং এরই উপর মৃত্যুবরণ করে, তবে অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম)

হযরত মুয়াজ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, "বেহেশতের চাবি হচ্ছে, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ (মা'বুদ) নেই।" (সহীহ বুখারী)

সালাত

---

৫. আল্লাহকে স্মরণ করার, স্মরণ রাখার এবং সম্পর্ক গভীর করার সর্বোত্তম উপায় হল নামায।

সালাত বা নামাজের প্রত্যেক রাকাতে আমরা সূরা ফাতিহা পাঠ করি।

"পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের রব। যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু। বিচার দিবসের মালিক। আমরা শুধুমাত্র আপনারই ইবাদাত করি এবং শুধুমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথও নয় যারা হয়েছে পথভ্রষ্ট।" (সূরা ফাতিহা: আয়াত ১-৭)

"যখন বান্দা বলে, **সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের রব**, তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।'

বান্দা যখন বলে, **যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু**, তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- 'আমার বান্দা আমার গুণাগুণ বর্ণনা করল।' বান্দা যখন বলে, **বিচার দিবসের মালিক**, তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- 'আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করল।' কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা উত্তরে বলেন: 'আমার বান্দা আমার উপর (সবকিছু) সমর্পণ করল।'

যখন বান্দা বলে, **আমরা শুধুমাত্র আপনারই ইবাদাত করি এবং শুধুমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি**, তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- 'এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যের কথা এবং আমার বান্দা আমার নিকট যা চাবে আমি তাকে তাই দিব।'

অতঃপর বান্দা যখন **আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন, তাদের পথ, যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথও নয় যারা হয়েছে পথভ্রষ্ট**- পাঠ করে তখন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- 'এসব আমার বান্দার জন্য এবং সে যা কিছু চাইল তা সবই তার জন্য।" (সহীহ মুসলিম ১/২৯৬, সুনানে নাসাঈ ৫/১১-১২)

একজন মুসলমানকে সকল ইবাদতের মধ্যে নামাযের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ আল্লাহর উপর ঈমান আনার পরই নামায ফরয হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ.

অর্থঃ আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রুকু করো রুকুকারীদের সাথে। (সূরা আল-বাকারা, আয়াতঃ ৪৩)

ইবনে হিশাম মুহাম্মদ বিন ইসহাকের বরাত দিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) এর এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, সর্বপ্রথম রাসূলের (সা.) প্রতি যে জিনিস ফরয করা হয় তা নামায।

হযরত উবায়দা ইবনুস সামেত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি, "পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদের উপর ফরজ করেছেন। যে লোক উহা যথাযথ আদায় করবে এবং উহার অধিকার ও মর্যাদার প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে, উহার হক একবিন্দু নষ্ট হতে দেবে না তার জন্য আল্লাহর নিকট প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তিনি তাকে বেহেশ্‌তে দাখিল করবেন। আর যে লোক উহা পড়বে না, তার জন্য আল্লাহর নিকট কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে আযাব দেবেন আর ইচ্ছা করলে তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।" (বাদায়েউস্‌ সানায়ে)

যাকাত প্রদান- ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বায়তুল্লাহ হজ্জ্ব পালন

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ .

"এবং তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা পরিপূর্ণভাবে পালন করো।" (সূরা বাকারাঃ আয়াত ১৯৬)

নিজ নিজ বাসস্থান হতে রওয়ানা হয়ে কা'বা শরীফে তাওয়াফ করতে যাওয়া ও ফিরে আসার আর্থিক সংগতি যে সকল মুসলমানের রয়েছে তাদের জন্য জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন রংয়ের লোক কা'বা শরীফ ও আরাফাতের ময়দানে জড়ো হয়ে একটি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করেন। প্রতি বছরই দুনিয়ার মুসলমান প্রমাণ করে যে, তারা যে দেশেই থাকুক, আর যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন, মুসলমান পরস্পরের ভাই। তারা একই আল্লাহর বান্দা, একই রাসূলের (সা.) অনুসারী এবং একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। ভাষা বা অঞ্চলের দূরত্ব মুসলমানদেরকে পৃথক করতে পারে না।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) বলেন, "মুমিনগণ একটি দেহের সমতুল্য। যখন দেহের কোনো অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন গোটা দেহ এর ফলে নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

প্রতিটি সক্ষম মুসলমানের জন্যই হজ্জ করা ফরয এবং শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যারা হজ্জ করবে না, তাদের শক্ত গোনাহগার হতে হবে।

হযরত ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহি হজ্জ করার পূর্ব পর্যন্ত ঠিক বুঝতে পারেননি যে, ইসলামী ইবাদাতসমূহের মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম; কিন্তু যখনই তিনি হজ্জ করে তার অন্তর্নিহিত কল্যাণ প্রত্যক্ষ করলেন, তখন স্পষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হজ্জ-ই সর্বোত্তম ইবাদাত'।

কাবাঘর তাওয়াফের সময় হাজিরা বলেন,
"লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্‌নিমাতা লাকা ওয়ালমুল্‌ক লা শারি-কা লাক"

'আমি হাযির, হে আল্লাহ, আমি হাযির। তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয় যাবতীয় প্রশংসা ও নিয়ামত তোমার এবং রাজত্বও, তোমার কোন শরীক নেই।'

রামাদান মাসের সিয়াম পালন

রামাদান মাসে পূর্ণ এক মাস রোযা রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰی وَالْفُرْقَانِ ج

অর্থ: রামাদান মাস, তাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং যা স্পষ্ট নিদর্শনাবলীরূপে হিদায়াত ও ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী)। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৫)

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো। (সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৩)

একজন রোযাদার মুসলমান সুবহে সাদিকের পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গমাদি থেকে বিরত থাকে। এ সময় তার ক্ষুধা তৃষ্ণা পায়। কিন্তু আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্যই সে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে দমন করে রাখে। স্ত্রী সঙ্গমের খাহেশ হলে এটাকেও শুধু আল্লাহ তা'আলারই ভয়ে নিয়ন্ত্রণ করে। এভাবেই বান্দাহর মনে আল্লাহর ভয় বৃদ্ধি পায়।

রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

"সাওম কেবল আমারই জন্য। আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।" (বুখারী ও মুসলিম)

সাওমের মূল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা, পরহেযগার হওয়া। তাকওয়া মানে আল্লাহভীতি। যার মনে আল্লাহর ভয় আছে সে কোনো পাপ কাজ করতে পারে না, অন্যের ক্ষতি করতে পারে না।

ঈমান আনয়নের পর ফরজ ইবাদাতগুলো অর্থাৎ সালাত তথা নামাজ কায়েম, যাকাত আদায়, হজ্জ্ব পালন, রামাদানের সিয়াম পালন ও অন্যান্য ফরজ ইবাদাতগুলো পালন না করলে অথবা হারাম বর্জন না করলে মৃত্যুর

পর তাকে পরকালে শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান স্রষ্টা যদি চান মুসলিম হিসেবে কোনো না কোনো সময় সে জান্নাতে যাবে।

স্রষ্টা কুরআনে সূরা আল আসর এর ১-৩ নং আয়াতে বলেছেন,

وَالْعَصْرِ ۙ ١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ ٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٣

“সময়ের শপথ। অবশ্যই মানুষ রয়েছে নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে। তবে তারা নয়, যারা **ঈমান** আনে, **সৎকর্ম** করে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে।”

সকল নবী-রাসূল আত্মসমর্পণের এই ধর্ম- দ্বীন ইসলামের প্রতি সবাইকে আহ্বান করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম। (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত: ১৯)

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ.

অর্থ: তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে, আর যা আমি ওহী করেছি তোমার প্রতি এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না। মুশরিকদের কাছে দুঃসাধ্য মনে হয় যার প্রতি তুমি তাদের আহ্বান করছো, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর জন্য মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে তার (দ্বীনের) দিকে হিদায়াত দান করেন। (সূরা আশ্-শূরা, আয়াত: ১৩)

وَمَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ اِلَّا نُوۡحِیۡۤ اِلَیۡهِ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعۡبُدُوۡنِ.

অর্থ: আর তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল আমি প্রেরণ করিনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাযিল করিনি যে, আমি ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ্ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত করো। (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াতঃ ২৫)

পরবর্তীতে স্রষ্টা সকল ধর্মগ্রন্থে প্রতিশ্রুত সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর ওপর কুরআন নাযিল করেন এবং দ্বীন ইসলামকে পূর্ণতা দান করেন। তার পরবর্তীতে আর কোনো নবীর আগমন ঘটবে না। তিনিই সকল ধর্মের প্রতিশ্রুত সর্বশেষ নবী।

নবী (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন-

'আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। আমার মাধ্যমে ওয়াহীর পরিসমাপ্তি হতে যাচ্ছে। আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এই দুটি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবেনা। একটি **আল্লাহর কিতাব** ও অপরটি **রাসূলের (সা.) সুন্নাহ**[৬]।

প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে আমার কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেয়। হতে পারে, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে

---

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমাকে কুরআন কারীম দেয়া হয়েছে এবং তার সঙ্গে তারই মত আরও একটি জিনিস দেয়া হয়েছে।' (আহমাদ ৪/১৩১)

এর ভাবার্থ হচ্ছে **সুন্নাহ**। সুন্নাহ বলতে নবী (সা.) এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে বোঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এই সুন্নাহকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে প্রমাণিত করে হাদীসের মাধ্যমে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ ছয়টি হাদিস গ্রন্থ- সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবূ দাউদ, জামি' তিরমিযী, সুনানে ইবন মাজাহ।

এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, হাদীসসমূহও আল্লাহরই প্রত্যাদেশ। কুরআন মাজীদ যেমন ওয়াহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে তেমনি রাসূল (সা.) এর হাদীসও আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

"তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এটা তো ওহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।" (সূরা আন-নাজ্মঃ আয়াত ৩-৪)

শরীআতের পরিভাষায়, কোন নবীর নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বাণীকে ওহী বলে।

ওহী দুই প্রকার-

ক) মাত্লূ : এর অর্থ যা তিলাওয়াত করা হয়। কুরআন মাজীদকে ওহী মাত্লূ বলে, কেননা, কুরআন মাজীদ সালাতের মধ্যে ও বাইরে তিলাওয়াত করা হয়।

খ) গাইর মাত্লূ : এর অর্থ যা তিলাওয়াত করা হয় না। হাদীস শরীফকে ওহী গাইর মাত্লূ বলে। কারণ, তা সালাতে তিলাওয়াত করা হয় না।

এমন অনেকে থাকবে যারা উপস্থিত শ্রোতার চাইতে আমার কথাগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবে।'

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۚ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۚ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ. اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অর্থঃ দ্বীনের (ইসলাম গ্রহণের) ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই। অবশ্যই সত্য ভ্রষ্টতা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং যে তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে সুদৃঢ় হাতল আঁকড়ে ধরল, যা বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকারসমূহ থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরি করে তাদের অভিভাবক হল তাগূত। তারা তাদেরকে বের করে নিয়ে যায় আলো থেকে অন্ধকারসমূহের দিকে। তারাই আগুনের (জাহান্নামের) অধিবাসী, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। (সূরা আল-বাকারা, আয়াতঃ ২৫৬-২৫৭)

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا.

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করা ক্ষমা করবেন না, তা ব্যতীত অন্য যা কিছু যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরিক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল। (সূরা আন-নিসা, আয়াতঃ ১১৬)

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ.

অর্থ: জেনে রেখো, নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে, 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।' নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন, যা নিয়ে তারা মতভেদ করছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না, যে মিথ্যাবাদী ও কাফির। (সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩)

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ.

অর্থ: তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না, তবে রাখে মুশরিক অবস্থায় (এমতাবস্থায় যে, তারা শিরকেও লিপ্ত হয়ে থাকে)। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৬)

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ؕ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: তারা কি আল্লাহ ব্যতীত (অন্যদেরকে) সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? বলো, 'তাদের কোনো ক্ষমতা না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও?'। (সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৪৩)

اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَاۤ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا قف فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۙ اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ؕ يُسْحَبُوْنَ . فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ.

অর্থ: যারা মিথ্যারোপ করে কিতাবের প্রতি এবং যা সহ আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি তাঁর প্রতি, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। যখন

তাদের গলদেশে বেড়ি ও শিকল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে- ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করা হবে। (সূরা আল-মু'মিন, আয়াত: ৭০-৭২)

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ط يَاوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ. إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ط أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ.

অর্থ: আর সত্য প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) নিকটবর্তী হলে অকস্মাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে; তারা বলবে, 'হায় আমাদের দুর্ভোগ, আমরা তো এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম; বরং আমরা ছিলাম যালিম (সীমালঙ্ঘনকারী)।' নিশ্চয়ই তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত করো, সেগুলো হবে জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৯৭-৯৮)

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا.

অর্থ: আর সেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে তাদেরকে ডাকো।' তারা তখন তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। এবং আমি তাদের মধ্যস্থলে রেখে দেব একটি ধ্বংস-গহ্বর। (সূরা আল-কাহ্ফ, আয়াত: ৫২)

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ.

অর্থ: আর তারা উধাও হয়ে যাবে তাদের থেকে, যাদেরকে তারা পূর্বে উপাসনা করতো এবং তারা বুঝে নেবে- তাদের কোনো নিষ্কৃতি নেই। (সূরা হা-মিম আস-সাজদা, আয়াত: ৪৮)

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ج اتَّخَذَتْ بَيْتًا ط وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে ঘর বানায়। আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো সবচেয়ে দুর্বল, যদি তারা জানত। (সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ৪১)

وَقِيْلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ. مِنْ دُوْنِ اللهِ ط هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ. فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ.

অর্থ: আর তাদেরকে বলা হবে, 'তারা কোথায় যাদের তোমরা ইবাদাত করতে।' 'আল্লাহর পরিবর্তে তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম?' অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে নিম্নমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। (সূরা আশ্-শু'আরা, আয়াত: ৯২-৯৪)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهٗ ط اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ.

অর্থ: তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে, যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তা অস্বীকার করে? জাহান্নামের মধ্যেই কি কাফিরদের আবাস নয়? (সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ৬৮)

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَآ اَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ج فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِى الصُّدُوْرِ.

অর্থ: তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের হতো এমন অন্তর যা দিয়ে তারা উপলব্ধি করত, এবং এমন কান যা দিয়ে তারা শুনত। বস্তু,

চক্ষু তো অন্ধ হয় না; বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত অন্তর। (সূরা আল হাজ্জ, আয়াত: ৪৬)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا وَّوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهٗ فَوَفّٰىهُ حِسَابَهٗ ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

অর্থ: আর যারা কুফরী করে, তাদের আমলসমূহ মরুভূমির মরিচিকার মত, পিপাসার্ত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার কাছে আসবে, তখন সে দেখবে সেটা কিছুই নয়, আর সে সেখানে পাবে আল্লাহকে। অতঃপর তিনি তাকে তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন, আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৯)

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَالَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ؕ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ ظَهِيْرًا.

অর্থ: আর তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত করে, যা তাদের উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। আর কাফির তো তার রবের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী। (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৫৫)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِىْ كُلَّ كَفُوْرٍ. وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا. رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ.

অর্থ: আর যারা কুফরি করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের ওপর এই ফায়সালা করা হবে না যে, তারা মৃত্যুবরণ করবে এবং তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি শাস্তি দিয়ে থাকি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে। সেখানে তারা আর্তনাদ করে

বলবে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তার পরিবর্তে।' আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতে? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারীও এসেছিল; অতএব, আস্বাদন করো (শাস্তি); সীমালঙ্ঘনকারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই। (সূরা ফাতির, আয়াত: ৩৬-৩৭)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ؕ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ يَدْعُوهُمْ إِلٰى عَذَابِ السَّعِيرِ.

অর্থ: আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ করো, তখন তারা বলে, 'বরং আমরা তারই অনুসরণ করব যার ওপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি।' শয়তান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে আহ্বান করে, তবুও কি? (সূরা লুকমান, আয়াত: ২১)

بَلْ قَالُوٓا إِنَّا وَجَدْنَآ آبَاءَنَا عَلٰٓى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلٰٓى آثٰرِهِمْ مُّهْتَدُونَ. وَكَذٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ. لا إِنَّا وَجَدْنَآ آبَاءَنَا عَلٰٓى أُمَّةٍ وَّإِنَّا عَلٰٓى آثٰرِهِمْ مُّقْتَدُونَ. قٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ؕ قَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُونَ.

অর্থ: বরং তারা বলে, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে একই মতাদর্শের উপর পেয়েছি, এবং নিশ্চয় আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে পথপ্রাপ্ত।' এভাবেই তোমার পূর্বে যখনই আমি কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার বিত্তশালীরা বলেছে, 'নিশ্চয় আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের উপর পেয়েছি এবং নিশ্চয় আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।' সে (সতর্ককারী) বলত, 'তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যার (যে পথের) উপর পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের কাছে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পথ নিয়ে আসি তবুও কি (তোমরা তাদের অনুসরণ করবে)?' তারা বলত, 'নিশ্চয় তোমরা যা সহ

প্রেরিত হয়েছো আমরা তার অস্বীকারকারী।' (সূরা আয্‌-যুখরুফ, আয়াত: ২২-২৪)

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ. قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا. هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ.

অর্থ: আর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা কবর থেকে তাদের রবের দিকে ছুটে আসবে। তারা বলবে, 'হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠালো?' (তাদেরকে বলা হবে) 'এটা হল তাই- পরম করুণাময় (আল্লাহ) যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।' (সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ৫১-৫২)

ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ. اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ. فَهُمْ عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ.

অর্থ: অতঃপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে। তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল পথভ্রষ্ট। অতঃপর তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে তৎপর ছিল। (সূরা আস্‌-সাফ্‌ফাত, আয়াত: ৬৮-৭০)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا.

অর্থ: হিদায়াত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে ঈমান আনা থেকে এবং তাদের রবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা থেকে বিরত রাখে যে, কখন আসবে তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অথবা কখন তাদের কাছে এসে উপস্থিত হবে আযাব। (সূরা আল-কাহ্‌ফ, আয়াত: ৫৫)

وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ. حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ.

অর্থ: আর নিশ্চয় তারাই (শয়তান) মানুষকে সৎপথ থেকে বাধা দেয়। অথচ মানুষ মনে করে, তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত (সৎপথপ্রাপ্ত)। অবশেষে যখন সে আমার নিকট আসবে, তখন সে (শয়তানকে) বলবে, 'হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব থাকত'। কতইনা নিকৃষ্ট সঙ্গী সে। (সূরা আয্-যুখরুফ, আয়াত: ৩৭-৩৮)

أَذٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّوْمِ. إِنَّا جَعَلْنٰهَا فِتْنَةً لِّلظّٰلِمِيْنَ. إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْٓ أَصْلِ الْجَحِيْمِ. طَلْعُهَا كَأَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ. فَإِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ مِنْهَا فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ.

অর্থ: আপ্যায়নের জন্য এগুলো উত্তম, নাকি যাক্কুম বৃক্ষ? নিশ্চয়ই আমি তা বানিয়েছি যালিমদের পরীক্ষার্থে। নিশ্চয়ই এটি একটি গাছ, যা উদগত হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে। এর মোচা যেন শয়তানের মাথা। নিশ্চয়ই তারা (কাফিররা) তা থেকে খাবে এবং তা দিয়ে পেট ভর্তি করবে। তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। (সূরা আস্-সাফ্ফাত, আয়াত: ৬২-৬৭)

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ. طَعَامُ الْأَثِيْمِ كَالْمُهْلِ. يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ. كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ. خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ. ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَأْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ.

অর্থ: নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য; গলিত তামার মতো, তা পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে। টগবগে ফুটন্ত পানির মতো। (বলা হবে) 'ওকে ধরো, এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, তারপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও।' (সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৪৩-৪৮)

وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ. لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ.

অর্থ: তারা চিৎকার করে বলবে, 'হে মালিক, তোমার রব যেন আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন।' সে বলবে, 'নিশ্চয় তোমরা (এ অবস্থাতেই) অবস্থান করবে।' (আল্লাহ বলবেন) 'অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য অপছন্দকারী।' (সূরা আয্-যুখরুফ, আয়াত: ৭৭-৭৮)

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ.

অর্থ: তারা ছোটাছুটি করতে থাকবে জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে। (সূরা আর-রাহ্মান, আয়াত: ৪৪)

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا.

অর্থ: সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে তা কতই না উৎকৃষ্ট। (সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৭৬)

وَلَوْ تَرٰٓى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ رَبَّنَآ اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ.

অর্থ: আর যদি তুমি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অবনত মস্তকে বলবে, 'হে আমাদের রব, আমরা দেখলাম ও শুনলাম। এখন আমাদেরকে পুনরায় পাঠিয়ে দিন, নিশ্চয়ই আমরা সৎকর্ম করব; আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী।' (সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ১২)

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ۭ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ.

অর্থ: আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহের দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিশ্চয় আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধগ্রহণকারী। (সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ২২)

وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ.

অর্থ: তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করো তোমাদের নিকট আযাব আসার পূর্বে। তার (আযাব আসার) পরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। (সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৪)

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ.

অর্থ: তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর এগুলো তাদের আহবান সম্পর্কে অবহিতও নয়। (সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৫)

وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَرَاَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَهْتَدُوْنَ.

অর্থ: আর বলা হবে, 'তোমরা আহ্বান করো তোমাদের শরিকদেরকে।' তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না, বরং তারা আযাব দেখতে পাবে। হায়, তারা যদি সৎপথ অনুসরণ করত। (সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৬৪)

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ۭ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ.

অর্থ: অতঃপর তারা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা কেন তাদেরকে সাহায্য করল না? বরং তারা তাদের থেকে উধাও হয়ে গেল। আর এটা ছিল তাদের মিথ্যাচার এবং তাদের মনগড়া উদ্ভাবন। (সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ২৮)

اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لا الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ ط وَاَمْلٰى لَهُمْ.

অর্থ: নিশ্চয় যারা নিজেদের নিকট হিদায়াত স্পষ্ট হবার পর তা থেকে পিছনে ফিরে যায় (অর্থাৎ দ্বীন ত্যাগ করে), শয়তান তাদের কাজকে শোভনীয় করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৫)

اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ.

অর্থ: যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে আগত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে কি তার মতো, যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয়েছে এবং যারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে? (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ১৪)

هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ. اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ط سَآءَ مَايَحْكُمُوْنَ.

অর্থ: এ কুরআন মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত। যারা মন্দ কাজে লিপ্ত রয়েছে, তারা কি মনে করে যে, জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে আমি তাদেরকে তাদের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে? তাদের বিচার কতইনা মন্দ। (সূরা আল-জাসিয়া, আয়াত: ২০-২১)

اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ج يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرٰبًا.

অর্থ: নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম নিকটবর্তী আযাব সম্পর্কে। যেদিন মানুষ দেখতে পাবে, তার দু'হাত কী অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং

কাফিররা (অবিশ্বাসীরা) বলবে, 'হায়! আমি যদি মাটি হতাম!' (সূরা আন-নাবা, আয়াত: ৪০)

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى.

অর্থ: সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, যা সে করে এসেছে। এবং প্রকাশ করা হবে জাহান্নামকে তার জন্য, যে দেখতে পায়। (সূরা আন-নাযি'আত, আয়াত: ৩৫-৩৬)

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى. لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى. الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى.

অর্থ: অতএব আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি লেলিহান আগুন সম্পর্কে। তাতে কেউ প্রবেশ করবে না নিতান্ত হতভাগা ছাড়া; যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা আল-লাইল, আয়াত: ১৪-১৬)

وَجِایْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى. يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ.

অর্থ: আর সেদিন জাহান্নামকে নিয়ে আসা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু সেই স্মরণ তার কী কাজে আসবে? সে বলবে, 'হায়! যদি আমি আগে কিছু পাঠাতাম আমার এ জীবনের জন্য'! (সূরা আল-ফাজ্‌র, আয়াত: ২৩-২৪)

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ. وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ. تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ. اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ.

অর্থ: সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল, সহাস্য ও প্রফুল্ল। আর কতক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি-ধূসরিত। সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা। তারাই কাফির, পাপিষ্ঠ। (সূরা আবাসা, আয়াত: ৩৮-৪২)

وَاِذَاۤ اُلۡقُوۡا مِنۡهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيۡنَ دَعَوۡا هُنَالِكَ ثُبُوۡرًا .لَاتَدۡعُوۡا الۡيَوۡمَ ثُبُوۡرًا وَّاحِدًا وَّادۡعُوۡا ثُبُوۡرًا كَثِيۡرًا.

'যখন এক শিকলে কতিপয় ব্যক্তি বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে, বলা হবে তখন সেখানে তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না অনেক মৃত্যুকে ডাকো।' (সূরা ফুরকান: আয়াত ১৩-১৪)

وَتَرٰىهُمۡ يُعۡرَضُوۡنَ عَلَيۡهَا خٰشِعِيۡنَ مِنَ الذُّلِّ يَنۡظُرُوۡنَ مِنۡ طَرۡفٍ خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّ الۡخٰسِرِيۡنَ الَّذِيۡنَ خَسِرُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ وَاَهۡلِيۡهِمۡ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الظّٰلِمِيۡنَ فِىۡ عَذَابٍ مُّقِيۡمٍ .

অর্থ: আর তুমি তাদেরকে দেখবে, তাদেরকে উপস্থিত করা হচ্ছে তার (জাহান্নামের) সামনে; অপমানে অবনত অবস্থায়, তারা তাকিয়ে আছে আড় চোখে। আর যারা ঈমান এনেছে তারা কিয়ামতের দিন বলবে, ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে। শুনে রাখো, যালিমরাই থাকবে স্থায়ী আযাবে। (সূরা আশ্-শূরা, আয়াত: ৪৫)

ثُمَّ اِنَّكُمۡ اَيُّهَا الضَّآلُّوۡنَ الۡمُكَذِّبُوۡنَ. لَاٰكِلُوۡنَ مِنۡ شَجَرٍ مِّنۡ زَقُّوۡمٍ . فَمَالِـُٔوۡنَ مِنۡهَا الۡبُطُوۡنَ. فَشٰرِبُوۡنَ عَلَيۡهِ مِنَ الۡحَمِيۡمِ . فَشٰرِبُوۡنَ شُرۡبَ الۡهِيۡمِ .

অর্থ: তারপর হে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীরা, তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম গাছ থেকে, অতঃপর তা দ্বারা পেট ভর্তি করবে, তদুপরি পান করবে উত্তপ্ত পানি। আর তা পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়। প্রতিদান দিবসে এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন। (সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ৫১-৫৬)

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ. فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

অর্থ: কাফিররা ধারণা করে যে, তারা কখনোই পুনরুত্থিত হবে না। বলো, 'অবশ্যই হবে, আমার রবের কসম, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবশ্যই অবহিত করা হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।' অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আমি যে নূর অবতীর্ণ করেছি, তার প্রতি। আর আল্লাহ, তোমরা যা করো, সে বিষয়ে সম্যক অবগত। (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ৭-৮)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

অর্থ: আর যারা কুফরি করে এবং অস্বীকার করে আমার আয়াতসমূহকে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর তা কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১০)

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ. اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ.

অর্থ: আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব; আর কতইনা নিকৃষ্ট সে প্রত্যাবর্তনস্থল। যখন তাদেরকে সেখানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা তার (জাহান্নামের) গর্জন শুনতে পাবে আর তা হবে উদ্বেলিত। (সূরা আল-মুলক, আয়াত: ৬-৭)

تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ؕ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ. قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ اِنْ

أَنۡتُمۡ اِلَّا فِیۡ ضَلٰلٍ کَبِیۡرٍ. وَقَالُوۡا لَوۡ کُنَّا نَسۡمَعُ اَوۡ نَعۡقِلُ مَا کُنَّا فِیۡۤ اَصۡحٰبِ السَّعِیۡرِ.

অর্থ: ক্রোধে সে (জাহান্নাম) যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোনো সম্প্রদায় নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের কাছে কি কোনো সতর্ককারী আসেনি?' তারা বলবে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল, তখন আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি; তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছ।' এবং তারা আরও বলবে, 'হায়, যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি খাটাতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।' (সূরা আল-মুলক, আয়াত: ৮-১০)

تَدۡعُوۡا مَنۡ اَدۡبَرَ وَتَوَلّٰی.

অর্থ: জাহান্নাম তাকে ডাকবে, যে (সত্যকে) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং তা থেকে বিমুখ হয়েছিল। (সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ১৭)

یُنَبَّؤُا الۡاِنۡسَانُ یَوۡمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ.

অর্থ: সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কী রেখে এসেছে পেছনে। (সূরা আল-কিয়ামা, আয়াত: ১৩)

وُجُوۡهٌ یَّوۡمَئِذٍ نَّاضِرَۃٌ. اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَۃٌ. وَوُجُوۡهٌ یَّوۡمَئِذٍۭ بَاسِرَۃٌ. تَظُنُّ اَنۡ یُّفۡعَلَ بِهَا فَاقِرَۃٌ.

অর্থ: সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর কতক মুখমণ্ডল সেদিন হয়ে পড়বে বিবর্ণ। তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে মেরুদন্ড-ভাঙ্গা আচরণ করা হবে (অর্থাৎ তারা এক মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে)। (সূরা আল-কিয়ামা, আয়াত: ২২-২৫)

اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّمَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ.

অর্থ: তোমরা তোমাদের রবের আহ্বানে সাড়া দাও, আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই দিবস আসার পূর্বেই, যার কোনো প্রতিরোধ নেই; সেদিন থাকবে না তোমাদের জন্য কোনো আশ্রয়স্থল এবং থাকবে না তোমাদের জন্য কোনো প্রতিহতকারী। (সূরা আশ্-শূরা, আয়াত: ৪৭)

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ

অর্থ: মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। (সূরা আল-ফাৎহ, আয়াত: ২৯)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا.

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মাঝে তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। (সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ২১)

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا.

অর্থ: যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে না, নিশ্চয় আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন (সেসব) কাফিরদের জন্য। (সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ১৩)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ.

অর্থ: আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কতইনা উত্তম পুরস্কার সৎকর্মশীলদের! (সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ৫৮)

جَنّٰتُ عَدۡنٍ يَّدۡخُلُوۡنَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيۡهَا مِنۡ اَسَاوِرَ مِنۡ ذَهَبٍ وَّلُؤۡلُؤًا ۚ وَلِبَاسُهُمۡ فِيۡهَا حَرِيۡرٌ.

অর্থ: চিরস্থায়ী জান্নাত, তারা সেখানে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণনির্মিত কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (সূরা ফাতির, আয়াত: ৩৩)

هٰذَا ذِكۡرٌ ؕ وَاِنَّ لِلۡمُتَّقِيۡنَ لَحُسۡنَ مَاٰبٍ. جَنّٰتِ عَدۡنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الۡاَبۡوَابُ. مُتَّكِـِٕيۡنَ فِيۡهَا يَدۡعُوۡنَ فِيۡهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيۡرَةٍ وَّشَرَابٍ. وَعِنۡدَهُمۡ قٰصِرٰتُ الطَّرۡفِ اَتۡرَابٌ.

অর্থ: এটা হল যিক্‌র (স্মরণ), আর নিশ্চয়ই মুত্তাকিদের জন্য রয়েছে উত্তম আবাস। চিরস্থায়ী জান্নাত; যার দরজাসমূহ তাদের জন্য উন্মুক্ত। সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে চাইবে অনেক ফল-মূল ও পানীয়। আর তাদের কাছে থাকবে আনত-নয়না সমবয়সী নারীরা। (সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৪৯-৫২)

وَالَّذِىۡ جَآءَ بِالصِّدۡقِ وَصَدَّقَ بِهٖۤ اُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُتَّقُوۡنَ.

অর্থ: আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই হল মুত্তাকি। (সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩৩)

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ. اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ج وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ج وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

অর্থ: যারা ঈমান এনেছিল আমার আয়াতসমূহে এবং যারা ছিল মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)- সানন্দে প্রবেশ করো জান্নাতে তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করা হবে। স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে, সেখানে তা-ই আছে মন যা চাইবে আর চোখ যাতে তৃপ্ত হবে। এবং সেখানে তোমরা হবে স্থায়ী। (সূরা আয্-যুখরুফ, আয়াত: ৬৯-৭১)

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ. الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

অর্থ: পথনির্দেশ ও সুসংবাদ মু'মিনদের জন্য। যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং তারা পরকালের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। (সূরা আন-নামল, আয়াত: ২-৩)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ. فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ. يَّلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَّاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ. كَذٰلِكَ قف وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ. يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ اٰمِنِيْنَ. لَايَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُوْلٰى ج وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ. فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكَ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ: নিশ্চয় মুত্তাকিরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, উদ্যানরাজি ও ঝর্নাধারার মধ্যে, তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখি হয়ে। এরূপই ঘটবে, আর আমি তাদেরকে বিবাহ দেব ডাগর নয়না হুরদের সাথে। সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে সকল রকমের ফলমূল আনতে বলবে। তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না প্রথম মৃত্যুর পর। আর তিনি

(আল্লাহ) তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। তোমার রবের অনুগ্রহস্বরূপ, এটাই তো মহাসাফল্য। (সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৫১-৫৭)

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـئًا ۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ. مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ.

অর্থ: (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাকো। তারা শ্রেণিবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে; আর আমি তাদের বিবাহ দেব ডাগরচোখা হুরদের সঙ্গে। (সূরা আত-তূর, আয়াত: ১৯-২০)

فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ.

অর্থ: সেখানে থাকবে আনতনয়না রমনীগণ, পূর্বে যাদেরকে কোনো মানব স্পর্শ করেনি, আর না কোনো জিন। (সূরা আর-রাহ্‌মান, আয়াত: ৫৬)

كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ.

অর্থ: তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল। (সূরা আর-রাহ্‌মান, আয়াত: ৫৮)

مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ.

অর্থ: তারা হেলান দিয়ে বসবে সবুজ মসনদে ও সুন্দর গালিচার উপর। (সূরা আর-রাহ্‌মান, আয়াত: ৭৬)

وَحُوْرٌ عِيْنٌ. كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ.

অর্থ: আর (তাদের জন্য থাকবে) ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুর, যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা। (সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ২২-২৩)

إِنَّآ أَنشَأۡنَٰهُنَّ إِنشَآءٗ ٣٥ فَجَعَلۡنَٰهُنَّ أَبۡكَارًا ٣٦ عُرُبًا أَتۡرَابٗا ٣٧

অর্থ: নিশ্চয় আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে[১]। অতঃপর তাদের করেছি কুমারী[২], সোহাগিনী[৩] ও সমবয়সী[৪]। (সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াতঃ ৩৫-৩৭)

(১) জান্নাতী হুরগণ সাধারণ জন্ম পদ্ধতির মাধ্যমে জন্ম লাভকারিণী নয়, বরং মহান আল্লাহ জান্নাতে তাদেরকে তাঁর বিশেষ কুদরতে বিশেষ পদ্ধতিতে সৃষ্টি করেছেন। আর হুর ছাড়া পার্থিব স্ত্রীগণকেও জান্নাতবাসীরা স্ত্রী হিসেবে পাবে।
(২) أبكار শব্দটি بكر এর বহুবচন। অর্থ কুমারী বালিকা। জান্নাতের নারী ও হুরগণ, যা জান্নাতবাসীরা লাভ করবে- তাদেরকে যৌবন ও রূপ-লাবণ্য দানে অনিন্দ্য সুন্দরী ও কুমারী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদেরকে কেউ কখনো স্পর্শ করেনি। অথবা তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক সঙ্গম-সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে। [কুরতুবী]
(৩) عرب শব্দটি عروبة এর বহুবচন। অর্থ স্বামী সোহাগিনী ও প্রেমিকা নারী।আরবী ভাষায় এ শব্দটি মেয়েদের সর্বোত্তম মেয়েসুলভ গুণাবলী বুঝাতে বলা হয়। এ শব্দ দ্বারা এমন মেয়েদের বুঝানো হয় যারা কামনীয় স্বভাব ও বিনীত আচরণের অধিকারিনী, সদালাপী, নারীসুলভ আবেগ অনুভূতি সমৃদ্ধা, মনে প্রাণে স্বামীগত প্রাণ এবং স্বামীও যার প্রতি অনুরাগী। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]
(৪) أتراب শব্দটি ترب এর বহুবচন। অর্থ সমবয়স্ক। এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে তারা তাদের স্বামীদের সমবয়সী হবে। অন্য অর্থটি হচ্ছে, তারা পরস্পর সমবয়স্ক হবে। অর্থাৎ জান্নাতের সমস্ত মেয়েদের একই বয়স হবে এবং চিরদিন সেই বয়সেরই থাকবে। যুগপৎ এ দু'টি অর্থই সঠিক হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থাৎ এসব জান্নাতী নারী পরস্পরও সমবয়সী হবে এবং তাদের স্বামীদেরকেও তাদের সমবয়সী বানিয়ে দেয়া হবে।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لا اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ط ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

অর্থ: তোমরা প্রতিযোগী হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাতের, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মতো। তা প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের জন্য, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রহশীল। (সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ২১)

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ط وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ: স্মরণ করো, যেদিন তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ দিবসে, সেদিন হবে লাভ-ক্ষতির দিন। আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় ঝর্ণাধারা, সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। এটাই মহাসাফল্য। (সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ৯)

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا.

অর্থ: তাদের উপর সন্নিহিত থাকবে বৃক্ষরাজির ছায়া এবং তার ফলমূলের থোকাসমূহ সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে। (সূরা আল-ইনসান/আদ-দাহর, আয়াত: ১৪)

وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا.

অর্থ: আর তুমি যখন সেখানে দেখবে, দেখতে পাবে নিয়ামতরাজি (ভোগ বিলাসের নানান সামগ্রী) ও বিশাল সাম্রাজ্য। (সূরা আল-ইনসান/আদ-দাহর, আয়াত: ২০)

وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا.

অর্থ: এবং উদ্ভিন্ন-যৌবনা সমবয়স্কা তরুণীগণ। (সূরা আন-নাবা, আয়াত: ৩৩)
كواعب শব্দটি كاعب-এর বহুবচন। যার অর্থ হল পায়ের গাঁট। যেমন গাঁট উঁচু হয়ে থাকে, ঠিক তেমনি তাদের স্তনগুলিও অনুরূপ উঁচু উঁচু হবে; যা তাদের রূপ-সৌন্দর্যের একটি সুদৃশ্য। (অর্থাৎ তারা সদ্য উদ্ভিন্ন স্তনের ষোড়শী তরুণী হবে।)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۬ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ.

অর্থ: নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। এটাই মহাসাফল্য। (সূরা আল-বুরুজ, আয়াত: ১১)

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শ্রবণ করেনি এবং মানুষের কল্পনায় যা কখনও আসেনি।' (সহীহ বুখারী, হা.নং: ৪৭৭৯; সহীহ মুসলিম, হা.নং: ২৮২৪)

আব্দুল্লাহ বিন কায়েস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- "জান্নাতে মোতি খচিত একটি তাঁবু থাকবে, যার প্রশস্ততা হবে ষাট মাইল, ঐ তাঁবুর সকল কর্ণারে অবস্থান করবে ঈমানদারদের স্ত্রীরা, যাদেরকে অন্য দালানে অবস্থানরত ব্যক্তিরা দূরত্ব এবং প্রশস্ততার কারণে দেখতে পাবে না। মু'মিন ব্যক্তি এ স্ত্রীদের মাঝে ঘুরে বেড়াবে।" (মুসলিম, কিতাবুল জান্না ওয়া সিফাতু নায়ীমিহা)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "জান্নাতে একটি গাছ রয়েছে যার ছায়ায় কোন অশ্বারোহী শত

বছর চলার পরও শেষ প্রান্তে পৌঁছতে পারবে না।" (বুখারী, কিতাব বাদউল খালক, বাব মা যায়া ফী সিফাতিল জান্না)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "জান্নাতের প্রতিটি গাছের মূল হবে স্বর্ণের।" (তিরমিযী, আবওয়াব সিফাতিল জান্না, বাব মা যায়া ফী সিফা আশজারিল জান্না)

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا. وَّدَاعِيًا اِلَى اللهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا.

অর্থঃ হে নবী, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। (সূরা আল-আহযাব, আয়াতঃ ৪৫-৪৬)

কুরআনের আলোকে আধুনিক বিজ্ঞানকে পর্যালোচনা

যদি কুরআনের আলোকে বিজ্ঞানকে পর্যালোচনা করা হয় তবে দেখা যাবে, আজ বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কারগুলো সম্পর্কে কুরআন চৌদ্দশ বছর আগেই আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে।

স্রষ্টা কুরআনে বলেছেন,

[৪] আন-নিসা (নারী)

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ
اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ٨٢

অর্থ: তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।

Do they not then ponder on the Quran? If it had been from other than Allah, surely they would have found much contradictions in it.

(সূরা আন-নিসা: আয়াত ৮২)

[১৭] বনি ইসরাঈল

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰۤى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ٨٨

অর্থ: বলো, 'এ কুরআনের অনুরূপ হাজির করার জন্য যদি মানুষ ও জিন একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাজির করতে পারবে না যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।'

Say, 'If the mankind and the jinns gathered in order to bring the like of this Quran, they could not bring the like of it,

even if they helped one another.’

(সূরা আল-ইসরা: আয়াত ৮৮)

১। মানব সৃষ্টির রহস্য

পবিত্র কুরআনে মানুষের জন্মের ব্যাপারে বর্ণিত আয়াতগুলো -

[২৩] আল-মুমিনুন (মুমিনগণ)

ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ١٣

অর্থ: তারপর আমি তাকে নুতফারূপে সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।

Thereafter We made him as a Nutfah (mixed drops of the male and female sexual discharge) (and lodged it) in a safe lodging (womb of the woman).

(সূরা আল-মুমিনুন: আয়াত ১৩)

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ط فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ١٤

অর্থ: তারপর নুতফাকে আমি আলাকায় পরিণত করি। তারপর আলাকাকে চিবানো গোশতপিন্ডে পরিণত করি। তারপর গোশতপিন্ডকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে গোশত দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়।

Then We made the Nutfah into a clot (a piece of thick coagulated blood), then We made the clot into a little lump of flesh, then We made out of that little lump of flesh bones, then We clothed the bones with flesh, and then We brought it forth as another creation. So blessed is Allah, the Best of Creators.

(সূরা আল-মুমিনুনঃ আয়াত ১৪)

চিহ্নিত আরবী শব্দগুলো হলো-

১। নুত্ফা (The Nutfah)- শুক্রাণু ও ডিম্বাণু

২। আলাকা (The Alaqah) এর তিনটি অর্থ- (১) ঝুলে থাকা বস্তু
(২) জমাট বাধা রক্ত
(৩) জোঁকের মত বস্তু

৩। মুদগাহ্ (The Mudghah)- চিবানো মাংসের মতো

৪। ইজাম (Izam)- হাড়ে পরিণত করা

৫। লাহ্ম (Lahm)- হাড়কে মাংস দ্বারা আবৃত করা

তাহলে কুরআন অনুসারে জন্মের ধাপগুলোকে সংক্ষেপে এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়, যা নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর মাধ্যমে ১৪০০ বছর আগে আমাদের প্রতিপালক, বিশ্বজাহানের স্রষ্টা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। এখন দেখা যাক, আধুনিক বিজ্ঞান মানব সৃষ্টির ব্যাপারে কি বলে।

১। তারপর আমি তাকে নুত্ফারূপে সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।

বর্তমানে বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে, পুরুষের শরীর থেকে নির্গত বীর্য (শুক্রাণু/Sperm) নারীর জরায়ুতে পৌছে সেখানে ডিম্বানূর (Ouvm/Egg) সাথে নিষিক্ত হয়ে সেখানেই অবস্থান করে।
[সংরক্ষিত আধার বলতে মায়েদের গর্ভের (জরায়ু/Uterus- Ampulla of one of the fallopian tubes) কথা বলা হয়েছে]

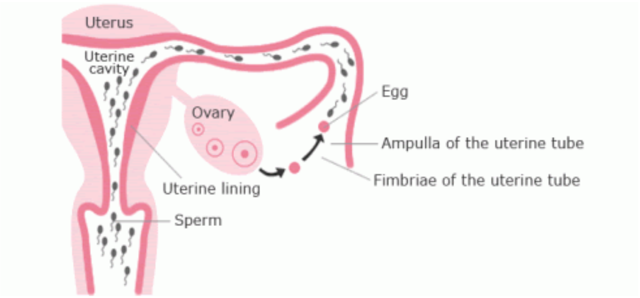

Scientific source - https://en.wikipedia.org/wiki/Human_embryonic_development#Fertilization

উল্লেখ্য অন্য আয়াতে আছে,

[৭৫] আল-ক্বিয়ামাহ্ (পুনরুত্থান)

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ٣٧

অর্থ: সে কি বীর্যের নুত্ফাহ (শুক্রবিন্দু) ছিলনা যা স্খলিত হয়?

Was he not a Nutfah (mixed male and female discharge of semen) poured forth?

(সূরা আল-ক্বিয়ামাহ্: আয়াত ৩৭)

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ٣٨

অর্থ: অতঃপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন।

Then he became an Alaqa (a clot); then (Allah) created and fashioned (him) in due proportion.

(সূরা আল-ক্বিয়ামাহ্: আয়াত ৩৮)

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ٣٩

অর্থ: অতঃপর তিনি তা থেকে দুই ধরনের যুগল সৃষ্টি করলেন, নর ও

নারী।

Then made of him two kinds, the male and the female.

(সূরা আল-ক্বিয়ামাহ্: আয়াত ৩৯)

অতঃপর তা থেকে তিনি যুগল সৃষ্টি করলেন নর-নারী। এখানে ‘তা থেকে’ বলতে বোঝানো হয়েছে শুক্রবিন্দু থেকে অর্থাৎ পুরুষের শরীর থেকে যা নির্গত হয় সেটাকে।

আজ বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে, সন্তান ছেলে হবে না মেয়ে হবে এটা নির্ভর করে পুরুষের উপর।

Scientific source -
https://en.wikiversity.org/wiki/Sex_determination

২। তারপর নুত্ফাকে আমি আলাকায় পরিণত করি।

আলাকা (The Alaqah)-এর তিনটি অর্থ আছে। প্রত্যেকটি অর্থই ভ্রূণের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়।

(১) ঝুলে থাকা বস্তু -

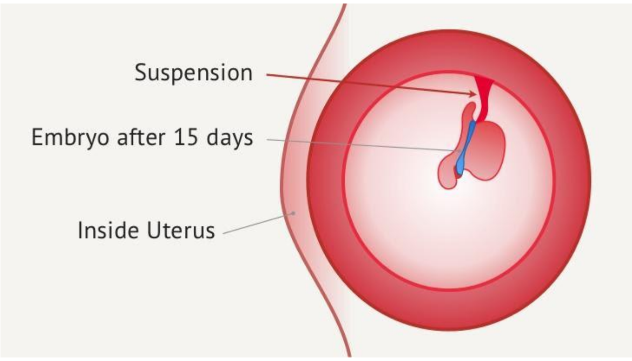

(২) জমাট বাধা রক্ত -

Figure Embryo in the fourth week (about 22-24 days) shows the clear rudiments of brain and backbone. Its heart pumps blood to the liver and into the aorta. (A Child is Born, Lennart Nilsson,

(৩) জোঁকের মত বস্তু -

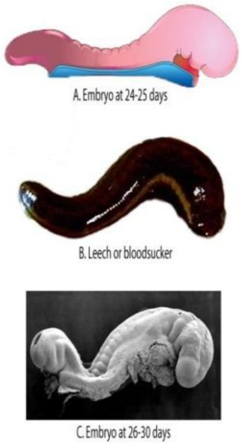

Figure 19: ***A,*** shows a lateral view of an embryo [size 2.5-3.0mm] at days 24 to 25 [Modified from Moore & Persaud: *The Developing Human* 8th Edition]. ***B***, Hirudo medicinalis, medicinal leech ***C***, Scanning electron micrograph of an embryo at Week 4, 26 - 30 days [Professor Kathy Sulik, The University of North Carolina]. Note the leech-like appearance of the human embryos at this stage.

আধুনিক ভ্রূণবিদ্যা অনুযায়ী , একটি ভ্রূণ মায়ের জরায়ুতে থাকাকালীন ১৫ থেকে ২৫ দিনে অর্থাৎ ২য় ও ৩য় সপ্তাহে **জোঁকের মতো** আকৃতিতে পরিণত হয় ।

Scientific source -
The Developing Human, Clinically Oriented Embryology By Dr. Keith L. Moore; 10th edition; Page: 78

এবং এটি তখন কানেক্টিং স্টকের সাহায্যে **ঝুলে থাকে** যা পরে আম্বিলিকাল কর্ডে পরিণত হয় ।

Scientific source -
http://www.embryology.ch/anglais/fplacenta/cordon01.html

এবং ওই সময়ে ভ্রূণের ভেতরে রক্ত চলাচলের কারণে ভ্রূণ **লাল রঙের পিন্ডের মত** দেখায় ।

এটা কি খুবই আশ্চর্য নয় যে, মাতৃ গর্ভাশয়ে একেবারে প্রথমদিকে জাইগোট দেখতে ঠিক জোঁকের মত, গর্ভের দেয়ালে ঝুলেও থাকে ঠিক জোঁকের মত আর এটার জৈবিক গঠন ঠিক রক্তপিন্ডের মত ?

৩। তারপর আলাকাকে চিবানো গোশতপিন্ডে (মুদগাহ্) পরিণত করি।

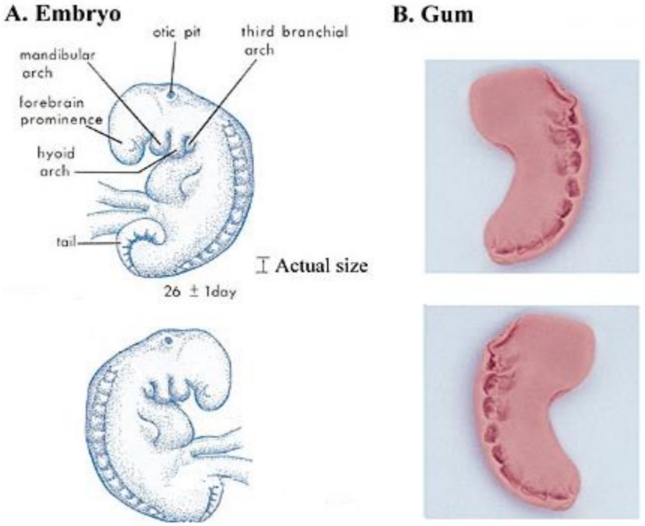

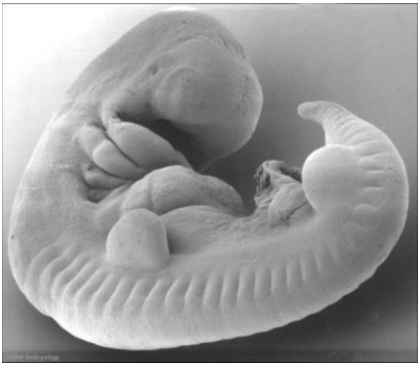

আধুনিক ভ্রূণবিদ্যা বলে, একটি ভ্রূণ মায়ের জরায়ুতে থাকাকালীন ২৮তম দিনে এতে সোমাইটগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। এই অবস্থায় এটি ৫ম সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত বা ৪০ দিন পর্যন্ত থাকে। তারপর এই সোমাইট থেকে

পরবর্তীতে মেরুদন্ডের হাড় ও মাথায় কিছু হাড় এবং পর্শুকা তৈরি হয়। তখন এটিকে দেখতে চর্বিত মাংসের টুকরার মতো লাগে।

Scientific source -

The Developing Human, Clinically Oriented Embryology By Dr. Keith L. Moore; 10th edition, Page: 619; 5th edition, Page: 79

৪। তারপর গোশতপিণ্ডকে (মুদগাহ্) হাড়ে (ইজামে) পরিণত করি।

৫। তারপর হাড়কে (ইজাম) গোশত (লাহ্ম) দিয়ে আবৃত করি।

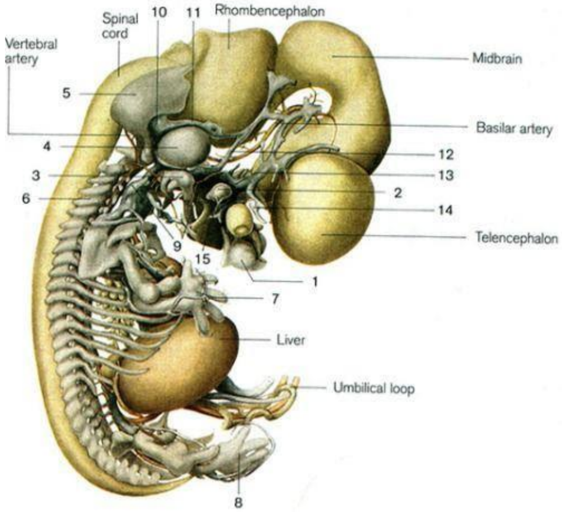

Figure 27: Human embryo at about days 50-51 days
[Ulrich Drews, Color Atlas of Embryology, 1995]

কিছুদিন পূর্বেও ভ্রূণবিদ্যা জানতো যে, ভ্রূণের হাড় ও মাংসপেশী একই সময়ে তৈরী হয়।

তবে এখন আধুনিক ভ্রূণবিদ্যা গবেষণা মতে, ৬ সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ৪২ থেকে ৪৫ দিনে ভ্রূণে হাড় তৈরীর প্রক্রিয়া শুরু হয় ।

Scientific source -

Langman's medical embryology (9th edition); Chapter: Skeletal System Development; Page: 171-196

The Developing Human, Clinically Oriented Embryology By Dr. Keith L. Moore; 8th edition; Chapter: The Limbs; Page: 441

এবং ৭ম সপ্তাহে মাংস তৈরি হবার প্রক্রিয়া দেখা যায়।

Scientific source -

Langman's medical embryology (9th edition); Chapter: Muscular System Development; Page: 203

অধ্যাপক মার্শাল জনসন আমেরিকার একজন প্রথম সারির বিজ্ঞানী। তিনি ফিলাডেলফিয়ার থমাস জেফারসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্যানিয়েল ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা এবং এনাটমি বিভাগের প্রধান ছিলেন। তার কাছে কুরআনে বর্ণিত ভ্রূণ সম্পর্কিত আয়াতগুলোর ওপর মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি জবাবে বলেছিলেন, কুরআনের আয়াতে বর্ণিত ভ্রূণ সংক্রান্ত বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা কখনো সেই সময়ে কাকতালীয় হতে পারে না।

তিনি বলেছিলেন, এ ধরনের বর্ণনা তখনই সম্ভব যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোনো শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র থাকতো। যখন তাকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে কুরআন চৌদ্দশ বছর আগে অবতীর্ণ হয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর যুগের কয়েক শতাব্দি পরে অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে তখন অধ্যাপক জনসন হেসে মন্তব্য করেছিলেন যে, সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন বেশি ছিল না এমনকি কোন পরিস্কার চিত্রও দেখা যেত না। তিনি আরও বলেছিলেন, আমার এখানে এই ধারণা পোষণ করতে কোন অসুবিধা নেই যে, মুহাম্মাদ (সা.) যখন কুরআন আবৃত্তি করেছিলেন তখন সেখানে অবধারিতভাবে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ যুক্ত ছিল।

اَوَلَمۡ یَکۡفِهِمۡ اَنَّاۤ اَنۡزَلۡنَا عَلَیۡكَ الۡکِتٰبَ یُتۡلٰی عَلَیۡهِمۡ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَرَحۡمَۃً وَّ ذِکۡرٰی لِقَوۡمٍ یُّؤۡمِنُوۡنَ.

অর্থ: এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই অনুগ্রহ ও উপদেশ রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা ঈমান রাখে। (সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ৫১)

২। তিনটি পর্দার অভ্যন্তরে সুরক্ষিত ভ্রূণ

[৩৯] আয-যুমার (দলবদ্ধ জনতা)

یَخۡلُقُکُمۡ فِیۡ بُطُوۡنِ اُمَّهٰتِکُمۡ خَلۡقًا مِّنۡۢ بَعۡدِ خَلۡقٍ فِیۡ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ٦

অর্থ: তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে।

He creates you in the wombs of your mothers, creation after creation, within three darknesses.

(সূরা আয-যুমার: আয়াত ৬)

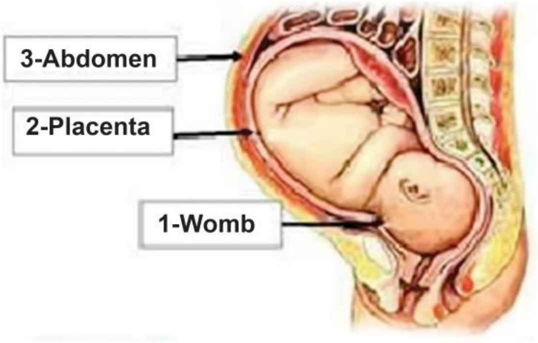

বর্তমানে ভ্রূণবিদ্যা আমাদেরকে বলে, ভ্রূণ মাতৃগর্ভে তিনটি দেয়ালে সুরক্ষিত থাকে-

১। মায়ের গর্ভের সম্মুখের প্রাচীর। (The darkness of the abdomen)
https://en.wikipedia.org/wiki/Abdomen
২। জরায়ুর প্রাচীর। (The darkness of the womb/the uterus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Uterus
৩। ভ্রূণের আবরণ অর্থাৎ ভ্রূণকে আবৃতকারী গর্ভফুলের অভ্যন্তরীণ অতি পাতলা পর্দা। (The darkness of the placenta)
https://en.wikipedia.org/wiki/Placenta

يَآيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অর্থ: হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে-ই সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে সর্বাধিক মুত্তাকি (আল্লাহ-ভীরু)। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত। (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৩)

৩। মেরুদন্ড ও পাঁজরের মধ্য থেকে নির্গত তরল পদার্থ

[৮৬] আত-ত্বরিক (রাতের আগন্তুক)

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٥

অর্থ: অতএব মানুষের চিন্তা করে দেখা উচিত তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।
So let man see from what he is created.
(সূরা আত-ত্বরিক: আয়াত ৫)

خُلِقَ مِن مَّآءٖ دَافِقٖ ٦

অর্থ: তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে দ্রুতবেগে নির্গত পানি থেকে।

He is created from a water; gushing forth.

(সূরা আত-ত্বরিক: আয়াত ৬)

يَخۡرُجُ مِنۢ بَيۡنِ ٱلصُّلۡبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ٧

অর্থ: যা বের হয় মেরুদন্ড ও বুকের হাড়ের মধ্য থেকে।

Proceeding from between the back-bone and the ribs.

(সূরা আত-ত্বরিক: আয়াত ৭)

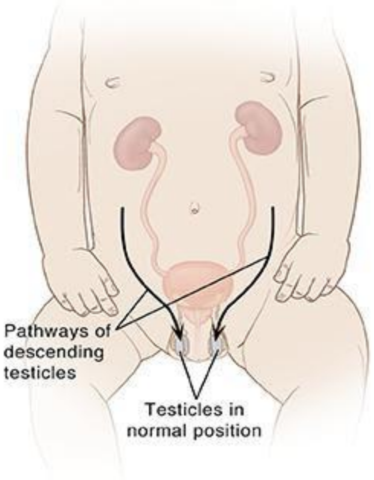

বর্তমানে বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে, জন্ম পূর্ববর্তী অবস্থায় মায়ের পেটে বিকাশের সময় পুরুষ ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয়গুলো অর্থাৎ অন্ডকোষ ও ডিম্বাশয় মেরুদন্ড ও বুকের হাড়ের মাঝে বিকশিত হওয়া শুরু করে। পরবর্তীতে এগুলো নিচে নেমে আসে এবং পুরুষের ক্ষেত্রে অন্ডথলিতে এবং স্ত্রীর ডিম্বাশয় নিতম্বের মধ্যকার অস্থিকাঠামোর মধ্যে এসে স্থান লাভ করে।

Scientific source -
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4920575/

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى. اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى. ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى. اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِ ىَ الْمَوْتٰى.

অর্থ: মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? সে কি স্খলিত বীর্যের শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে আলাকায় (রক্তপিন্ডে) পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল- নর ও নারী। তবুও কি তিনি মৃতদের জীবিত করতে সক্ষম নন? (সূরা আল-কিয়ামা, আয়াত: ৩৬-৪০)

৪। সৃষ্টির রহস্য ও পানি

[২৪] আন-নূর (আলো)

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ مَّآءٍ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى بَطْنِهٖ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰى رِجْلَيْنِ ج وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِىْ عَلٰٓى اَرْبَعٍ ط يَخْلُقُ اللّٰهُ مَايَشَآءُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٤٥

অর্থ: আর আল্লাহ প্রত্যেক জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক চলে দু'পায়ের উপর, আবার কতক চার পায়ের উপর চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

And Allah has created every moving (living) creature from water. Of them there are some that creep on their bellies, some that walk on two legs, and some that walk on four. Allah creates what He wills. Indeed, Allah on everything is All-Powerful.

(সূরা আন-নূর: আয়াত ৪৫)

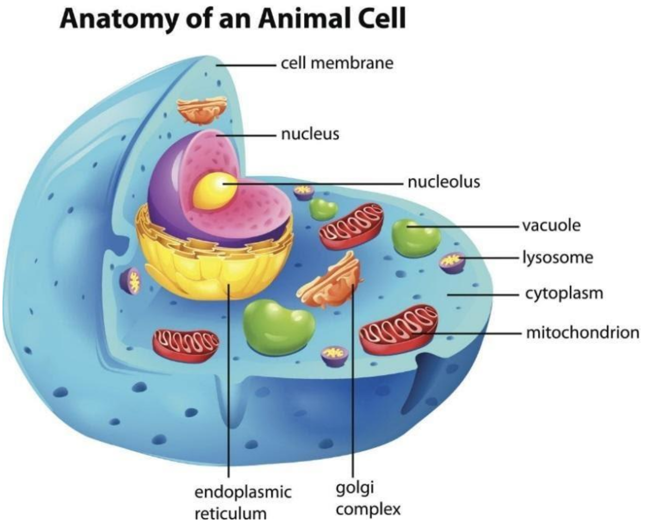

সম্প্রতি বিজ্ঞানের অতি আধুনিকতম পর্যায়ে আমরা সাইটোপ্লাজম সম্পর্কে জানতে পেরেছি। সাইটোপ্লাজম হলো একটি কোষের মূল অংশ, যা ৮০ শতাংশ পানি দ্বারা গঠিত। আধুনিক গবেষণায় জানা গেছে যে, জীবদেহ ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ পানি দ্বারা গঠিত এবং প্রতিটি সত্তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য পানি একান্ত অপরিহার্য।

Scientific source -
https://en.wikipedia.org/wiki/Cytoplasm
https://www.thoughtco.com/how-much-of-your-body-is-water-609406

৫। মাটি থেকে মানুষের সৃষ্টি

[৩৮] সোয়াদ (আরবি বর্ণ)

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ٧١

অর্থঃ (স্মরণ করো) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব।

(Remember) When your Lord said to the Angels, ‘Indeed, I am going to create man from clay.

(সূরা সোয়াদ: আয়াত ৭১)

فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ٧٢

অর্থ: যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে যাও।’

So when I have fashioned him and breathed into him (his) soul created by Me, then you fall down to him in prostration.’

(সূরা সোয়াদ: আয়াত ৭২)

বর্তমান গবেষণা নিশ্চিত করে যে, মানবদেহে পাওয়া সব উপাদানই মাটিতে পাওয়া যায়।

নিচে একটি ৭০ কেজি মানবদেহে প্রাপ্ত উপাদানের একটি ছক দেয়া হল। জীবিত পেশীতে প্রায় ৯৫% কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং সালফার সহ সব মিলিয়ে প্রায় ২৬ টি উপাদান পাওয়া যায়।

উপাদান- অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, ক্লোরিন, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সিলিকন, লোহা, দস্তা, তামা, বোরন, কোবাল্ট, ভ্যানাডিয়াম, আয়োডিন, সেলেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, ক্রোমিয়াম।

Scientific source -

https://www.thoughtco.com/chemical-composition-of-the-human-body-603995

https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_nutrients_in_soil

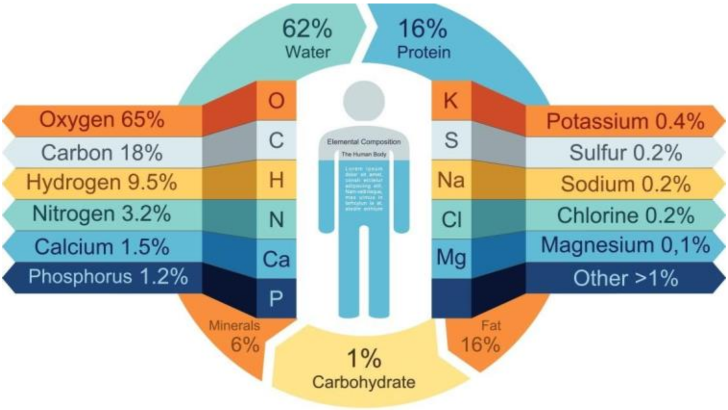

৬। দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি: কোনটি আগে?

[৩২] হা-মীম আস-সাজদাহ্ (সুস্পষ্ট বিবরণ)

ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ
وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ٩

অর্থ: তারপর তিনি তাকে সুঠাম করেছেন এবং তাতে নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

Then He fashioned him and breathed into him (his) soul (created by Allah), and (He) made for you hearing (ears) and sight (eyes) and hearts. Little is the thanks you give!

(সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ্: আয়াত ৯)

অর্থাৎ কুরআন বলছে মানুষ আগে শ্রবণশক্তি, তারপর দৃষ্টিশক্তি পায়।

আজ বিজ্ঞান বলে, গর্ভে পাঁচ মাস (১৯ সপ্তাহ) থাকার পর ভ্রূণের শ্রবন ইন্দ্রিয় তৈরি হয়।

Scientific source -
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1061088/

পরবর্তীতে সাত মাস (২৯-৩২ সপ্তাহ) থাকার পর ভ্রূণের চোখ আলোর পরিবর্তন বুঝতে পারে।

Scientific source -
https://www.acog.org/womens-health/faqs/how-your-fetus-grows-during-pregnancy

اِنَّا خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ نُّطۡفَةٍ اَمۡشَاجٍ ٭ۖ نَّبۡتَلِیۡهِ فَجَعَلۡنٰهُ سَمِیۡعًۢا بَصِیۡرًا.

অর্থ: নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত নোতফা থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য; এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। (সূরা আল-ইনসান/আদ-দাহর, আয়াত: ২)

৭। মহাবিশ্বের আদি অবস্থা

[৪১] হা-মীম আস-সাজদাহ্ (সুস্পষ্ট বিবরণ)

ثُمَّ اسۡتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ وَهِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلۡاَرۡضِ ائۡتِیَا طَوۡعًا اَوۡ کَرۡهًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَیۡنَا طَآئِعِیۡنَ ١١

অর্থ: তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন। যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অতঃপর তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন, ‘তোমরা উভয়ে স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এসো’। তারা উভয়ে বলল, আমরা অনুগত হয়ে আসলাম।

Then He directed (Himself) towards the heaven while it was smoke, and said to it and to the earth: Come (into existence) both of you willingly or unwillingly. They both said: We come, willingly.

(সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ্: আয়াত ১১)

আজ বিজ্ঞান বলছে, মহাবিশ্বের গ্যালাক্সিগুলো তৈরী হওয়ার পূর্বে সব পদার্থগুলো গ্যাসীয় অবস্থায় একত্রে ছিল।

Scientific source -
https://www.nbi.ku.dk/english/news/news15/astronomers-find-dust-in-the-early-universe/

https://www.sciencemag.org/news/2010/11/how-early-universe-cleared-away-fog

https://earthsky.org/space/a-dusty-galaxy-in-the-early-universe

৮। বিগ ব্যাং (মহাবিস্ফোরণ)

[২১] আল-আম্বিয়া (নবীগণ)

اَوَلَمۡ یَرَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ کَانَتَا رَتۡقًا فَفَتَقۡنٰهُمَا ؕ
وَجَعَلۡنَا مِنَ الۡمَآءِ کُلَّ شَیۡءٍ حَیٍّ ؕ اَفَلَا یُؤۡمِنُوۡنَ ٣٠

অর্থ: যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম, এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

Have not considered those who disbelieve that the heavens and the earth were a joined entity, then We parted them and We made every living thing from water? Will they not then believe?

(সূরা আল-আম্বিয়া: আয়াত ৩০)

আয়াতটি আমাদেরকে পরিস্কারভাবে বলছে, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র একসময় একত্রে পুঞ্জিভূত ছিল।

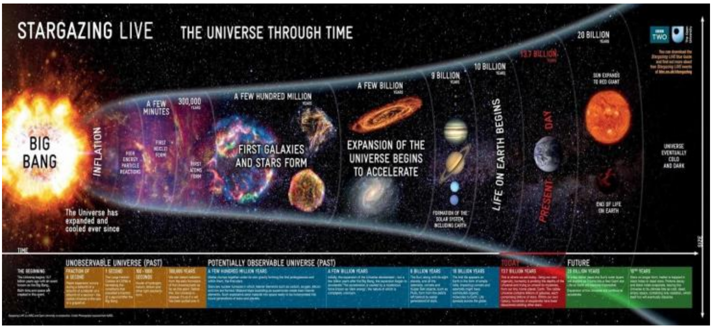

আজকের বিজ্ঞান কি বলে এ সম্বন্ধে?

পদার্থবিজ্ঞানী ষ্টিফেন হকিং-এর বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ থিওরী আজ সর্বময় স্বীকৃত। এ থিওরী অনুযায়ী, মহাবিশ্বের সকল দৃশ্য-অদৃশ্য গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টির শুরুতে একটি বিন্দুতে পুঞ্জিভূত ছিল। পরবর্তীতে একটি মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এরা চারদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে।

Scientific source -
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Bang

পদার্থবিজ্ঞানী ড. মিলার বলেছেন, এই আয়াতটি নিয়ে চিন্তা-গবেষণার পর কুরআন যে ঐশী গ্রন্থ তা মেনে নিতে বাধ্য হই। যারা প্রচার চালাচ্ছে কুরআন মুহাম্মাদ (সা.) এর নিজস্ব বক্তব্য তাদের দাবি নাকচ করার জন্য এই একটি আয়াতই যথেষ্ট।

ড. মিলার বলেছেন, দেড় হাজার বছর আগে ইসলামের নবীর পক্ষে কিভাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য নিয়ে কথা বলা সম্ভব! কারণ এটি এমন এক বৈজ্ঞানিক বিষয়, যা সম্পর্কে তত্ত্ব আবিষ্কার করে মাত্র কয়েক বছর আগে ১৯৭৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন একজন বিজ্ঞানী। মিলারের মতে, এই আয়াতে সেই বিগ ব্যাং এর কথাই বলা হয়েছে, যার মাধ্যমে পৃথিবী, আকাশমন্ডলী ও তারকারাজি সৃষ্টি হয়েছে।

এই বিগ ব্যাং থিওরীর একটি অনুসিদ্ধান্ত হল, অনবরত দূরে সরে যাওয়া গ্রহ-নক্ষত্রগুলো একসময় আবার কাছাকাছি আসা শুরু করবে কেন্দ্রবিমুখী বল শূন্য হয়ে যাওয়ার ফলে এবং সময়ের ব্যাবধানে সব গ্রহ-নক্ষত্র আবার একত্রে মিলিত হয়ে একটি পিন্ডে পরিনত হবে।

"সেই দিন আকাশমন্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর।" (সূরা আল-আম্বিয়া: আয়াত ১০৪)

চৌদ্দশ বছর আগে আরবে আবির্ভূত হওয়া গ্রন্থটি কিভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যের নিগূঢ় তত্ত্বকে উপস্থাপন করলো?

৯। সূর্যের নিজস্ব কক্ষপথ পরিভ্রমণ

[২১] আল-আম্বিয়া (নবীগণ)

وَهُوَ الَّذِىۡ خَلَقَ الَّيۡلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمۡسَ وَالۡقَمَرَ ‌ؕ كُلٌّ فِىۡ فَلَكٍ يَّسۡبَحُوۡنَ ٣٣

অর্থ: আর তিনিই সেই সত্তা যিনি রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন; প্রত্যেকে তারা নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে।

And He is the One Who created the night and the day, and the sun and the moon, each floating in an orbit.

(সূরা আল-আম্বিয়া: আয়াত ৩৩)

[৩৬] ইয়াসীন (ইয়াসীন)

لَا الشَّمۡسُ يَنۡۢبَغِىۡ لَهَاۤ اَنۡ تُدۡرِكَ الۡقَمَرَ وَلَا الَّيۡلُ سَابِقُ النَّهَارِ‌ ؕ وَكُلٌّ فِىۡ فَلَكٍ يَّسۡبَحُوۡنَ ৪০

অর্থ: সূর্যের জন্য সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতের জন্য সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে।

It is not permitted for the sun to overtake the moon, nor does the night outstrip the day. And they all float, each in an

orbit.

(সূরা ইয়াসীন: আয়াত ৪০)

চিহ্নিত আরবি শব্দ "ইয়াসবাহুন" এর অর্থ হচ্ছে 'গমন করা বা আবর্তন করা'।

১৯৮০ সালের পূর্বেও ধারণা ছিল যে সূর্য স্থির। এর চারপাশে বিভিন্ন গ্রহগুলো নিজ কক্ষপথে ঘুরতে থাকে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছে যে, সূর্য কোনভাবেই স্থির নয়। পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।

নিজ গ্যালাক্সির চারদিকে সূর্য একবার পরিভ্রমণ করতে সময় লাগে আনুমানিক ২০০ মিলিয়ন বছর এবং নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরতে সময় লাগে ২৫ দিন।

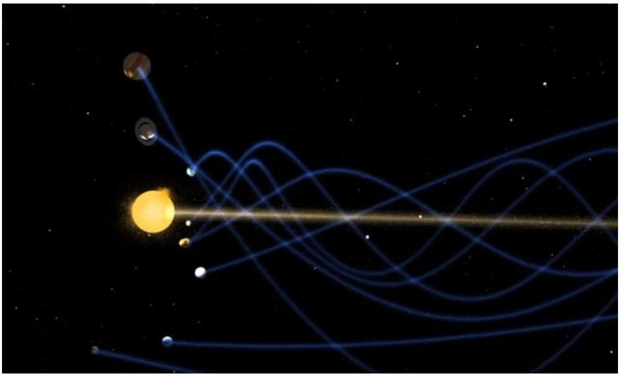

নিজ অক্ষের উপর একবার ঘুরে আসতে চাঁদের সময় লাগে আনুমানিক সাড়ে ১৯ দিন এবং পৃথিবীর নিজ কক্ষপথে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে ৩৬৫ দিন।

Scientific source -

https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/sun/in-depth/

[৩৬] ইয়াসীন (ইয়াসীন)

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ٣٨

অর্থ: এবং সূর্য তার জন্য নির্ধারিত এক সময়কাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করবে, এটা মহাপরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী কতৃক নির্ধারিত।

And the sun runs to a term appointed for it. That is the Decree of the All-Mighty, the All-Knowing.

(সূরা ইয়াসীন: আয়াত ৩৮)

বিগত ৫০০ কোটি বছর ধরে বিরামহীন ভাবে সূর্য আলো বিকিরণ করে আসছে। ভবিষ্যতে একটা সময়ের পর আলোর বিকিরণ বন্ধ হয়ে যাবে। সেই সময় সূর্য সম্পূর্ণভাবে নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে।

১০। সম্প্রসারণশীল বিশ্বজগৎ

[৫১] আয-যারিয়াত (বিক্ষেপকারী বাতাস)

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ٤٧

অর্থ: আর আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।

And We constructed the firmament with (great) might, and indeed, We are (its) Expanders.

(সূরা আয-যারিয়াত: আয়াত ৪৭)

উপরে চিহ্নিত আরবী শব্দ “মুসিউন”-এর অর্থ হলো ‘সম্প্রসারিত করা’।

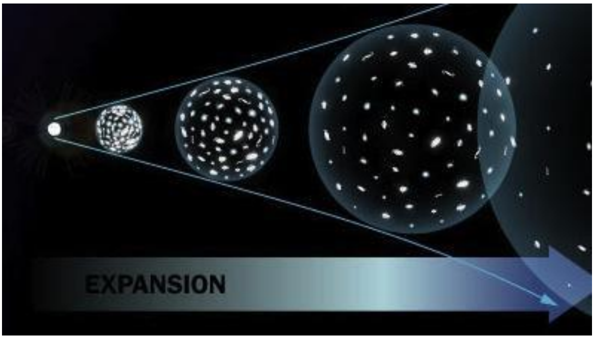

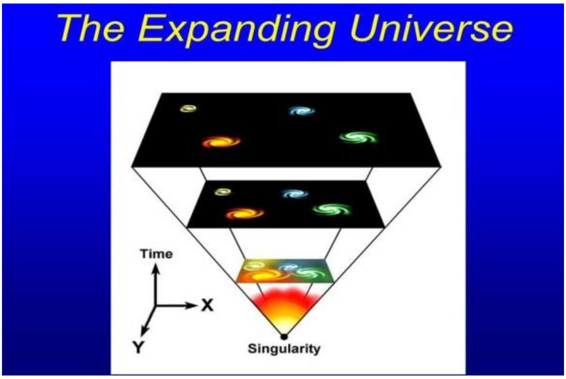

১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডুইন হাবল তার নিজের তৈরি টেলিস্কোপের মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে, ছায়াপথগুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যা পরোক্ষভাবে নির্দেশ দেয় বিশ্বজগৎ সম্প্রসারণশীল।

Scientific source -

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/nasa-s-hubble-finds-universe-is-expanding-faster-than-expected

১১। পৃথিবীর আকৃতি

[৭৯] আন-নাযি'আত (প্রচেষ্টাকারী)

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ۳۰

অর্থ: এবং এরপর তিনি যমীনকে বিস্তৃত করেছেন।

And after that He spread the earth.

(সূরা আন-নাযি'আত: আয়াত ৩০)

উপরে বর্ণিত আয়াতে আরবি "দাহহা" শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে 'উট পাখির ডিম'।

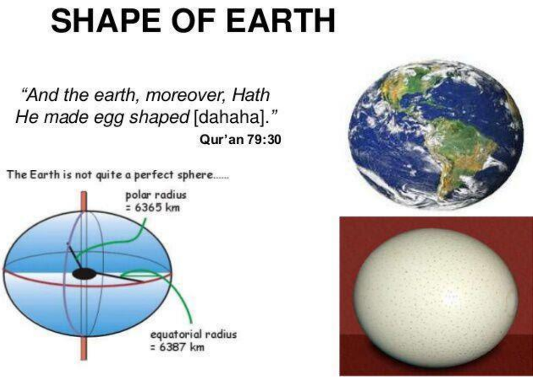

১৫৫৭ সালে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক, পৃথিবী গোলাকার এটা প্রমাণ করেন। আর মাত্র কিছুদিন আগে মানুষ জেনেছে যে, পৃথিবী আসলে সম্পূর্ণরূপে গোলাকার নয়, অনেকটা উপবৃত্তাকার অর্থাৎ পাখির ডিমের মত। আজ আমরা এটা নিশ্চিতভাবে দেখতে পাই যে, পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি উট পাখির ডিমের আকৃতির সাথে সবথেকে ভালোভাবে মিলে যায়।

Scientific source -

http://www.thetimenow.com/astronomy/earth.php

১২। সমুদ্রের গভীরে অন্ধকার

[২৪] আন-নূর (আলো)

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّىٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ؕ

ظُلُمٰتٌۢ بَعۡضُهَا فَوۡقَ بَعۡضٍ ؕ اِذَاۤ اَخۡرَجَ یَدَهٗ لَمۡ یَکَدۡ یَرٰىهَا ؕ وَمَنۡ لَّمۡ یَجۡعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوۡرًا فَمَا لَهٗ مِنۡ نُّوۡرٍ ٪ ٤٠

অর্থ: অথবা (কাফেরদের অবস্থা) গভীর সমুদ্রে ঘনীভূত অন্ধকারের মত, যাকে আচ্ছন্ন করে ঢেউয়ের উপর ঢেউ, তার উপর কালো মেঘপুঞ্জ। অন্ধকার রাশির স্তর; একটির উপর আরেকটি। কেউ হাত বের করলে আদৌ তা দেখতে পায় না। আর আল্লাহ যাকে নূর(আলো) দান করেন না তার জন্য কোনো নূর(আলো) নেই।

Or (the state of a disbeliever) is like utter darkness in a deep sea, which is covered by wave, topped by another wave, topped by dark clouds, (layers of) utter darkness, one above another. When one puts out his hand, he can hardly see it. And he, for whom Allah has not given light, then for him there is no light.

(সূরা আন-নূর: আয়াত ৪০)

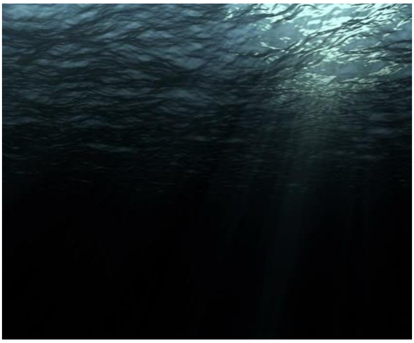

সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান অনুযায়ী, সূর্যের আলো যখন সমুদ্রপৃষ্ঠের উপর আপতিত হয় তখন এর কিছু অংশ প্রতিফলিত হয় এবং কিছু অংশ সমুদ্রের ভিতর প্রতিসরিত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০ থেকে ১৫ মিটার নিচের স্তর প্রতিসরিত আলোর লাল রং চুষে নেয়। এ কারণে যদি কোন ডুবুরি পানির ২৫ মিটার নিচে থাকে এবং ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, তাহলে সে তার রক্তের লাল রং দেখতে পাবে না। কেননা এই গভীরতায় আলোর লাল রং পৌঁছাতে

পারে না। একইভাবে পানির ৩০ থেকে ৫০ মিটার গভীরতায় কমলা রং শোষিত হয়। ৫০ থেকে ১০০ মিটার গভীরতায় হলুদ রং শোষিত হয়। ১০০ থেকে ২০০ মিটার গভীরতায় সবুজ রং শোষিত হয় এবং সর্বশেষ ২০০ মিটার গভীরতায় নীল রং শোষিত হয় এবং ২০০ মিটারের বেশি গভীরতায় বেগুনী ও আকাশী রং শোষিত হয়। ধারাবাহিকভাবে এক একটি রঙের অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কারণে একের পর এক স্তরে সমুদ্র ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। যার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ মিটার নিচে শুধুই অন্ধকার আর অন্ধকার।

Scientific source -
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_sea

দূর্গারাও কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় এর একজন প্রখ্যাত অধ্যাপক। তিনি সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের একজন পণ্ডিত। উক্ত আয়াতের ব্যাপারে একসময় তার কাছে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, শুধুমাত্র এখনই বিজ্ঞানীরা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিশ্চিত হতে পেরেছেন যে, সমুদ্রের গভীরতম স্থান গভীরভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন।
অবশেষে তিনি বলেন, চৌদ্দশ বছর আগে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং এই তথ্য অবশ্যই কোনো মহাপ্রাকৃতিক উৎস থেকে চালিত।

১৩। পিপীলিকার জীবন প্রণালী

[২৭] আন-নামল (পিপীলিকা)

حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوۡا عَلٰى وَادِ النَّمۡلِ ۙ قَالَتۡ نَمۡلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمۡلُ ادۡخُلُوۡا مَسٰكِنَكُمۡ ۚ
لَا يَحۡطِمَنَّكُمۡ سُلَيۡمٰنُ وَجُنُوۡدُهٗ ۙ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُوۡنَ ١٨

অর্থ: অবশেষে যখন তারা এক পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছলো, একটি পিপীলিকা বলল, 'ওহে পিপীলিকার দল, তোমরা

তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। সুলাইমান ও তার বাহিনী তোমাদেরকে যেন অজ্ঞাতসারে (পায়ের তলায়) পিষে না ফেলে।’

Until, when they came to the valley of the ants, an ant said: O ants! Enter your dwellings, so that Sulaiman and his hosts may not crush you while they do not perceive not.

(সূরা আন-নামল: আয়াত ১৮)

প্রাচীনকালে কিছু লোক কুরআন নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে বলতো কুরআন এমন একটি পুস্তক যার মধ্যে “পিপীলিকা একে অপরের সঙ্গে কথা বলে এবং নিজেদের মধ্যে অবাস্তব সব কথাবার্তা আদান প্রদান করে” বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্প্রতি গবেষণা থেকে জানা গেছে, যে সমস্ত প্রাণী বা পতঙ্গের জীবনধারা মানুষের জীবনধারার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যায় তাদের মধ্যে অন্যতম

হল পিপীলিকা/পিঁপড়া। এই মিল নিচের ক্ষেত্রগুলোতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়:

১। পিঁপড়েরা নিজেদের মৃতদেহকে মানুষের মতোই সমাধিস্থ করে।

২। এদের নির্দিষ্ট একটি শ্রমবিভাজন পরিকাঠামো রয়েছে। তাদের মধ্যে আছে তত্ত্বাবধায়ক, প্রধান কর্মী, সাধারণ কর্মী ইত্যাদি।

৩। কখনও কখনও এরা একত্রিত হয়ে নিজেদের মধ্যে জমিয়ে গল্পগুজব করে।

৪। এদের নিজেদের মধ্যে এক উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

৫। এরা নিয়মিত বাজারমুখো হয়, সেখানে জিনিসপত্র লেনদেন করে থাকে।

৬। শীতকালীন দীর্ঘ সময়ের জন্য এরা খাদ্যশস্য মজুদ করে। আর খাদ্যকণাগুলোতে যদি মুকুল বেরিয়ে পড়ে তাহলে মুকুলগুলো কেটে ফেলে। কেননা এরা জানে মুকুলগুলোকে বাড়তে দিলে তা পচে যাবে। যদি তাদের সঞ্চিত খাদ্যগুলো বর্ষার কারণে স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায়, তাহলে শুকনা করার জন্য তারা এগুলোকে রোদে বের করে নিয়ে আসে। যেহেতু আর্দ্রতার কারণে অঙ্কুরোদগমের বিকাশ ঘটে এবং তার ফলে খাদ্যকণা মুকুলিত হয়। তাই পিঁপড়েরা খাদ্যকণাগুলোকে শুকিয়ে সেগুলোকে আবার গর্তে নিয়ে রাখে।

Scientific source -
https://www.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/facts/ants

১৪। মৌমাছির জীবন প্রণালী

কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। তাই আরবি ব্যাকরণ অনুসারেই তার অর্থ বুঝতে হবে। বাংলা কিংবা ইংরেজি কোনোটাতেই পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য আলাদা আলাদা ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় না।

যেমন, ইংরেজিতে পুংলিঙ্গের জন্য He does the work এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য She does the work.

খেয়াল করুন, বাক্য দু'টিতে লিঙ্গের পরিবর্তন হলেও ক্রিয়া অপরিবর্তিত। পুংলিঙ্গের জন্য যেমন does, স্ত্রীলিঙ্গের জন্যও does. কিন্তু আরবিতে লিঙ্গভেদে ক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে।

[১৬] আন-নাহল (মৌমাছি)

وَاَوۡحٰی رَبُّکَ اِلَی النَّحۡلِ اَنِ اتَّخِذِیۡ مِنَ الۡجِبَالِ بُیُوۡتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
یَعۡرِشُوۡنَ ۙ ٦٨

অর্থ: আর তোমার রব মৌমাছিকে ইঙ্গিতে জানিয়েছে যে, "তুমি পাহাড়ে ও গাছে এবং তারা যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে নিবাস বানাও।

And your Lord inspired to the bee, "Take your habitations in the mountains and in the trees and in what they construct.

(সূরা আন-নাহল: আয়াত ৬৮)

আয়াতটিতে মৌচাক নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। আরবি ব্যাকরণে, পুরুষ মৌমাছিকে মৌচাক নির্মাণের নির্দেশ দিতে ব্যবহৃত ক্রিয়া হলো 'ইত্তাখিজ' আর স্ত্রী মৌমাছির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ক্রিয়া হলো 'ইত্তাখিজি'।

কুরআনের এই আয়াতে মৌমাছিকে নির্দেশ দিতে 'ইত্তাখিজি' ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ নির্দেশটি স্ত্রী মৌমাছিকে দেওয়া হয়েছে। পুরুষ মৌমাছিকে নয়।

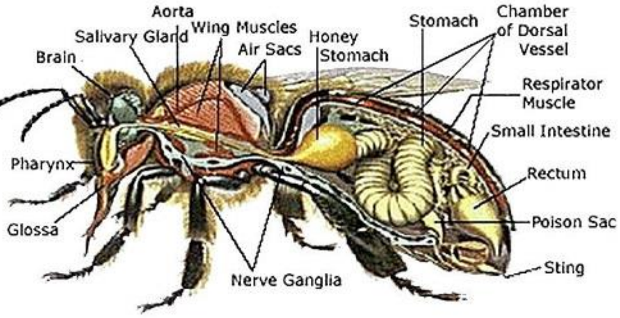

অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী Karl-Von-Frisch ১৯৭৩ সালে 'Physiology of Medicine' বিষয়ক গবেষণায় সফলতার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল

পুরস্কার লাভ করেন। তার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল ‘মৌমাছির জীবনচক্র’ অর্থাৎ মৌমাছিরা কিভাবে তাদের জীবন নির্বাহ করে।

তিনি ফটোগ্রাফি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আলোকে দেখিয়েছেন যে, মৌমাছি তিন প্রকার।

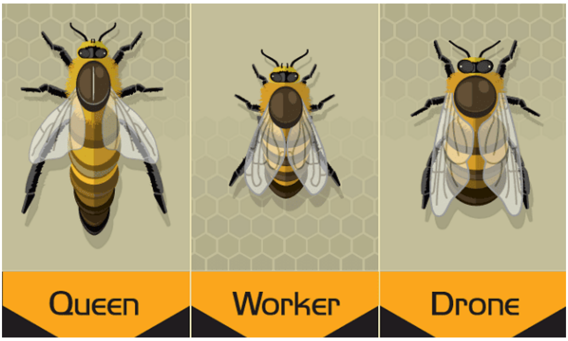

প্রথমটা হলো Drone Bee বা পুরুষ মৌমাছি। পুরুষ মৌমাছি শুধুমাত্র একটি কাজ করে, আর তা হলো রাণী মৌমাছিদের প্রজনন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা। অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনে ভূমিকা রাখে।

দ্বিতীয়টি হলো স্ত্রী মৌমাছি। এই মৌমাছিদের বলা হয় Queen Bee বা রাণী মৌমাছি। এরা সন্তান উৎপাদন ব্যতীত আর কোন কাজে অংশগ্রহণ করেনা।
আরও একপ্রকার মৌমাছি আছে, যারা লিঙ্গভেদে স্ত্রী মৌমাছি কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে সন্তান জন্মদানে অক্ষম। এই বিশেষ শ্রেণীর স্ত্রী মৌমাছিরাই ফুল ফল থেকে নির্যাস সংগ্রহ করে থাকে, একইসাথে মৌচাক নির্মাণ এবং বাদবাকি কাজ সম্পন্ন করে থাকে। বিজ্ঞানী Karl-Von-Frisch এই মৌমাছিদেরকে Worker Bee বা কর্মী মৌমাছি হিসেবে বিশেষায়িত করেন।

Scientific source -

https://en.wikipedia.org/wiki/Honey_bee#Sexes_and_castes

পরবর্তী আয়াতে আছে,

[১৬] আন-নাহল (মৌমাছি)

ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٦٩

অর্থ: অতঃপর, আহার করো প্রত্যেক ফল থেকে এবং চলো স্বীয় রবের সহজ-সরল পথে।” তার পেট থেকে এমন পানীয় বের হয়, যার রং ভিন্ন ভিন্ন, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগ নিরাময়। নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।

Then, eat from all the fruits, and follow the ways of your Lord made easy (for you).” There comes forth from their bellies, a drink of varying colours, which is a healing for mankind. Indeed, in that is a Sign for people who think.

(সূরা আন-নাহল: আয়াত ৬৯)

আরবি ব্যাকরণে আহার করা বা পান করার ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত ক্রিয়া হলো ‘কুল’ এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয় ‘কুলি’। কুরআনে উল্লেখিত আয়াতে ‘কুল’ ব্যবহার না করে ‘কুলি’ ব্যবহৃত হয়েছে।

‘সহজ-সরল পথে’ চলার নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত ক্রিয়া হলো ‘উসলুক’ এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয় ‘উসলুকি’। কুরআনে এখানে ‘উসলুকি’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ নির্দেশটি স্ত্রী মৌমাছির জন্য; পুরুষ মৌমাছির জন্য নয়।
কুরআনে কর্মী মৌমাছিগুলোকে সহজ-সরল পথে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞানী Karl-Von-Frisch প্রমাণ করেছেন যে, কোন কর্মী মৌমাছি কোন স্থানে ফুলের উদ্যানের সন্ধান পেলে মৌমাছিটি তার অন্যান্য সঙ্গীদের ওই ফুলের উদ্যান সম্পর্কে ঠিক সে পথেরই সন্ধান জানায়, যে পথ অবলম্বন করে সে উদ্যানে গিয়েছিল। অন্যান্য কর্মী মৌমাছিরাও একই পথ অনুসরণ করে সেই উদ্যানে পোঁছায়। এটাই কুরআনে বর্ণিত তাদের সহজ-সরল পথ। বিজ্ঞানী Karl-Von-Frisch কর্মী মৌমাছিদের ফুলের উদ্যানে যাওয়ার এই পদ্ধতিটির নামকরণ করেন "Waggle Dance"।

Scientific source -
https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Frisch#Dances_as_language

যে বিষয়টি ১৯৭৩ সালে বিজ্ঞানী Karl-Von-Frisch প্রমাণ করেছেন, তা ১৪০০ বছর আগে কুরআন আমাদেরকে জানিয়েছে।

আয়াতে আরো বলা হয়েছে, 'তার পেট থেকে এমন পানীয় বের হয়, যার রং ভিন্ন ভিন্ন, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগ নিরাময়।'

(সূরা আন-নাহল: আয়াত ৬৯)

পূর্বে মানুষ ধারণা করতো, মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে। কিন্তু আজ বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, ফুল ও ফল থেকে মৌমাছি এক ধরনের নির্যাস সংগ্রহ করে যা পরবর্তীতে তার পেটের অভ্যন্তরে মধুতে পরিণত হয়।

Scientific source -

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2013/aug/10/how-bees-make-honey-ask-a-grown-up

https://honeybee.org.au/education/wonderful-world-of-honey/how-bees-make-honey/

https://www.livescience.com/37611-what-is-honey-honeybees.html

কুরআন আরো বলেছে মধুর ঔষুধীগুণের কথা। আজ বিজ্ঞান বলছে, মধুর মধ্যে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন আর ফ্রুক্টোজ। এছাড়া মধু জীবাণুনাশক হিসেবেও কার্যকর।

Scientific source -

https://en.wikipedia.org/wiki/Honey - Nutrition

১৫। পাখিদের ভাষা

[২৭] আন-নামল (পিপীলিকা)

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ؕ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ١٦

অর্থ: আর সুলায়মান দাউদের ওয়ারিস হল এবং সে বলল, 'হে মানুষ, আমাদেরকে পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে এবং আমাদেরকে সকল কিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ'।

And Sulaiman inherited (the Knowledge of) Dawood. And he said: O people! We have been taught the language of birds, and we have been given everything. Indeed, this is an evident grace (from Allah).

(সূরা আন-নামল: আয়াত ১৬)

কুরআন এখানে পাখিদের ভাষার কথা বলছে, যা শেখানো হয়েছিল সুলায়মান (আ.) কে।

মারিয়া লুইসা ডা সিলভা কর্তৃক ব্রাজিলিয়ান হামিং বার্ড এর উপর দীর্ঘ এক গবেষণার পর এর ফলাফল বিখ্যাত সাইন্স ম্যাগাজিন 'ন্যাচার' এ প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়-হামিং বার্ড এর কণ্ঠনিঃসৃত শব্দগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ আছে, যেগুলো অন্য হামিং বার্ডকে নির্দিষ্ট কাজ করতে উৎসাহিত করে। এরা নিজেদের মধ্যে শব্দ বিনিময়ের মাধ্যমে যোগাযোগ করে।

কাকের উপর গবেষণার একটি ফলাফল নিম্নরূপ-

এরা কয়েকশত প্রকারের বিভিন্ন শব্দ তৈরি করতে পারে, যেগুলোর নির্দিষ্ট অর্থ আছে। একটি কলোনির সকল কাককে সতর্ক করতে, কোন কলোনির কাকদেরকে এক জায়গায় একত্রিত করতে, নিজেদের দুরবস্থার কথা অন্যকে জানাতে এরা নির্দিষ্ট ধরনের শব্দ তৈরি করে থাকে।

Scientific source -

https://www.zmescience.com/science/biology/babbler-bird-speech-07012015/

১৬। পিঁপড়া কাচের তৈরি

[২৭] আন-নামল (পিপীলিকা)

حَتّٰٓی اِذَآ اَتَوۡا عَلٰی وَادِ النَّمۡلِ ۙ قَالَتۡ نَمۡلَۃٌ یّٰۤاَیُّهَا النَّمۡلُ ادۡخُلُوۡا مَسٰکِنَکُمۡ ۚ لَا یَحۡطِمَنَّکُمۡ سُلَیۡمٰنُ وَجُنُوۡدُہٗ ۙ وَهُمۡ لَا یَشۡعُرُوۡنَ ١٨

অর্থ: অবশেষে যখন তারা এক পিঁপড়া অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছলো, একটি পিপীলিকা বলল, 'ওহে পিঁপড়ার দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। সুলায়মান ও তার বাহিনী তোমাদেরকে যেন অজ্ঞাতসারে (পায়ের তলায়) পিষে না ফেলে।'

Until, when they came to the valley of the ants, an ant said: O ants! Enter your dwellings, so that Sulaiman and his hosts may not crush you while they do not perceive not.

(সূরা আন-নামল: আয়াত ১৮)

কিছু ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষ পণ্ডিত একবার কয়েক সদস্য বিশিষ্ট একটি গবেষক দল গঠন করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল কুরআন থেকে অন্তত একটি ভুল বের করে একথা প্রমাণ করা যে, কোন কিতাবই নিঁখুত ও নির্ভুল নয়।

অবশেষে গবেষণার পর তারা সূরা নামলের উল্লিখিত আয়াতে لا يحطمنكم শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ ও প্রয়োগ স্থান নিয়ে আপত্তি জানালো। কারণ "التحطيم" শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভেঙে টুকরো টুকরো করা বা পিষে গুড়া করা। কাজেই "التحطيم" শব্দটির যথার্থ ব্যবহার কাঁচ বা কাঁচ জাতীয় পদার্থ ছাড়া অন্য কিছুতে সম্ভব নয়। তাহলে কিভাবে পিঁপড়ার ক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করা সঠিক হতে পারে? যেহেতু পিঁপড়াকে পায়ের নিচে

ফেলে টুকরো করা বা গুড়া করা যায় না সেহেতু এই শব্দটি পিঁপড়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যথাযথ নয়।

এর বহুদিন পর অস্ট্রেলিয়ার প্রাণিবিদ্যা বিভাগের একজন অধ্যাপকের 'পিঁপড়ার জীবন রহস্য' বিষয়ক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পিঁপড়ার শরীরের বাহিরের অংশে প্রায় ৭৫ শতাংশ কাঁচের উপাদান বিদ্যমান। এবং এর দেহ উন্নত মানের গ্লাস ফাইবার দ্বারা তৈরি। যার ফলে একটি মৃত পিঁপড়ার খোলস সামান্য আঘাতে ভেঙে অনেকগুলো খন্ডে টুকরো হতে দেখা যায়।

Scientific source -

https://harvardforest.fas.harvard.edu/ants/body-structure

https://www.businessinsider.com/pirate-ant-looks-like-its-made-of-glass-2013-5

https://blogs.scientificamerican.com/compound-eye/a-recipe-for-photographing-angry-fire-ants/

১৭। রহস্যময় মাছি

[২২] আল-হাজ্ব (হাজ্ব)

يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِاجْتَمَعُوْا لَهٗ ؕ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا
لَّايَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ؕ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ٧٣

অর্থ: হে মানুষ, একটি উপমা পেশ করা হল, মনোযোগ দিয়ে তা শোন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তারা তার কাছ থেকে সেটাও উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষণকারী ও যার কাছে অন্বেষণ করা হয় উভয়েই দুর্বল।

O people! An example is presented, so listen to it. Indeed, those whom you invoke besides Allah, will never (be able to) create a fly, even if they gathered together for that purpose. And if the fly snatched away a (tiny) thing from them, they could not take it back from it(fly). So weak are the seeker and the sought.

(সূরা আল-হাজ্জ: আয়াত ৭৩)

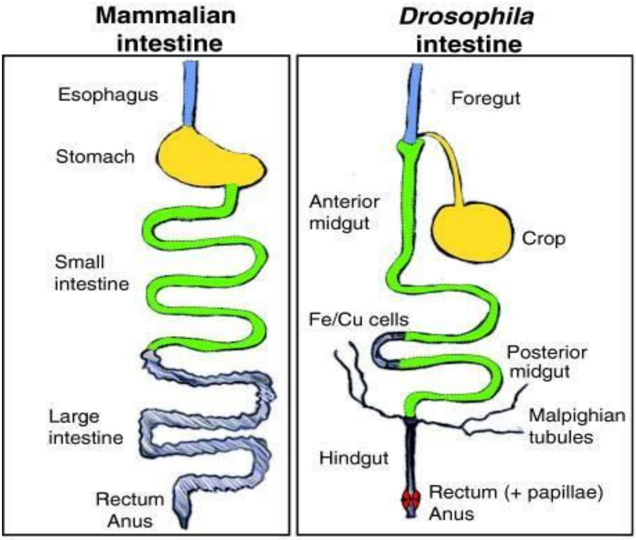

বিজ্ঞান আজ আমাদেরকে বলে, মাছিদের কোন পাকস্থলী নেই। তাই তারা যা খায় তা পুনরায় তাদের পেট থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

Scientific source -

https://www.researchgate.net/figure/Alimentary-canal-of-the-adult-house-fly-Liquified-food-often-premixed-with-saliva-is_fig3_313241687

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3014343/

১৮। উচ্চতায় শ্বাসকষ্ট

[৬] আল-আন'আম (গৃহপালিত পশু)

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ

يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ ؕ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ

الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ 125

অর্থ: সুতরাং যাকে আল্লাহ হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে ভ্রষ্ট করতে চান, তার বক্ষ সংকীর্ণ-সংকুচিত করে দেন, যেন সে আসমানে আরোহণ করছে। এমনিভাবে আল্লাহ অকল্যাণ দেন তাদের উপর, যারা ঈমান আনে না।

So whoever Allah wills to guide, He opens his breast to Islam, and whoever He wills to misguide, He makes his breast tight and constricted, as if he is climbing up to the sky. Thus Allah puts the wrath on those who do not believe.

(সূরা আল-আন'আম: আয়াত ১২৫)

বিজ্ঞান আজ আমাদেরকে বলে, উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমতে থাকে। তাই একজন যদি অনেক উঁচু জায়গায় আরোহণ করে তবে তার অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসকষ্ট শুরু হবে অর্থাৎ বুক সংকুচিত ও সংকীর্ণ হয়ে আসবে।

Scientific source -
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28398844/

১৯। পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা

[৩৪] আস-সাবা (রাণী সাবা)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ
الْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا
أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٣

অর্থ: আর কাফেররা বলে, ‘কিয়ামত আমাদের উপর আসবে না।’ বল, অবশ্যই, আমার রবের কসম! যিনি গায়েব সম্পর্কে অবগত, তা তোমাদের কাছে আসবেই। আসমানসমূহ ও যমীনে অণু পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা ছোট অথবা বড় কিছুই তাঁর অগোচরে নেই, বরং এক সুস্পষ্ট গ্রন্থে তা সংরক্ষিত।

Those who disbelieve say: ‘The Hour will not come to us.’ Say: Yes, by my Lord, it will surely come to you, (Allah, He is the) All-Knower of the unseen. Not even the weight of an atom or less than that or greater escapes His Knowledge in the heavens or in the earth, but it is (written) in a Clear Book.’

(সূরা আস-সাবা: আয়াত ৩)

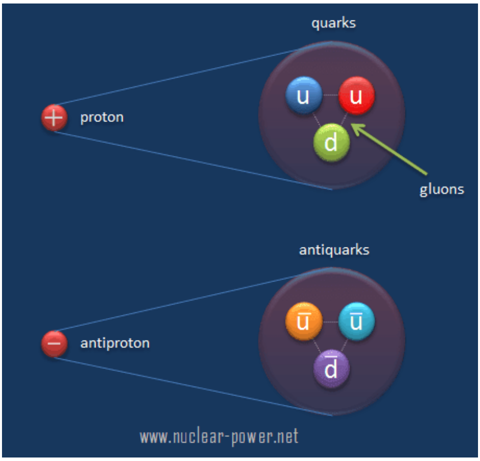

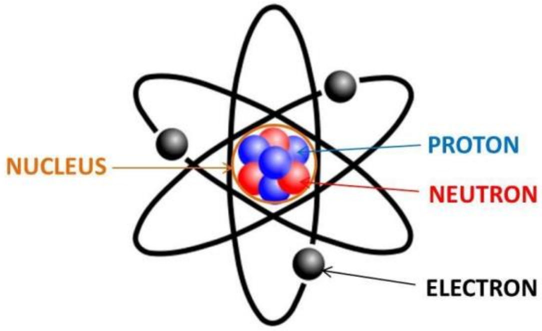

আরবি ‘যাররাহ’ শব্দটি খুবই সাধারণভাবে অণু অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানে আবিষ্কার হয়েছে, একটি অণুকেও ভাঙা সম্ভব হতে পারে। এই আবিষ্কারটি বিংশ শতাব্দীর এক মহা বিকাশ।

Scientific source -

http://www.bbc.com/earth/story/20151120-how-do-we-know-that-things-are-really-made-of-atoms

২০। ফিঙ্গার প্রিন্ট (Finger Print)

[৭৫] আল-ক্বিয়ামাহ (পুনরুত্থান)

أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ ٣

অর্থ: মানুষ কি মনে করে যে, আমি কখনই তার অস্থিসমূহ একত্র করব না?

Does man (a disbeliever) think that We will not assemble his bones?

(সূরা আল-ক্বিয়ামাহ: আয়াত ৩)

بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ ٤

অর্থ: হ্যাঁ, আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্তও পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।

Yes, We are Able to restore (even) his fingertips.

(সূরা আল-ক্বিয়ামাহ: আয়াত ৪)

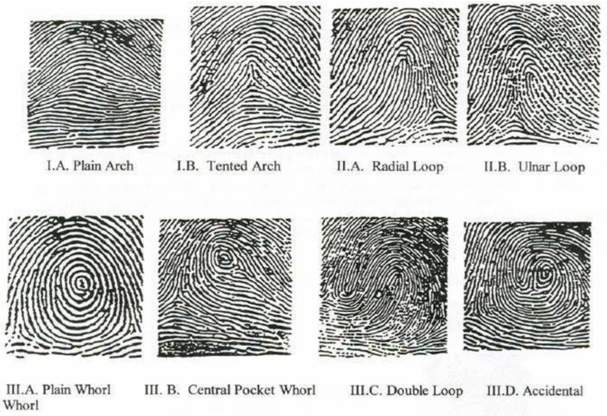

পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে অবিশ্বাসীরা বলে, মৃত ব্যক্তিদের অস্থিগুলো খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে মাটিতে মিশে যাওয়ার পর বিচার দিবসে আলাদা করে প্রত্যেককে কিভাবে শনাক্ত করা সম্ভব? সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, তিনি শুধু আমাদের অস্থিগুলোকে একত্রিত করতে পারেন তা না বরং তিনি আমাদের আঙ্গুলের ছাপগুলোকে যথাযথভাবে পুনর্বিন্যাস করতে সক্ষম।

যেখানে দৃঢ়তার সাথে ব্যক্তি বিশেষের সনাক্তকরণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেখানে কুরআন নির্দিষ্ট করে আঙ্গুলের ছাপের কথা বলছে। কিন্তু কেন?

স্যার ফ্রান্সিস এর দীর্ঘ গবেষণার পর ১৯৮০ সালে আবিষ্কৃত শনাক্তকরণের বৈজ্ঞানিক পন্থা হলো ফিঙ্গারপ্রিন্ট। দুই ব্যক্তির ফিঙ্গারপ্রিন্ট কখনো এক হতে পারেনা। একারণেই অপরাধীদের শনাক্তকরণে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করা হয়।

Scientific source -
https://en.wikipedia.org/wiki/Fingerprint

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ.

অর্থ: আর কাফিররা বলে, 'যখন আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষরা মাটি হয়ে যাব, তখনো কি আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে?' (সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬৭)

قَالُوْٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ.

অর্থ: তারা বলে, 'যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনো কি আমরা পুনরুত্থিত হব?' (সূরা আল মু'মিনুন, আয়াত: ৮২)

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ط بَلْ هُمْ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ كٰفِرُوْنَ.

অর্থ: আর তারা বলে, 'আমরা যখন মাটিতে মিশে যাব তখন কি আমাদেরকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?' বরং তারা তাদের রবের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে। (সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত : ১০)

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ. بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ.

অর্থ: মানুষ কি মনে করে যে, আমি কখনই তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারব না? হ্যাঁ, আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগসমূহও পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। (সূরা আল-কিয়ামা, আয়াত: ৩-৪)

وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا. ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا.

অর্থ: আর আল্লাহ তোমাদেরকে উদগত করেছেন মাটি থেকে। অতঃপর তাতে তিনি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেবেন এবং তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। (সূরা নূহ, আয়াত: ১৭-১৮)

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ؕ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থ: আর তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন আর এটা তাঁর জন্য অধিকতর সহজ। আসমানসমূহ ও যমীনে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা আর-রুম, আয়াত: ২৭)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ. وَّحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً. فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ.

অর্থ: অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে- একটিমাত্র ফুৎকার। আর যমীন ও পর্বতমালা উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একটি আঘাতে সেগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, সেদিন সংঘটিত হবে মহাঘটনা (কিয়ামত)। আসমান হয়ে যাবে বিদীর্ণ এবং তা সেদিন বিক্ষিপ্ত হবে। (সূরা আল-হাক্কাহ, আয়াত: ১৩-১৬)

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ. وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ.

অর্থ: সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মতো। এবং পর্বতসমূহ হবে রঙিন পশমের মতো। (সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ৮-৯)

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ؕ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ .

অর্থ: সেদিন যমীন বিদীর্ণ হয়ে মানুষ দ্রুত বের হয়ে আসবে। এই সমবেতকরণ আমার জন্য অতীব সহজ। (সূরা কাফ, আয়াত: ৪৪)

يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ.

অর্থ: যেদিন মানুষ সত্য সত্যই শ্রবণ করবে এক বিকট আওয়াজ, সেই দিনই পুনরুত্থান দিবস। (সূরা কাফ, আয়াত: ৪২)

فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ.

অর্থ: দুর্ভোগ সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য। (সূরা আত-তূর, আয়াত: ১১)

خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ط يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ.

অর্থ: তারা তাদের দৃষ্টি অবনত অবস্থায় কবর থেকে বের হবে। যেন তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল। তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে। কাফিররা বলবে, এটা বড়ই কঠিন দিন। (সূরা আল-কামার, আয়াত: ৭-৮)

يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ. خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ط ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ.

অর্থ: সেদিন তারা কবর থেকে বের হবে দ্রুতবেগে, যেন তারা কোনো লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। অবনত চোখে; তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে হীনতা। এটাই হল সেই দিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। (সূরা আল-মা'আরিজ, আয়াত: ৪৩-৪৪)

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ط ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ.

অর্থ: যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; (সেদিন বলা হবে,) 'জাহান্নামের স্পর্শ আস্বাদন করো ।' (সূরা আল-কামার, আয়াত: ৪৮)

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ط وَاللّٰهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

অর্থ: আর আল্লাহ কখনো কোনো প্রাণকেই অবকাশ দেবেন না, যখন তার নির্ধারিত সময় এসে যাবে। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। (সূরা আল-মুনাফিকুন, আয়াত: ১১)

فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۙ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ.

অর্থ: সুতরাং কেন নয়- যখন রূহ পৌঁছে যায় কণ্ঠনালীতে। আর তখন তোমরা তাকিয়ে থাকো। (সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ৮৩-৮৪)

(অর্থাৎ যদি তোমরা নিজেদেরকে সর্বেসর্বা মনে করে থাকো তবে কেন পার না তোমাদের প্রাণকে তোমাদের শরীরে রেখে দিতে?)

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ.

অর্থ: যখন সূর্যকে (আলোহীন অবস্থায়) গুটিয়ে নেওয়া হবে, আর যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে। (সূরা আত-তাকভীর, আয়াত: ১-২)

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ.

অর্থ: আর যখন সমুদ্ররাশিকে প্রজ্জ্বলিত করে উত্তাল করা হবে। (সূরা আত-তাকভীর, আয়াত: ৬)

وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ. وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ.

অর্থ: যখন জাহান্নামকে প্রজ্জ্বলিত করা হবে, আর যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে, তখন প্রত্যেকেই জানবে, সে কী উপস্থিত করেছে। (সূরা আত-তাকভীর, আয়াত: ১২-১৪)

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ. وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ. يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ.

অর্থ: যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, আর যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে, আর যখন সমুদ্ররাশি উদ্বেলিত হবে, আর যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে; তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে, সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কী রেখে এসেছে পেছনে। হে মানুষ, কীসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে? (সূরা আল-ইনফিতার, আয়াত: ১-৬)

২১। বেদনাগ্রাহী ইন্দ্রিয় (Pain Receptor)

[৪] আন-নিসা (নারী)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ط كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ٥٦

অর্থ: নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাবো আগুনে। যখনই তাদের চামড়াগুলো পুড়ে যাবে তখনই আমি তাদেরকে পাল্টে দেবো অন্য চামড়া দিয়ে যাতে তারা আস্বাদন করে আযাব। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

Indeed! Those who disbelieved in Our Signs, Soon We will burn them in a Fire. Every time their skins are roasted, We will replace them with another skin, so that they may taste the punishment. Indeed, Allah is All-Mighty, All-Wise.

(সূরা আন-নিসা: আয়াত ৫৬)

অর্থাৎ কুরআন বলেছে, ত্বকের মধ্যে বেদনার অনুভূতি বিদ্যমান।

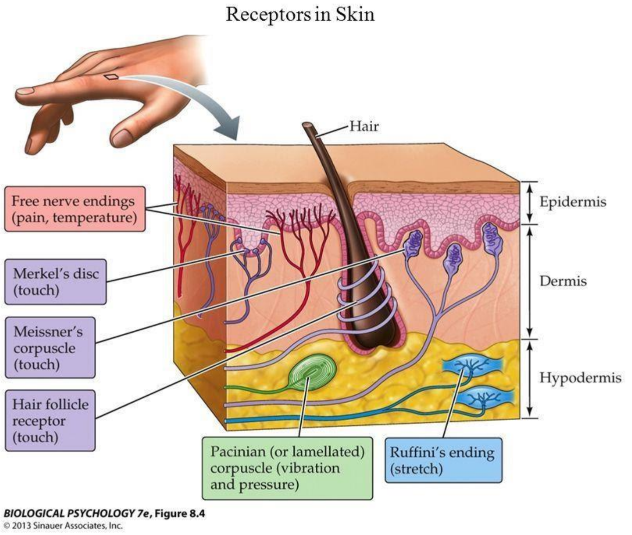

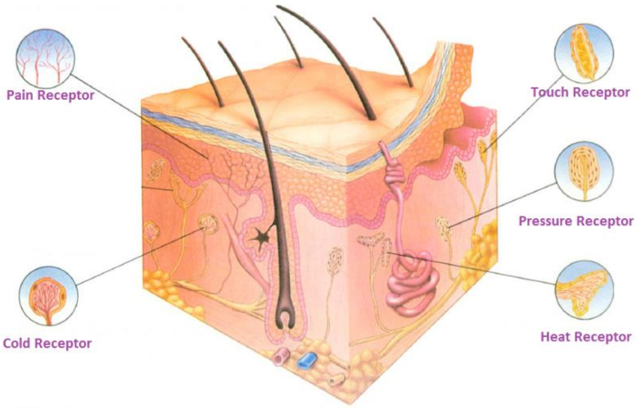

আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করে যে, ত্বকের মধ্যেই বেদনাগ্রাহী ইন্দ্রিয় রয়েছে। ত্বক ছাড়া কোন ব্যক্তি ব্যাথা-বেদনা অনুভব করতে পারে না।

Scientific source -
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3674740/

২২। মিথ্যাচারী, পাপী কেশগুচ্ছ

পৃথিবীতে যারা মিথ্যাচারী, পাপী ও সীমালংঘনকারী তাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

[৯৬] আল-আলাক (রক্তপিন্ড)

كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ١٥

অর্থ: কখনো নয়, যদি সে বিরত না হয়, অবশ্যই আমি তাকে কপালের সম্মুখভাগের চুল ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাব।

Nay! If he ceases not, surely We will drag him by the forelock.

(সূরা আল-আলাক: আয়াত ১৫)

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ١٦

অর্থ: মিথ্যাচারী পাপী কেশগুচ্ছ।

A lying, sinful forelock.

(সূরা আল-আলাক: আয়াত ১৬)

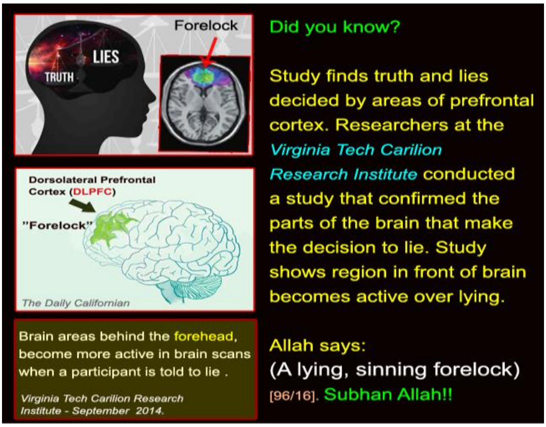

এখানে প্রশ্ন হল, সীমালংঘনকারীদের মাথায় শুধুমাত্র অগ্রভাগের কেশগুচ্ছকে মিথ্যাচারী, পাপী কেশগুচ্ছ কেন বলা হয়েছে।

বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে, মানুষের মাথায় সামনের কেশগুচ্ছের নিচে তথা মস্তিষ্কের অগ্রভাগে যে অংশ থাকে তা হচ্ছে সেরেব্রামের প্রিফ্রন্টাল এরিয়া। Gray's Anatomy অনুযায়ী, "মানুষের পরিকল্পনা, কর্মের সিদ্ধান্ত এবং ভাল অথবা খারাপ কাজের সিদ্ধান্তের উৎস হচ্ছে প্রিফ্রন্টাল এরিয়া"।

অর্থাৎ মানুষ খারাপ কাজ করবে না ভাল কাজ করবে তার সিদ্ধান্ত হয় মাথার সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছের নিচে অবস্থিত প্রিফ্রন্টাল এরিয়াতে।

Scientific source -
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3313946/

২৩। লোহার রহস্য

[৫৭] আল-হাদিদ (লোহা)

وَاَنۡزَلۡنَا الۡحَدِيۡدَ فِيۡهِ بَاۡسٌ شَدِيۡدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ٢٥

অর্থ: আমি আরো নাযিল করেছি লোহা, তাতে প্রচন্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে।

And We sent down iron wherein (is) mighty power (in matters of war), and many benefits for mankind.

(সূরা আল-হাদিদ: আয়াত ২৫)

আয়াতে উল্লেখিত “আনজালনা” শব্দের অর্থ হলো “নাযিল করা” অর্থাৎ “Sent down”।

অর্থাৎ কুরআনের এই আয়াত আমাদেরকে নির্দেশনা দেয়, লোহা পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল পৃথিবীর বাইরে অন্য কোথাও থেকে।

আজ বিজ্ঞান আমাদেরকে জানিয়েছে, আমাদের সৌরজগতে এমন কোন গঠন প্রণালী নেই যা লোহার উৎপত্তি ঘটাতে পারে। লোহা কেবলমাত্র সূর্যের চেয়ে বড় কোন নক্ষত্রেই তৈরি হতে পারে যেখানে তাপমাত্রা কোটি ডিগ্রির কাছাকাছি।

এমন কোন গলিত নক্ষত্রের বিস্ফোরণের মাধ্যমেই লোহার উৎপত্তি সম্ভব। আর এই ধরনের বিস্ফোরণের মাধ্যমে সৃষ্ট লোহার টুকরোগুলো পরবর্তীতে পৃথিবীতে আপতিত হওয়ার ফলে লোহা অস্তিত্বলাভ করে।

Scientific source -
https://sciencing.com/origin-iron-5371252.html

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ .

অর্থ: নিশ্চয় আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোনো উপদেশগ্রহণকারী আছে কি? (সূরা আল-কামার, আয়াত: ১৭)

اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ . لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ .

অর্থ: এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ, তার জন্য- যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে চায়। (সূরা আত-তাকভীর, আয়াত: ২৭-২৮)

২৪। ব্ল্যাক হোল (Black Hole)

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[৫৬] আল-ওয়াকিয়া (নিশ্চিত ঘটনা)

فَلَآ أُقۡسِمُ بِمَوٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ٧٥

অর্থ: সুতরাং আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের (অবস্থানের)

So I swear by (the) setting (position) (of) the stars.

(সূরা আল-ওয়াকিয়া: আয়াত ৭৫)

[৫৩] আন-নাজ্‌ম (তারা)

وَٱلنَّجۡمِ إِذَا هَوَىٰ ١

অর্থ: শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্ত যায়।

By the star when it goes down, (or vanishes).

(সূরা আন-নাজ্‌ম: আয়াত ১)

مواقع শব্দটি موقع এর বহুবচন। আরবি ব্যাকরণে শব্দটির দুটি অর্থ রয়েছে- একটি অর্থ তারকারাজি ও গ্রহসমূহের 'অবস্থানস্থল', এবং আরেকটি অর্থ নক্ষত্রের অস্তাচল বা চোখের আড়ালে চলে যাওয়া। অর্থাৎ এই আয়াতে নক্ষত্রের অস্তে যাওয়া কিংবা চোখের আড়ালে চলে যাওয়া একটি অবস্থানের কথা বলা হয়েছে।

প্রতিটি নক্ষত্র তার জীবনচক্র সমাপন করে বিস্ফোরণের মাধ্যমে ধ্বংসের চূড়ান্ত পর্যায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সূর্যের চেয়ে যেসব নক্ষত্রের ভর ৮ থেকে ১৫০ গুণ বেশি তারা জীবনের শেষভাগে Supernova-তে (নবজাতক নক্ষত্রে) পরিণত হয়। অর্থাৎ তাদের বিস্ফোরণ ঘটে। আর এই বিস্ফোরণে জন্ম নেয় 'Black hole'। উল্লেখিত আয়াতে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্র সম্পর্কেই বলা হয়েছে। মহাকাশের প্রতিটি নক্ষত্রেরই রয়েছে নির্দিষ্ট অবস্থান এবং সেখানে তাদের ধ্বংস হয়। আল্লাহ তা'আলা সেই ধ্বংসাত্মক স্থানের শপথ করেছেন যার মাধ্যমে Black hole-এর তথ্য পাওয়া যায়।

অধ্যাপক 'জন মিচেল' তার এক গবেষণাপত্রে দেখান যে, কোন নক্ষত্রের যথেষ্ট ভর ও ঘনত্ব থাকলে, তার মহাকর্ষীয় আকর্ষণ ক্ষেত্র এত প্রবল হবে যে, তাতে আলো পতিত হলে তা ঐ আকর্ষণ ক্ষেত্রের প্রবল টানে আটকে যাবে, যা ঐ ক্ষেত্র থেকে আর বের হতে পারবে না। আর ঐ বস্তু থেকে

আলো বের হতে না পারলে চোখের রেটিনায় কোন বিম্ব সৃষ্টি না হবার কারণে ঐ বস্তু আমাদের কাছে অদৃশ্য রয়ে যাবে। জন মিচেলের মতে এটাই Black hole।

Scientific source -

https://www.nasa.gov/audience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-a-black-hole-k4.html

আর এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

[৮১] আত-তাকভীর (অন্ধকারাচ্ছন্ন)

فَلَآ اُقۡسِمُ بِالۡخُنَّسِ ۙ ١٥

অর্থ: কিন্তু না, আমি শপথ করছি অপসৃত হওয়া নক্ষত্রসমূহের,

But nay! I swear by the retreating planets,

(সূরা আত-তাকভীর: আয়াত ১৫)

الۡجَوَارِ الۡكُنَّسِ ۙ ١٦

অর্থ: যা চলমান ও অদৃশ্য হয়।

Those that run (and) disappear.

(সূরা আত-তাকভীর: আয়াত ১৬)

২৫। চাঁদের আলোর রহস্য

[২৫] আল-ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী)

تَبٰرَكَ الَّذِىۡ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوۡجًا وَّجَعَلَ فِيۡهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيۡرًا ٦١

অর্থ: কত বরকতময় তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন বিশাল তারকাপুঞ্জ এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও আলো বিকিরণকারী চাঁদ।

Blessed is He Who has placed in the skies constellations,

and has placed therein a lamp (sun) and a moon shining.

(সূরা আল-ফুরকান: আয়াত ৬১)

[১০] ইউনুস (নবী ইউনুস)

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا ٥

অর্থ: তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিমান এবং চাঁদকে করেছেন প্রতিবিম্বিত আলো।

He is the One Who made the sun a shining light and the moon a reflected light.

(সূরা ইউনুস: আয়াত ৫)

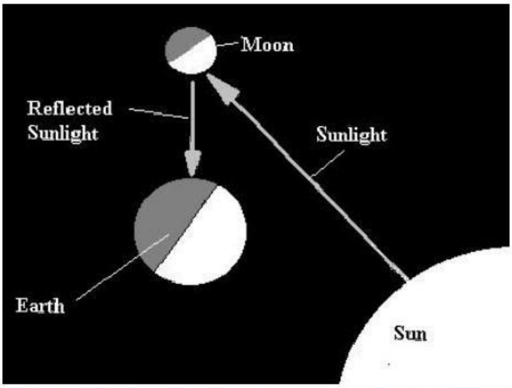

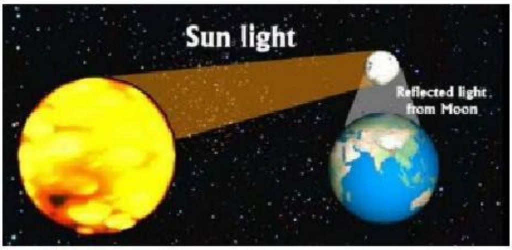

আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে, চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। চাঁদের আলো প্রতিবিম্বিত আলো, যে আলোর উৎস হলো সূর্য।

Scientific source -
https://en.wikipedia.org/wiki/Moonlight

২৬। সমুদ্রের পানির রহস্য

[৫৫] আর-রাহ্মান (পরম করুণাময়)

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ١٩

অর্থ: তিনি পাশাপাশি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছেন, যারা পরস্পর মিলিত হয়।

He released the two seas, meeting together.

(সূরা আর-রাহ্মান: আয়াত ১৯)

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ٢٠

অর্থ: উভয়ের মাঝে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করতে পারে না

Between them is a barrier, which they cannot transgress.

(সূরা আর-রাহ্মান: আয়াত ২০)

আধুনিক বিজ্ঞান মতে, সমুদ্রের পৃষ্ঠটান এবং ঘনত্বের পার্থক্যের জন্য এক সমুদ্রের পানি অপরটির পাশ দিয়ে প্রবাহিত হলেও পরস্পর মিশে যায় না।

যেমন, গালফ অব মেক্সিকোতে হাজার হাজার মাইলব্যাপি লোনা পানি আর মিঠা পানির সাগর পাশাপাশি প্রবাহিত হলেও একটির পানি আরেকটির সাথে মিশে যায় না।

Scientific source -
https://www.youtube.com/watch?v=RCU02misN5o

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِى تَشْرَبُونَ. ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ
الْمُنزِلُونَ. لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ.

অর্থ: তোমরা যে পানি পান করো, সে ব্যাপারে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা কি তা মেঘ হতে নামিয়ে আনো, না আমি বর্ষণকারী? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি, তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না? (সূরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত: ৬৮-৭০)

২৭। থিওরী অব রিলেটিভিটি

[৩২] আস-সাজদাহ্ (সিজদা)

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٥

অর্থ: তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কার্য পরিচালনা করেন। অতঃপর তা তাঁর কাছে উত্থাপন করা হবে, এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।

He regulates the affair of the heaven to the earth, then it will ascend to Him, in a Day, (the) measure of which is a thousand years of what you count.

(সূরা আস-সাজদাহ্: আয়াত ৫)

تَعۡرُجُ الۡمَلٰٓئِکَۃُ وَالرُّوۡحُ اِلَیۡهِ فِیۡ یَوۡمٍ کَانَ مِقۡدَارُهٗ خَمۡسِیۡنَ اَلۡفَ سَنَۃٍ ٤

অর্থ: ফেরেশতা এবং রূহ তার দিকে উর্ধ্বগামী হয়, এমন একদিনে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।

The Angels and the Spirit ascend to Him in a Day, the measure of which is fifty thousand years.

(সূরা আল-মা'আরিজ: আয়াত ৪)

কুরআন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, আমরা যে সময়কে বাস্তবে বিবেচনা করি, সেই সময়ের পরিমাণ অন্য একটি ক্ষেত্রে ভিন্ন হতে পারে।

বিজ্ঞান মাত্র এক শতাব্দী আগে থিওরী অব রিলেটিভিটি আবিষ্কার করেছে।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিওরী মতে, আমাদের দৃশ্যমান সময়ের পরিমাণ, আমাদের নিজেদের আপেক্ষিক বেগের উপর নির্ভর করে।

সহজ কথায়, সময়ের পরিমাণ বেগের সাথে পরিবর্তনশীল অর্থাৎ সময়ের পরিমাণ ক্ষেত্রভেদে ভিন্ন হয়।

Scientific source -
https://en.wikipedia.org/wiki/Time_dilation

২৮। গবাদিপশুর দুধ উৎপন্ন হওয়ার রহস্য

[১৬] আন-নাহল (মৌমাছি)

وَاِنَّ لَكُمۡ فِى الۡاَنۡعَامِ لَعِبۡرَةً ؕ نُسۡقِيۡكُمۡ مِّمَّا فِىۡ بُطُوۡنِهٖ مِنۡۢ بَيۡنِ فَرۡثٍ
وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيۡنَ ٦٦

অর্থ: আর নিশ্চয় চতুষ্পদ জন্তুতে রয়েছে তোমাদের জন্য শিক্ষা। তোমাদেরকে পান করাই ওদের পেটের গোবর আর রক্তের থেকে উৎপন্ন বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যকর।

And indeed, for you, is a lesson in the cattle. We give you to drink from what is in their bellies, between bowel (digested food) and blood; pure milk; palatable to the drinkers.

(সূরা আন-নাহল: আয়াত ৬৬)

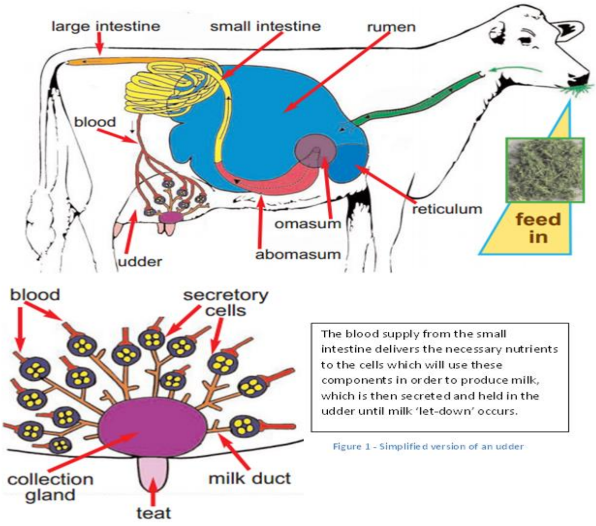

Figure 1 - Simplified version of an udder

প্রাণিবিজ্ঞানের গবেষণা থেকে জানা যায়, গরুর অন্ত্রে থাকা গোবর থেকে পুষ্টিকর উপাদানগুলো রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে দুধ উৎপাদনকারী লালাগ্রন্থিতে আসে। পরে লালাগ্রন্থিতে থাকা কোষগুলো, রক্ত এবং রক্তের সেই পুষ্টিকর উপাদানগুলোকে বিশেষ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে দুধ উৎপন্ন করে।

Scientific source -

http://vetstudentresearch.blogspot.com/2015/06/milk-production-in-dairy-cows_3.html

২৯। পানি চক্র

[২৩] আল-মুমিনুন (মুমিনগণ)

وَاَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَاَسۡكَنّٰهُ فِى الۡاَرۡضِ ‌ۖ وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍۢ بِهٖ لَقٰدِرُوۡنَ‌ ١٨

অর্থ: আর আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করে থাকি। অতঃপর আমি তা যমীনে সংরক্ষণ করি। আর অবশ্যই আমি তা অপসারণ করতেও সক্ষম।

And We send down water from the sky in (due) measure, then We cause it to settle in the earth. And indeed, We are Able to take it away.

(সূরা আল-মুমিনুন: আয়াত ১৮)

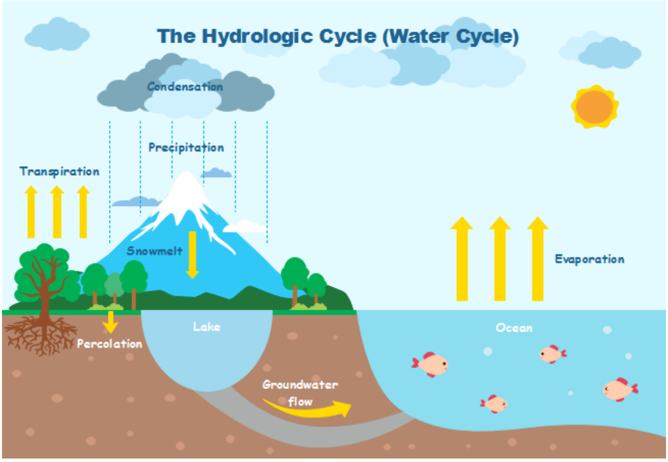

বর্তমানে বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে, বৃষ্টির পানি ঠান্ডা পর্বতের গভীর গহ্বরে ঘনীভূত হয়ে সেখানে এক প্রকার ভূগর্ভস্থ হ্রদ সৃষ্টি করে, যা ঝরনা হয়ে প্রবাহিত হয়।

Scientific source - https://www.noaa.gov/education/resource-collections/freshwater/water-cycle

وَاللّٰهُ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ.

অর্থ: আর আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালা সঞ্চার করে, অতঃপর আমি তা নির্জীব ভূখন্ডের দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর তা দিয়ে আমি যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করি; এভাবেই হবে পুনরুত্থান। (সূরা ফাতির, আয়াত: ৯)

৩০। পর্বতের গঠন ও কাজ

[৭৮] আন-নাবা (মহাসংবাদ)

ٱلَمۡ نَجۡعَلِ ٱلۡأَرۡضَ مِهَٰدٗا ٦

অর্থ: আমি কি বানাইনি যমীনকে শয্যা?

Have We not made the earth a resting place?

(সূরা আন-নাবা: আয়াত ৬)

وَٱلۡجِبَالَ أَوۡتَادٗا ٧

অর্থ: আর পর্বতমালাকে পেরেকের মতো?

And the mountains as pegs?

(সূরা আন-নাবা: আয়াত ৭)

আয়াতটি বলছে, পর্বতমালাকে পেরেকের মতো করে তৈরি করা হয়েছে।

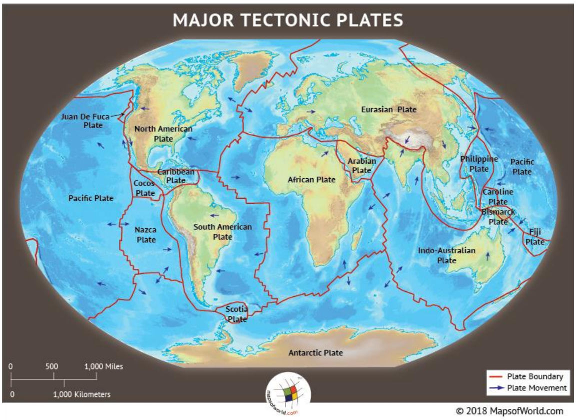

ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান বলে, আমরা যে বিস্তীর্ণ ভূমির উপর বিচরণ করি, তা মূলত অনেকগুলো পাতলা পাত বা প্লেটসমূহের স্তর। এদেরকে বলা হয় ভূত্বকীয় পাত বা টেকটোনিক প্লেট। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে এই প্লেটগুলো সদা নড়াচড়া করে থাকে।

আধুনিক বিজ্ঞান ব্যাখ্যা দিয়েছে, দুই বা ততোধিক প্লেট যখন একটির উপর আরেকটি চলমান হয়, অথবা ধাক্কা খায়, তখন এদের মিলনস্থলে পাহাড়ের সৃষ্টি হয়।

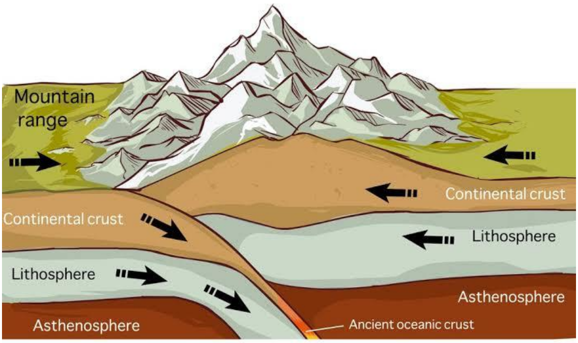

Scientific source -
https://education.nationalgeographic.org/resource/plate-tectonics

এই পাহাড় ভূমির যতদূর উপরে উঠে, পরের অংশে অনেকগুন পরিমাণে ভূমির নিচে দেবে যায়। অনেকটা ভাজ সৃষ্টির মত। এর ফলে টেকটোনিক প্লেটগুলোর নড়াচড়া কমে যায় এবং ভূমিকম্পের ঝুঁকি কম থাকে। অর্থাৎ এই প্লেটগুলোর সংযোগস্থলে পাহাড় বা পর্বত অনেকটা পেরেকের মতো কাজ করে।

Scientific source -
https://eartheclipse.com/science/geography/do-mountains-cause-or-prevent-earthquakes.html

ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান অনুসারে, পাহাড় বা পর্বতের গঠন অনেকটা পেরেকের মতোই। যেমন, এভারেস্ট পর্বতের শীর্ষবিন্দু ভূমি হতে প্রায় ৯ মাইল

উর্ধ্বে এবং এর ভিত্তিমূল মাটির নিচে ১২৫ কি.মি. পর্যন্ত বিস্তৃত, যা দেখতে দৈত্যাকার এক পেরেকের মতো।

Scientific source -

Science books have stated this fact as follows:

- "Mountains have deep roots under the surface of the ground". (Earth, Press and Siever, p.413.

- https://www.scribd.com/doc/103283718/Press-and-Siever-Earth-P.413-onwards

- "The mountains, like pegs, have deep roots embedded in the ground". (Anatomy of the Earth, Cailleux, p.220.)

- "The mountains are peg-like in shape, due to their deep roots". (Earth Science, Tarbuck and Lutgens, p.158.)

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ.

অর্থ: অতএব, (হে জ্বিন ও মানুষ) তোমরা তোমাদের রবের কোন অনুগ্রহ করবে অস্বীকার? (সূরা আর-রাহ্মান, আয়াত: ৫৫)

৩১। আকাশ নিরাপত্তার ছাদ

[২১] আল-আম্বিয়া (নবীগণ)

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا ۚ وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ٣٢

অর্থ: আর আমি আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা তার নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

And We (have) made the sky a protected roof. But they turn away from its Signs.

(সূরা আল-আম্বিয়া: আয়াত ৩২)

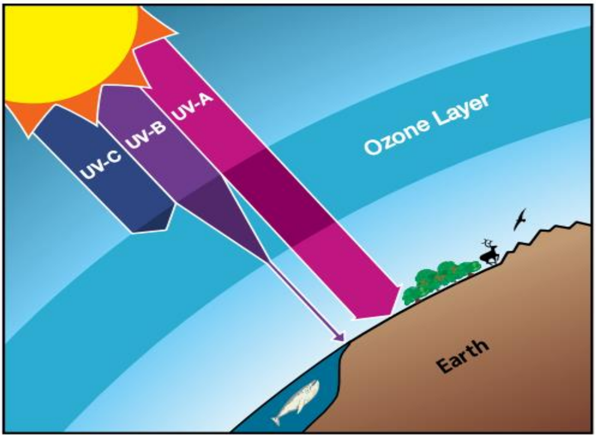

বর্তমানে মহাকাশ বিজ্ঞান বলে, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের উপরিভাগ আমাদেরকে কোটি উল্কাপাত থেকে রক্ষা করছে।

বায়ুমন্ডলের একেবারে উপরিভাগে ভ্যান-এলেন-বেল্ট নামের একটি অতিরিক্ত স্তর রয়েছে। এই স্তরটি প্রায় ৬০,০০০ কি.মি. উপরে অবস্থিত। এই স্তর শুধুমাত্র সেই সমস্ত রশ্মিই পৃথিবীতে আসতে দেয় যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। যেমন রেডিও ওয়েভ বা (UV)আল্ট্রা ভায়োলেট রে। একইসাথে এই স্তর সূর্যের ক্ষতিকর কসমিক রে-কে পৃথিবীতে আসতে বাধা দেয়। অতিরিক্ত কম ঘনত্বের কারণে, এই স্তরটি আয়োনিত বা প্লাজমা অবস্থায় আছে। এই প্লাজমা মেঘ প্রায় ১০০ বিলিয়ন আণবিক বোমার (হিরোসিমায় মাত্র একটি ফেলা হয়েছিল) সমান পরিমাণ শক্তিবিশিষ্ট ক্ষতিকর রশ্মিকে আটকিয়ে দিতে পারে।

আবার এই স্তর পৃথিবীকে মহাকাশের অতিরিক্ত ঠান্ডা থেকে রক্ষা করে, যা মাইনাস ২৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

Scientific source -

https://en.wikipedia.org/wiki/Ozone_layer ,

https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Allen_radiation_belt

تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى.

অর্থ: এটা তাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ, যিনি সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশসমূহ। (সূরা ত্ব-হা, আয়াত: ৪)

وَكَاَيِّنۡ مِّنۡ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ يَمُرُّوۡنَ عَلَيۡهَا وَهُمۡ عَنۡهَا مُعۡرِضُوۡنَ.

অর্থ: কতই না নিদর্শন রয়েছে আসমানসমূহ ও যমিনে যেগুলোর ওপর দিয়ে তারা অতিক্রম করে; অথচ তারা সেগুলো থেকে বিমুখ। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৫)

৩২। ভূমির সাতটি স্তর

[৬৫] আত-ত্বলাক (ত্বলাক)

اَللّٰهُ الَّذِىۡ خَلَقَ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الۡاَرۡضِ مِثۡلَهُنَّ ؕ يَتَنَزَّلُ الۡاَمۡرُ بَيۡنَهُنَّ لِتَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيۡرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدۡ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عِلۡمًا ١٢

অর্থ: তিনি আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান এবং অনুরূপ যমীন; এগুলোর মাঝে তাঁর নির্দেশ অবতীর্ণ হয় যেন তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে।

It is Allah Who created seven heavens, and of the earth (the) like of them. His Command descends between them (heavens and earth), that you may know that Allah has power over everything. And that Allah encompasses all things in (His) knowledge.

(সূরা আত-ত্বলাক: আয়াত ১২)

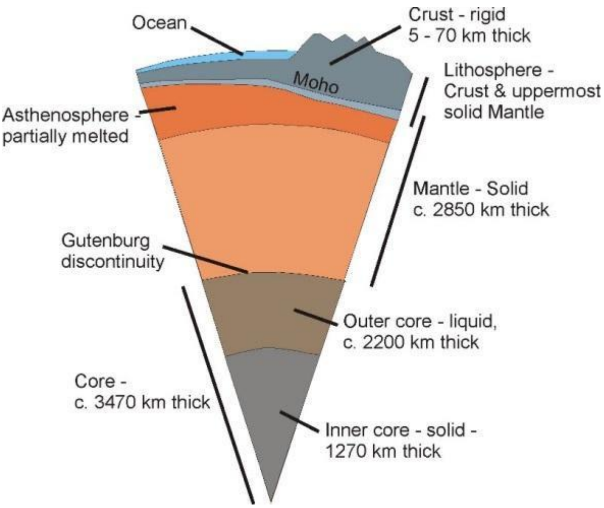

উল্লেখ্য আয়াত অনুসারে, শুধু আসমানই নয়, বরং পৃথিবীরও সাতটি স্তর রয়েছে।

ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে এর উপরিভাগ পর্যন্ত সাতটি স্তর রয়েছে।

গঠনগত এবং কার্যগত দিক থেকে একটির সাথে আরেকটির কোনো মিল নেই।

এগুলো হল:

1. Oceanic (Crust), 2. Continental (Crust), 3. Lithosphere (Upper mantle), 4. Asthenosphere (Upper mantle), 5. Earth's Mantle (Lower mantle), 6. Outer core, 7. Inner core.

Scientific source -

https://www.forbes.com/sites/trevornace/2016/01/16/layers-of-the-earth-lies-beneath-earths-crust/?sh=54bad79441d7

৩৩। গাছের লিঙ্গ

[৩৬] ইয়াসীন (ইয়াসীন)

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡ خَلَقَ الۡاَزۡوَاجَ کُلَّهَا مِمَّا تُنۡۢبِتُ الۡاَرۡضُ وَمِنۡ اَنۡفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا یَعۡلَمُوۡنَ ٣٦

অর্থ: পবিত্র ও মহান সে সত্তা, যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়, যমীন যা উৎপন্ন করে তার মধ্যের সবকিছু, মানুষের নিজেদের মধ্যেও আর সে সব কিছু থেকেও যা তারা জানে না।

Glory be (to) the One, Who created all (species) in pairs- what the earth grows and of their own (human) kind (male and female), and of what they (do) not know.

(সূরা ইয়াসীন: আয়াত ৩৬)

উল্লেখ্য আয়াত অনুসারে, যমীন যা উৎপন্ন করে তার মধ্যের সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট। অর্থাৎ গাছপালারও জোড়া বিদ্যমান, তাদেরও পুরুষ ও স্ত্রীলিঙ্গ রয়েছে।

উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, গাছপালারও লিঙ্গ থাকে- পুরুষ গাছ এবং স্ত্রী গাছ। এমনকি উভলিঙ্গ গাছে পুরুষ ও স্ত্রী অংশ আলাদা অবস্থায় থাকে। সর্বপ্রথম যে বিজ্ঞানী উদ্ভিদের মধ্যে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ থাকার কথা উল্লেখ করেন, তিনি হলেন সুইডিশ বিজ্ঞানী কার্ল লিনিয়াস (Carl Linnaeus)। খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি এ মত প্রকাশ করেন।

Scientific source -

https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_reproductive_morphology#Variations
https://www.livescience.com/32261-do-plants-have-sex.html

৩৪। গর্ভদানকারী বাতাস

সুরা আল-হিজ্‌রের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

[১৫] আল-হিজ্‌র (পাথুরে পাহাড়)

وَاَرۡسَلۡنَا الرِّیٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسۡقَیۡنٰکُمُوۡهُ ۚ وَمَاۤ اَنۡتُمۡ لَهٗ بِخٰزِنِیۡنَ ٢٢

অর্থঃ আর আমি গর্ভদানকারী বাতাস প্রেরণ করি, অতঃপর আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করাই। তবে তোমরা তার সংরক্ষণকারী নও।

And We Send the fertilizing winds, then We Send down water (rain) from the sky, and We give it to you to drink. And it is not you who are the owners of its stores.

(সূরা আল-হিজ্‌রঃ আয়াত ২২)

বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, গাছপালারও লিঙ্গ থাকে- পুরুষ গাছ এবং স্ত্রী গাছ। এদের মধ্যে আছে রেণু।

বাতাসের মাধ্যমে পুরুষ রেণু উড়ে উড়ে স্ত্রী রেণুর গায়ে গিয়ে বসে, এভাবে তাদের মিলন ঘটে এবং ফল উৎপাদিত হয়। এটাকে ফুলের পরাগায়ণ বা Pollination বলে।

Scientific source - https://en.wikipedia.org/wiki/Pollination

اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ لَاٰيٰتٍ لِّلۡمُؤۡمِنِيۡنَ.

অর্থঃ নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে বহু নিদর্শন মু'মিনদের (বিশ্বাসীদের) জন্য। (সূরা আল-জাসিয়া, আয়াতঃ ৩)

৩৫। গাছের নিঃশ্বাস (ফটোসিনথেসিস)

[৮১] আত-তাকভীর (অন্ধকারাচ্ছন্ন)

وَالصُّبۡحِ اِذَا تَنَفَّسَ ١٨

অর্থ: শপথ সকালের যখন তারা (দিনের আলোয়) নিঃশ্বাস নেয়।

And by the dawn when it breathes.

(সূরা আত-তাকভীর: আয়াত ১৮)

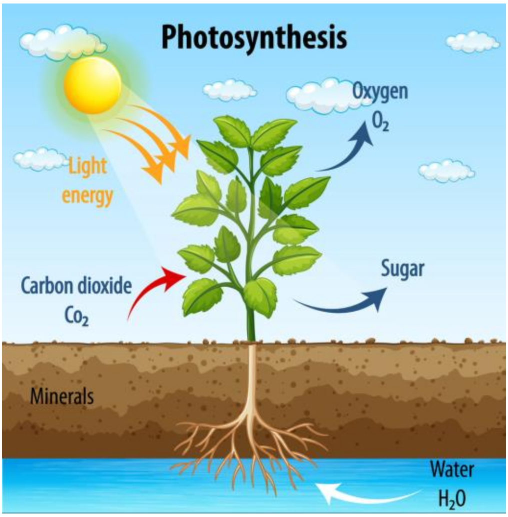

ফটোসিনথেসিস আবিষ্কার করার পূর্বে, এই আয়াতটি বেশ রহস্য তৈরি করে রেখেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে Jan Baptist van Helmont ফটোসিনথেসিস বা সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যাপারে সর্বপ্রথম ধারণা দেন। এ পদ্ধতি মানুষকে জানালো এমন এক প্রক্রিয়ার কথা যে প্রক্রিয়ায় গাছ কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে শোষণ করার মাধ্যমে নিজের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে। একই সাথে অক্সিজেনকে পরিবেশে মুক্ত করে। ১৭৭৯ সালে Jan Ingenhousz প্রমান করেন, এই প্রক্রিয়াটি কেবল দিনের বেলাতেই ঘটে, যেহেতু আলো এখানে অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

অর্থাৎ গাছ কেবল দিনের বেলাতেই নিঃশ্বাস ক্রিয়া চালায়।

Scientific source -
https://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthesis

৩৬। ইরাম শহরের রহস্য

[৮৯] আল-ফাজ্‌র (ভোরবেলা)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٦

অর্থ: তুমি কি দেখনি তোমার রব কিরূপ আচরণ করেছেন আদ জাতির সাথে?

Did you not see how your Lord dealt with Aad?

(সূরা আল-ফাজ্‌র: আয়াত ৬)

إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ٧

অর্থ: ইরাম গোত্রের সাথে, যারা ছিল সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী?

Iram, possessors of lofty pillars,

(সূরা আল-ফাজ্‌র: আয়াত ৭)

সূরা ফাজরে মূলত আদ জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। আদ জাতির আলোচনার মধ্যে হঠাৎ করে 'ইরাম' নামে একটি শব্দ চলে এলো; যা কেউই জানত না এটা আসলে কী। কেউ কেউ বলল, এটা আদ জাতির কোনো বীর পালোয়ানের নাম; কেউ কেউ বলল, এই ইরাম হতে পারে আদ জাতির শারীরিক কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'ইরাম' আসলে কি সেটার সুস্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা তখন কেউই দিতে পারেনি। এমনকি, গোটা পৃথিবীর কোন ইতিহাসে 'ইরাম' নিয়ে কিছুই উল্লেখ ছিল না।

কিন্তু ১৯৭৩ সালে, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি সিরিয়ায় মাটির নিচে একটি শহরের (City of Ebla) সন্ধান পায়। এই শহরটি ছিল আদ জাতির শহর। এই শহরে আবিষ্কার হয় তখনকার একটি লাইব্রেরী। এই লাইব্রেরীতে একটি তালিকা (Ebla tablets) পাওয়া যায়। এই তালিকায় তারা যে সকল শহরের সাথে বাণিজ্য করতো, সেসব শহরের নাম উল্লেখ ছিল। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য এই যে, সেই তালিকায় 'ইরাম' নামের একটি শহরের নামও পাওয়া যায়, যেটা আদ জাতিদেরই একটি শহর ছিল।

Scientific source -

https://www.britannica.com/place/Ebla
https://en.wikipedia.org/wiki/Ebla
https://en.wikipedia.org/wiki/Ebla_tablets
https://en.wikipedia.org/wiki/Iram_of_the_Pillars#Archaeological_research

(Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Ebla)

Photograph : CITY OF EBLA

(Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Ebla_tablets)

Photograph : EBLA TABLETS

৩৭। মহাশূন্য বিজয়

[৫৫] আর-রাহমান (পরম করুণাময়)

يٰمَعۡشَرَ الۡجِنِّ وَالۡاِنۡسِ اِنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ اَنۡ تَنۡفُذُوۡا مِنۡ اَقۡطَارِ السَّمٰوٰتِ
وَالۡاَرۡضِ فَانۡفُذُوۡا ؕ لَا تَنۡفُذُوۡنَ اِلَّا بِسُلۡطٰنٍ ۚ ٣٣

অর্থঃ হে জিন ও মানবজাতি, যদি তোমরা আসমানসমূহ ও যমীনের সীমানা অতিক্রম করতে পারো, তবে অতিক্রম করো। কিন্তু তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না (আল্লাহর) কর্তৃত্ব ছাড়া।

O assembly of jinn and men! If you are able to pass beyond the zones of the heavens and the earth, then pass. But you cannot pass them, except by authority (from Allah).

(সূরা আর-রাহমানঃ আয়াত ৩৩)

আয়াতটিতে বলা হয়েছে, যদি তোমরা আসমানসমূহ ও যমীনের সীমানা অতিক্রম করতে পারো, তবে অতিক্রম করো; এটি একটি শর্তবাচক বাক্য। এই বাক্যে শর্ত দেয়ার জন্য 'যদি' ব্যবহার করা হয়েছে।

আরবিতে 'যদি' শব্দের অর্থে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়- 'লাও' এবং 'ইন'। দুটোর অর্থই 'যদি'। কিন্তু এই দুটোর মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। আরবিতে শর্তবাচক বাক্যে 'লাও' তখনই ব্যবহার করা হয়, যখন সেই শর্ত কোনোভাবেই পূরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু শর্তবাচক বাক্যে 'যদি' শব্দের জন্য যখন 'ইন' ব্যবহার করা হয়, তখন সেই শর্ত পূরণ হতেও পারে।

আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, আয়াতটিতে 'লাও' ব্যবহার না করে 'ইন' ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ কোন একদিন জিন ও মানুষেরা মহাকাশ ভ্রমণে সফল হবে। আজকে কি মানুষ মহাকাশ জয় করেনি? মানুষ কি আজ চাঁদে যায়নি?

৩৮। এলিয়েনের ব্যাপারে কুরআনের ব্যাখ্যা

খ্রীষ্টপূর্ব পাঁচ শতকে থেলাস সর্বপ্রথম ভিনগ্রহের প্রাণীর ধারণা পোষণ করেন। তার ধারণা মতে, "দৃশ্যমান গ্রহ ব্যবস্থা ছাড়াও অন্য কোন জীবন-বহুল জগত রয়েছে"।

বিখ্যাত গণিতবিদ সি. এফ. গাউস সাইবেরীয় জঙ্গলের বৃক্ষরাজিতে একটি অতিকায় ত্রিকোণ তৈরির প্রস্তাব করেছিলেন, যা অন্যান্য গ্রহের অধিবাসীগণকে আকৃষ্ট করতে সমর্থ হবে।

Scientific source -
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gauss%27s_Pythagorean_right_triangle_proposal?searchToken=bs4ehwmsbgfkm9h363rgll552

সি. গ্রস দিনের সূর্যালোকে অতিকায় আয়না স্থাপন করে আলোর প্রতিফলন ঘটিয়ে ভিন গ্রহের প্রাণীদের সাথে যোগাযোগ করতে পরামর্শ প্রদান করেছিলেন। এই তো গেল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দার্শনিকদের প্রচেষ্টা।

আধুনিক যুগে ভিনগ্রহের প্রাণীর সন্ধানে পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন অভিযান।

পৃথিবীর অভিযানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘সেটি’ (SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence), যা ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক ড্রেক। ‘সেটি’ পৃথিবী থেকেই বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে ভিনগ্রহের প্রাণীর সন্ধান করে। বর্তমানে দশটিরও বেশি দেশে ‘সেটি’ এ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

Scientific source -
https://www.seti.org/

ভিনগ্রহের প্রাণীদের সম্পর্কে যৌক্তিক কিংবা বিশ্বাসগত এই বিপুল সমর্থনের কারণেই গবেষকরা খুঁজে চলেছেন প্রাণের অস্তিত্ব। এই সন্ধান-কার্যক্রমে গবেষকরা একদিকে অতীতের ঐতিহাসিক উৎসে খোঁজ করছেন ভিনগ্রহের প্রাণীর অস্তিত্ব আর বিজ্ঞানীরা খোঁজ করছেন পৃথিবীর বাইরের গ্রহ কিংবা উপগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব।

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন-

[৪২] আশ-শূরা (পরামর্শ)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى
جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ۲۹

অর্থ: আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যে সব জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, এবং তিনি যখন ইচ্ছা তখনই এগুলোকে একত্র করতে সক্ষম।

And among His Signs is the creation of the heavens and the earth and whatever creatures He has dispersed in both of them. And He has power to gather them whenever He wills.

(সূরা আশ-শূরা: আয়াত ২৯)

আল-কুরআনের আরো অনেক আয়াতে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, শুধু আমাদের এই পৃথিবীই নয়, অন্য কোন অজানা প্রান্তেও রয়েছে আল্লাহর সৃষ্টি জীব।

৩৯। ফিরআউন (Pharaoh Ramesses II)

প্লেনের সিঁড়ি থেকেই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট, তার মন্ত্রীবর্গ ও ফ্রান্সের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ মাথা নিচু করে ফিরআউনকে স্বাগত জানালেন।

ফিরআউনকে জমকালো প্যারেডের মাধ্যমে রাজকীয়ভাবে বরণ করে ফ্রান্সের প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্রের একটি বিশেষ ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হল, যেখানে ফ্রান্সের বিশিষ্ট সার্জনরা রয়েছেন আর তারা ফেরাউনের মমির ময়নাতদন্ত করে গবেষণা করবেন ও এর গোপনীয়তা উদঘাটন করবেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিত্রা আশির দশকের শেষদিকে ফেরাউনের

মমিকে নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য মিশরের কাছে অনুরোধ জানালে মিশরের সরকার তাতে রাজি হলে, কায়রো থেকে ফেরাউনের লাশ এলো প্যারিসে।

মমি গবেষণার প্রধান সার্জন ছিলেন প্রফেসর ডা. মরিস বুকাইলি। থেরাপিস্ট যারা ছিলেন তারা মমিটাকে পুনর্গঠন (ক্ষত অংশগুলো ঠিক করা) করতে চাচ্ছিলেন, আর ডা. মরিস বুকাইলি দৃষ্টি দিচ্ছিলেন যে, কিভাবে ফিরআউন মারা গেল! ফেরাউনের মমিটি তাকে হতবুদ্ধি করে দিল, কিভাবে এই মমি অন্য মমিদের তুলনায় সুরক্ষিত অবস্থায় থাকল, যেখানে মমিটি গভীর সমুদ্রে দীর্ঘদিন ডুবে ছিল। কারণ আর্দ্র পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে আর প্রতিটি আর্দ্র বস্তুকে দ্রুত ধ্বংস করে থাকে।

ডা. মরিস বুকাইলি তার চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বললেন, এটি একটি নতুন আবিষ্কার। সেই সময় তাকে কেউ ফেরাউনের এই ডুবে যাওয়া মমি সম্পর্কে প্রকাশ্যে আলোচনা না করার পরামর্শ দেন, কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে এর প্রতিবাদ করে বললেন যে, এরকম একটি বিশাল আবিষ্কার যেটা আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সহায়ক, সেটা জানানো যাবেনা!!

কেউ একজন তাকে বলল যে, কুরআনে ফেরাউনের ডুবে যাওয়া ও তার লাশ সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশদ আলোচনা এসেছে। এই ঘটনা শুনে ডা. মরিস বুকাইলি বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করতে লাগলেন, এটা কিভাবে সম্ভব? এই মমি পাওয়া গিয়েছে ১৮৮১ সালে, আর কুরআন নাযিল হয়েছে আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর আগে। আর প্রাচীন আরবেরা তো মমি করার পদ্ধতিই জানতো না, মাত্র কয়েক দশক আগে তা আবিষ্কৃত হয়! ডা. মরিস বুকাইলি ফেরাউনের লাশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে গভীরভাবে ভাবছিলেন যে, মুসলিমদের কুরআনে কিভাবে ফেরাউনের লাশ সংরক্ষণের কথা এসেছে? বাইবেলে ফিরআউন কর্তৃক মুসা (আ.)-এর পিছু নেয়ার কথা বলা আছে কিন্তু ফেরাউনের লাশের পরিণতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা নেই। তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করতে লাগলেন, এটা কিভাবে ধারণা করা যায় যে, এই মমি যার, সে মুসা (আ.)-এর পিছু নিয়েছিল? আর এটা কেমন করে সম্ভব যে, মুহাম্মাদ (সা.) ১৪০০ বছর আগেই এটা সম্পর্কে জানতেন? এবং আরো অনেক কিছু.......। ডা. মরিস বুকাইলি সেই রাতে ঘুমাতে পারলেন না, তিনি

তোরাহ (তাওরাত) আনালেন এবং সেটা পড়লেন। তোরাহতে বলা আছে, পানি আসলো এবং ফেরাউনের সৈন্য এবং তাদের যানবাহনগুলোকে ঢেকে দিল, যারা সমুদ্রে ঢুকলো তাদের কেউই বাঁচতে পারল না। ডা. মরিস বুকাইলি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, তাওরাতে লাশের সংরক্ষণের ব্যাপারে কিছু বলা নেই।

অতঃপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি মুসলিম দেশে যাবেন এবং সেখানে প্রখ্যাত মুসলিম ময়নাতদন্তে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাক্ষাৎকার নিবেন ও আলোচনা করবেন। তিনি তথায় পৌছে ফেরাউনের লাশ ডুবে যাওয়া পরবর্তী সংরক্ষণের যে ফলাফল পেয়েছেন তা নিয়ে আলোচনা করেন, তখন একজন মুসলিম বিশেষজ্ঞ পবিত্র কুরআন খুললেন এবং নিম্নোক্ত আয়াতটি ডা. মরিস বুকাইলিকে শুনালেন, যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

[১০] ইউনুস (নবী ইউনুস)

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ ٩٢

অর্থ: সুতরাং আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো। আর নিশ্চয় অনেক মানুষ আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে গাফেল।

So this day We will save your body that you may be a sign for those who come after you. And indeed, many among the mankind are heedless of Our Signs.

(সূরা ইউনুস: আয়াত ৯২)

ডা. মরিস বুকাইলি ফ্রান্স ফিরে গেলেন এক ভিন্ন অবস্থায়। ফ্রান্সে দশ বছর তিনি আর কোনো চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত থাকেন নি বরং এই সময়ে তিনি আরবী ভাষা শিখেছেন এবং পবিত্র কুরআনে বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছেন।

পরিশেষে তিনি পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন যেখানে বলা আছে,

[৪১] হা-মীম আস-সাজদাহ্‌ (সুস্পষ্ট বিবরণ)

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ٤٢

অর্থঃ বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, না সামনে থেকে, না পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময়, সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

Falsehood cannot approach it from before it or behind it. (It is) sent down by the All-Wise, Worthy of all praise.

(সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ্‌: আয়াত ৪২)

Scientific source -

https://www.arabnews.com/news/443500
https://en.wikipedia.org/wiki/Ramesses_II - Tomb_KV7
https://www.youtube.com/watch?v=KuGx4ORELb4

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا.

অর্থঃ তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহ তালাবদ্ধ? (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াতঃ ২৪)

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ.

অর্থঃ নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার আছে (বোধশক্তিসম্পন্ন) অন্তর অথবা যে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। (সূরা কাফ, আয়াতঃ ৩৭)

কুরআনুল কারীমে বর্ণিত মূসা (আ.) ও ফিরআউনের ঘটনা

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى بِاٰيٰتِنَاۤ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ. وَقَالَ مُوْسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থ: অতঃপর আমি তাদের পরবর্তী সময়ে মূসাকে পাঠিয়েছি নিদর্শনাবলি-সহ ফিরআউন ও তার সভাসদদের নিকট। অতঃপর তারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাঁর সাথে। সুতরাং দেখো, কেমন ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি। আর মূসা বলল, হে ফিরআউন, নিশ্চয়ই আমি রাসূল, বিশ্বজগতের রবের পক্ষ থেকে। (সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ১০৩-১০৪)

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ. قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ. قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ.

অর্থ: ফির‘আউন বলল, ‘বিশ্বজগতের রব আবার কে?’ মূসা বলল, ‘তিনি আসমানসমূহ ও যমীন ও উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।’ ফির‘আউন তার পরিষদবর্গকে বলল, ‘তোমরা কি শুনছো না?’ সে (মূসা) বলল, ‘তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও রব।’ (সূরা আশ্-শু'আরা, আয়াত: ২৩-২৬)

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْۤ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ. قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ

مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ. قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ. قَالَ فَاْتِ بِهٖۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ. فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ. وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ
لِلنّٰظِرِيْنَ. قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗۤ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ. يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ
اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ۝ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ. قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ
حٰشِرِيْنَ. يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ.
وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ
الْغٰلِبِيْنَ. فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ
الْغٰلِبِيْنَ. قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ. قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا
مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ. فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ
الْغٰلِبُوْنَ. فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ. فَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ
سٰجِدِيْنَ. قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ.

অর্থ: ২৭। (ফিরআউন) বলল, 'তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূল নিশ্চয়ই পাগল।' ২৮। (মূসা) বলল, 'তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, যদি তোমরা অনুধাবন করতে।' ২৯। (ফিরআউন) বলল, 'যদি তুমি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারারুদ্ধ করব।' ৩০। (মূসা) বলল, 'যদি আমি তোমার কাছে স্পষ্ট কোনো বিষয় নিয়ে আসি, তবুও?' ৩১। (ফিরআউন) বলল, 'তবে তুমি তা উপস্থিত করো যদি সত্যবাদী হও।' ৩২। অতঃপর সে তার লাঠি নিক্ষেপ করল, তৎক্ষণাৎ তা সুস্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। ৩৩। আর সে তার হাত বের করল, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হলো। ৩৪। (ফিরআউন) তার চারপাশের পরিষদবর্গকে বলল, 'নিশ্চয়ই এ একজন সুদক্ষ জাদুকর।' ৩৫। 'সে তার জাদুবলে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কার করতে চায়। সুতরাং তোমরা কী করার পরামর্শ দাও?' ৩৬। তারা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিত অবকাশ দিন এবং শহরে শহরে

সংগ্রাহকদেরকে পাঠান।' ৩৭। 'যেন তারা আপনার কাছে প্রত্যেক সুদক্ষ জাদুকরকে উপস্থিত করে।' ৩৮। অতঃপর এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদের একত্র করা হলো। ৩৯। এবং জনগণকে বলা হলো, 'তোমরাও সমবেত হ"ছ কি?' ৪০। 'যেন আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়।' ৪১। অতঃপর যখন জাদুকররা আসলো, তারা ফিরআউনকে বলল, 'যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?' ৪২। (ফিরআউন) বলল, 'হ্যাঁ এবং তখন তোমরা অবশ্যই আমার নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' ৪৩। মূসা তাদেরকে বলল, 'নিক্ষেপ করো যা তোমরা নিক্ষেপ করবে।' ৪৪। অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, 'ফিরআউনের ইজ্জতের কসম, অবশ্যই আমরা বিজয়ী হব।' ৪৫। অতঃপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, তৎক্ষণাৎ তা তাদের অলীক কীর্তিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। ৪৬। তখন জাদুকররা সিজদাবনত হয়ে পড়ল। ৪৭। তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম বিশ্বজগতের রবের প্রতি।' ৪৮। 'যিনি মূসা ও হারুনের রব।' (সূরা আশ্-শু'আরা, আয়াত: ২৭-৪৮)

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِيْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُوصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ. قَالُوْا لَا ضَيْرَ ۫ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ. اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَاۤ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ: (ফিরআউন) বলল, 'আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিখিয়েছে। অচিরেই তোমরা (পরিণাম) জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং অবশ্যই তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করব।' তারা বলল, 'কোনো ক্ষতি নেই। নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।' 'আমরা আশা করি যে, আমাদের রব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। কারণ, আমরা ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে অগ্রণী।' (সূরা আশ্-শু'আরা, আয়াত: ৪৯-৫১)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ
اَنْ يُّظْهِرَ فِي الْاَرْضِ الْفَسَادَ ٢٦ وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ
كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ٢٧ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ
فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ
بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ۭ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ
بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ٢٨
يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۡ فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ
جَآءَنَا ۭ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ
الرَّشَادِ ٢٩ وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ
الْاَحْزَابِ ٣٠ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۭ وَمَا
اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ٣١ وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ٣٢
يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ
مِنْ هَادٍ ٣٣ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ
مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۭ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۭ
كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُۨ ٣٤ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ
اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۭ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ كَذٰلِكَ
يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰي كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ٣٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ
صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ٣٦ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى
وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۭ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْۗءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۭ

وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ۳۷ وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ
سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۚ ۳۸ يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ
دَارُ الْقَرَارِ ۳۹ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ
صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا
بِغَيْرِ حِسَابٍ ٤٠ وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ
ؕ ٤١ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ۫ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ
اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ٤٢ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي
الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ
٤٣ فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ
بِالْعِبَادِ ٤٤

২৬। আর ফির‘আউন বলল, ‘আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবকে আহবান করুক; নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি, সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।’ ২৭। মূসা বলল, ‘আমি আমার রব ও তোমাদের রবের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেক অহঙ্কারী হতে, যে বিচার দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না।’ ২৮। আর ফির‘আউন বংশের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রেখেছিল- সে বলল, ‘তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্যই হত্যা করবে যে সে বলে, ‘আমার রব আল্লাহ’ অথচ সে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে? সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপরই বর্তাবে তার মিথ্যা; আর সে যদি সত্যবাদী হয় তবে সে তোমাদের কে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছে তার কিছুতো তোমাদের উপর আপতিত হবেই। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না (সৎ পথে পরিচালিত করেন না), যে সীমালংঘনকারী, মিথ্যাবাদী’। ২৯। ‘হে আমার সম্প্রদায়, আজ রাজত্ব তোমাদেরই; যমীনে তোমরাই কর্তৃত্বশীল; কিন্তু

আমাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে'? ফির'আউন বলল, 'যা আমি সঠিক মনে করি তা-ই আমি তোমাদেরকে দেখাই আর আমি তোমাদেরকে কেবল সঠিক পথই দেখাই'। ৩০। আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল সে আরো বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয় আমি তোমাদের ব্যাপারে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের (শাস্তির) দিনের অনুরূপ (দুর্দিনের) আশঙ্কা করি'; ৩১। 'যেমন ঘটেছিল নূহের কওম, আদ, সামূদ এবং তাদের পরবর্তীদের ক্ষেত্রে। আর আল্লাহ বান্দাদের উপর কোন যুলুম করতে চান না।' ৩২। 'আর হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি ভয়ার্ত আহবান দিনের।' ৩৩। 'যেদিন তোমরা পিছনে ফিরে পালাতে চাইবে, আল্লাহর শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোন পথপ্রদর্শক নেই।' ৩৪। 'আর অবশ্যই পূর্বে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ ইউসুফ এসেছিল, অতঃপর সে যা নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিল, তোমরা তাতে সন্দেহ পোষণ করতে; পরিশেষে যখন তার মৃত্যু হল তখন তোমরা বললে, 'আল্লাহ তার পরে আর কোন রাসূল পাঠাবেন না'। যে সীমালংঘনকারী, সংশয়বাদী, আল্লাহ তাকে এভাবেই পথভ্রষ্ট করেন। ৩৫। যারা নিজেদের কাছে (তাদের দাবীর সমর্থনে) কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত হয়, তাদের এ কাজ আল্লাহ্ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহঙ্কারী স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। ৩৬। ফিরআউন আরও বলল, 'হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি অবলম্বন পাই, ৩৭। আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যেন আমি দেখতে পাই মূসার ইলাহকে; আর নিশ্চয় আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।' এভাবেই ফিরআউনের কাছে শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কাজকে এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ হতে। আর ফির'আউনের ষড়যন্ত্র কেবল ব্যর্থই হয়েছিল। ৩৮। আর যে ঈমান এনেছিল সে আরও বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করব।' ৩৯। 'হে আমার সম্প্রদায়! দুনিয়ার এ

জীবন কেবল অস্থায়ী ভোগের বস্তু, আর নিশ্চয় আখিরাত, তা হল স্থায়ী আবাস।' ৪০। 'কেউ মন্দ কর্ম করলে সে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে। আর যে পুরুষ কিংবা নারী মুমিন হয়ে সৎকর্ম করবে, তারাই প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেওয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ।' ৪১। 'আর হে আমার সম্প্রদায়! আমার কি হলো যে, আমি তোমাদেরকে ডাকছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছো আগুনের দিকে!' ৪২। 'তোমরা আমাকে ডাকছো যেন আমি আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে শরীক করি এমন কিছুকে, যে ব্যাপারে আমার কোন জ্ঞান নেই; আর আমি তোমাদেরকে আহবান করছি মহাপরাক্রমশালী ও পরমক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে।' ৪৩। 'এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, যার দিকে তোমরা আমাকে ডাকছো, সে দুনিয়া বা আখিরাতে কারো ডাকের যোগ্য নয়। আর আমাদের প্রত্যাবর্তন হবে আল্লাহর দিকে এবং নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা হবে আগুনের অধিবাসী।' ৪৪। 'আমি তোমাদেরকে যা বলছি, অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে। আর আমার বিষয়টি আমি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি; নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা।' (সূরা আল-মু'মিন, আয়াত: ২৬-৪৪)

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ.

অর্থ: কিন্তু কেউ ঈমান আনল না মূসার প্রতি; তার সম্প্রদায়ের কিছু লোক ব্যতীত; এ ভয়ে যে, ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গ তাদেরকে নির্যাতন করবে। আর নিশ্চয় ফিরআউন ছিল পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী এবং নিশ্চয় সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৮৩)

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ. فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ. اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ. وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ. وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ. فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ. وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ.

كَذٰلِكَ ۭ وَاَوۡرَثۡنٰهَا بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ. فَاَتۡبَعُوۡهُمۡ مُّشۡرِقِیۡنَ. فَلَمَّا تَرَآءَ الۡجَمۡعٰنِ
قَالَ اَصۡحٰبُ مُوۡسٰۤی اِنَّا لَمُدۡرَكُوۡنَ. قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِیَ رَبِّیۡ سَیَهۡدِیۡنِ.
فَاَوۡحَیۡنَاۤ اِلٰی مُوۡسٰۤی اَنِ اضۡرِبۡ بِّعَصَاكَ الۡبَحۡرَ ؕ فَانۡفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرۡقٍ
كَالطَّوۡدِ الۡعَظِیۡمِ. وَاَزۡلَفۡنَا ثَمَّ الۡاٰخَرِیۡنَ. وَاَنۡجَیۡنَا مُوۡسٰی وَمَنۡ مَّعَهٗۤ اَجۡمَعِیۡنَ.
ثُمَّ اَغۡرَقۡنَا الۡاٰخَرِیۡنَ.

অর্থ: আমি মূসার প্রতি এ মর্মে ওহী পাঠিয়েছিলাম যে, ‘আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিকালে বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তোমাদের পিছু নেওয়া হবে।’ অতঃপর ফিরআউন শহরে শহরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাল। (এই বলে যে) ‘নিশ্চয়ই এরা (বনি ইসরাঈল) ক্ষুদ্র একটি দল।’ ‘আর নিশ্চয়ই তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে।’ ‘আর আমরা সবাই তো সদা সতর্ক।’ অতঃপর আমি তাদেরকে বহিস্কার করলাম তাদের উদ্যানরাজি ও ঝর্ণাধারাসমূহ থেকে। এবং ধনভাণ্ডারসমূহ ও মনোরম স্থানসমূহ থেকে। এরূপই ঘটেছিল এবং আমি বনি ইসরাঈলকে করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী। অতঃপর তারা সূর্যোদয়কালে তাদের পিছু নিল। অতঃপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, ‘আমরা তো ধরা পড়ে যাচ্ছি।’ মূসা বলল, ‘কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার রব। শীঘ্রই তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।’ অতঃপর আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম, ‘তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করো।’ ফলে তা বিভক্ত হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। আর আমি অপর দলটিকে সেখানে উপনীত করলাম। এবং আমি উদ্ধার করলাম মূসা ও তাঁর সঙ্গী সকলকে। অতঃপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে। (সূরা আশ্-শু'আরা, আয়াত: ৫২-৬৬)

وَجٰوَزۡنَا بِبَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ الۡبَحۡرَ فَاَتۡبَعَهُمۡ فِرۡعَوۡنُ وَجُنُوۡدُهٗ بَغۡیًا وَّعَدۡوًا ؕ
حَتّٰۤی اِذَاۤ اَدۡرَكَهُ الۡغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنۡتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیۡۤ اٰمَنَتۡ بِهٖ بَنُوۡۤا
اِسۡرَآءِیۡلَ وَاَنَا مِنَ الۡمُسۡلِمِیۡنَ. آٰلۡـٰٔنَ وَقَدۡ عَصَیۡتَ قَبۡلُ وَكُنۡتَ مِنَ

الْمُفْسِدِيْنَ. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ.

অর্থ: আর আমি বনি ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিয়েছি। অতঃপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফিরআউন ও তার সেনাবাহিনী; সীমালঙ্ঘন করে ও শত্রুতাবশত। অবশেষে যখন সে ডুবে যাবার উপক্রম হলো, তখন বলল, 'আমি ঈমান এনেছি; নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যাঁর ওপর ঈমান এনেছে বনি ইসরাঈল। আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' 'এখন (ঈমান আনছ)! অথচ ইতঃপূর্বে তুমি অবাধ্যতা করেছ; আর তুমি ছিলে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত। 'অতএব, আজ আমি তোমার দেহ রক্ষা করব যাতে তুমি হও তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন। আর নিশ্চয় অনেক মানুষ আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে উদাসীন।' (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৯০-৯২)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَفِىْ مُوْسٰى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ. فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ. فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ.

অর্থ: আর নিদর্শন রয়েছে মূসার বৃত্তান্তে; যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফির'আউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর সে তার সভাসদসহ মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'এ ব্যক্তি হয় এক যাদুকর, না হয় এক উম্মাদ'। ফলে আমি তাকে ও তার সৈন্য-সামন্তকে পাকড়াও করলাম। অতঃপর তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। আর সে ছিল তিরস্কারযোগ্য। (সূরা আয্-যারিয়াত, আয়াত: ৩৮-৪০)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ج فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ط فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

অর্থ: আর অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে 'যে, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগুতকে বর্জন করো।' অতঃপর তাদের মধ্য থেকে কাউকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন এবং তাদের মধ্য থেকে কারো ওপর বিপথগামীতা অবধারিত হয়েছে; সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, মিথ্যারোপকারীদের কী পরিণতি হয়েছে। (সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬)

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۟

অর্থ: তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেন, তোমাদেরকে বের করে আনার জন্য অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম করুণাময়, অতিশয় দয়ালু। (সূরা আল-হাদীদ, আয়াত: ৯)

হিন্দু ধর্মগ্রন্থের আলোকে দেবদেবী পূজা

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে মূর্তিপূজা

বেদ-এ বলা হয়েছে, "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ। হিরণ্যগর্ভ ইত্যেষ মা মা হিংসীদিত্যেষা যস্মান্ন জাত ইত্যেষঃ॥"

न तस्यं प्रतिमाऽअस्ति यस्यं नामं महद्यशः । हिरण्यगर्भऽइत्येष मा मा हिᳬसीदित्येषा यस्मान्न जातऽइत्येषः॥३॥

Na tasya pratimā'asti yasya nāma mahadyaśaḥ. Hiraṇyagarbha'ityeṣa mā mā hiṁsīdityeṣā yasmānna jāta'ityeṣaḥ.

"There is none and nothing like Him, no picture, no icon, no simile, no metaphor. Great is His Name, mighty His glory."

(YAJURVEDA-English translation by Dr. Tulsi Ram M.A., Ph.D. London, U.K.)

"স্রষ্টার কোনো প্রতিমূর্তি বা সাকার রূপ নেই। স্রষ্টার তুলনা দেয়ার কোনো বস্তু নেই। তাঁর মহৎ যশ আছে। কেউ তাকে হিংসা করে না।" (শুক্ল যজুর্বেদ-সংহিতা, ৩২/৩, পৃষ্ঠা ২২৪, শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা- ৭০০০০৭)

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহসংভূতিমুপাসতে। ততো ভুয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাঃ রতাঃ।"

अन्धन्तमः प्र विशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । ततो भूयऽइव ते तमो यऽउ सम्भूत्याᳬ रताः॥९॥

Andhaṁ tamaḥ pra viśanti ye'sambhūtim-upāsate. Tato bhūya iva te tamo ya'u sambhūtyāṁ ratāḥ

"Down into the darkest dark do they fall who worship only the primordial prakriti. Still deeper and darker do they fall who worship only the existential forms and are lost therein."

(YAJURVEDA-English translation by Dr. Tulsi Ram M.A., Ph.D. London, U.K.)

"অন্ধকারে প্রবেশ করবে তারা, যারা প্রকৃতির পূজা করে (প্রকৃতি: আগুন, পানি, বাতাস)। আর যারা স্বাম্ভুতি পূজা করে, তারা আরো বেশী অন্ধকারে প্রবেশ করবে (স্বাম্ভুতি: টেবিল, পাখা, মানুষের হাতে গড়া জিনিস)।" (যজুর্বেদ ৪০/৯, শুক্ল যজুর্বেদ-সংহিতা ৪০/৯, পৃষ্ঠা ২৫৬, শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী সম্পাদিত, হরফ প্রকাশনী)

উপনিষদে এসেছে, "নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ। ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ"

नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत्।
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥ १९ ॥

"No one has grasped him above, or across, or in the middle. There is no image of him whose name is Great Glory."

(THE UPANISHADS translated by F. Max Muller)

"পরমাত্মা (প্রকৃত স্রষ্টা) অসীম, তাঁর কোনো প্রতিমূর্তি নেই, সে জন্যই তাঁকে কেউ উর্ধ্বে, পার্শ্বে বা মধ্যে কোথাও ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে না।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৪.১৯, পৃষ্ঠা ৩৮৭; অতুল চন্দ্র সেন, হরফ প্রকাশনী, অতুল চন্দ্র গুপ্ত, রিডার্স ওয়েজ, ঢাকা- ১১০০)

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে, "কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া"

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥20॥

VII

20

कामैस् तैस्तैर् हृतज्ञानाः
kāmāis tāistāir hṛtajñānāḥ
by desires, be these and those, bereft of knowledge

प्रपद्यन्ते ऽन्यदेवताः ।
prapadyante 'nyadevatāḥ
they resort to other gods

तंतं नियमम् आस्थाय
taṁtaṁ niyamam āsthāya
this or that religious obligation having recourse to

प्रकृत्या नियताः स्वया ॥
prakṛtyā niyatāḥ svayā
by nature constrained by own.

kāmāis (m. inst. pl.), by desires, by lusts.
tāis tāis (m. inst. pl.), by these and those.
hṛta (p. pass. participle √*hṛ*), bereft, stolen away, taken away.
jñānās (m. nom. pl.), knowledge, wisdom.
(*hṛtajñānās*, m. nom. pl. BV cpd., whose knowledge has been carried away.)
prapadyante (3rd pl. pr. indic. mid. *pra* √*pad*), they resort to, they take refuge with, they worship.
anya-, other.
devatās (m. nom. pl.), gods, godheads.
taṁ taṁ (m. acc. sg.), this or that.
niyamam (m. acc. sg.), religious obligation, discipline, worship.
āsthāya (gerund *ā* √*sthā*), having recourse to, following, practicing.
prakṛtyā (f. inst. sg.), by material nature.
niyatās (m. nom. pl.), constrained, held down, controlled, subdued.
svayā (f. inst. sg.), by own.

Men whose knowledge has been carried away
By these and those desires, resort to other gods,
Having recourse to this and that religious rite,
Constrained by their own material natures.

The Bhagavad Gītā (Twenty-fifth Edition)
Translated by
WINTHROP SARGEANT
Published by State University of New York Press, Albany

“স্বভাবের দ্বারা তাড়িত হয়ে যারা জ্ঞান থেকে ঝরে পড়ে এবং প্রচলিত রীতিনীতির অনুকরণ করে, তারাই এক স্রষ্টার পরিবর্তে একাধিক স্রষ্টার আরাধনা করে” (ভগবত গীতা- ৭ নং অধ্যায়ের ২০ নং অনুচ্ছেদ)

“যাদের বিবেক বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে, তারাই মূর্তিপূজা করে।” (গীতা ৭/২০, পৃষ্ঠা ৫৬১; সাধন-সঞ্জীবনী, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২৭৩০০৫ ইন্ডিয়া; গীতা ২৮১ পৃষ্ঠা; সুভদ্রা দে ঘোষ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩, এপ্রিল ২০১৫; গীতা ১৫৯ পৃষ্ঠা: মনোজ বুক ষ্টল ১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম সংস্করণ ১৪২৩)

উপরোক্ত শ্লোকগুলোতে লক্ষণীয়, সৃষ্টিকর্তার কোন প্রতিমা, প্রতিকৃতি বা মূর্তি নেই। নিজের সত্তার ক্ষেত্রে, যাবতীয় সকল গুণের ক্ষেত্রে এবং ক্ষমতা ও অধিকারের ক্ষেত্রে তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

প্রকৃত স্রষ্টা ও দেবদেবীদের গুণাবলি

নিম্নোক্ত শ্লোকটি লক্ষণীয়-

"যস্যান্তং নাদিমধ্য ন চ করচরণং নাস্তি কায়ো নিনাদং
নাকারং নাদিরূপং ন ভয়মরণং নাস্তি জন্মৈব যস্য।
যোগীন্দ্রধ্যানগম্যং সকলদেলগতং সর্বসংকল্পহীনং
তত্রৈকাপি নিরঞ্জনোহমরবরঃ পাতু মাং শূন্যমূর্তি॥"

"যার আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই, হস্ত নেই, পদ নেই, দেহ নেই, শব্দ নেই, আকার নেই, রূপ নেই, ভয় নেই, মরণ নেই, জন্ম নেই, যোগীন্দ্রের ধ্যানে উপলব্ধ, সর্বব্যাপী, সকলসংকল্পহীন, সেই এক অমর শ্রেষ্ঠ শুন্যমূর্তি নিরঞ্জন আমাকে রক্ষা করুন।" (ধর্মপূজা বিধান, পৃ. ৭০, রামাই পণ্ডিত, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২৩)

পক্ষান্তরে, সকল দেবতাদের আদি আছে, হস্ত আছে, পদ আছে, দেহ আছে, শব্দ আছে, আকার আছে, রূপ আছে, ভয় আছে, জন্ম আছে।

বেদ থেকে নিম্নোক্ত শ্লোকটি লক্ষণীয়-

"তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ॥ সর্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি। নৈনমূর্ধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরি জগ্রভৎ॥ ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ। হিরণ্যগর্ভ ইত্যেষ মা মা হিংসীদিত্যেষা যস্মান্ন জাত ইত্যেষঃ॥ এষো হ দেবঃ প্রদিশোহনু সর্বাঃ পূর্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণ প্রত্যঙ্গ জনাস্তিষ্ঠতি সর্বতোমুখঃ॥"

"(১) আদিত্য, বায়ু, চন্দ্র, শুক্ল, জল, প্রজাপতি সমস্ত কিছুরই স্রষ্টা তিনি। (২) উপরে, মধ্যে ও নিচে কেউ তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। (৩) তাঁর তুলনা দেয়ার কোনো বস্তু নেই। (৪) সকল মহৎগুণের অধিকারী তিনি। (৫) কেউ তাকে হিংসা করে না। (৬) তিনি সকল দিক এবং

সবকিছু পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। (৭) তিনি প্রথমে ছিলেন, মধ্যেও ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। (৮) তাঁর পূর্বে কিছুই সৃষ্টি হয়নি এবং সবকিছুর **একমাত্র স্রষ্টা** তিনি।" (শুক্লযজুর্বেদ-সংহিতা ৩২/১-৪, পৃষ্ঠাঃ ২২৪। বেদ: শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী অনূদিত, হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬, ১২৭ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭, ৪র্থ প্রকাশ, নভেম্বর ২০০০)

(মন্ত্রের অনুবাদটি পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে ক্রমানুসারে সাজানো হল।)

মন্ত্রে লক্ষণীয়-

'সমস্ত কিছুরই স্রষ্টা তিনি।' দেবতারা কেউই সবকিছুর স্রষ্টা নন।

'কেউ তাকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন না।' দেবতাদেরকে অনেকেই দেখেছে। মুনি-ঋষিরা স্বর্গে গমন করেছেন ও তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনা অনেক।

'তাঁর তুলনা দেয়ার কোনো বস্তু নেই।' সকল দেবতাদেরই তুলনা দেয়া হয়েছে।

'সকল মহৎগুণের অধিকারী তিনি।' কোনো দেবতার মধ্যে সকল মহৎগুণ নেই।

'কেউ তাকে হিংসা করে না।' দেবতাদের হিংসা করে অনেকেই, বিশেষ করে অসুররা।

'তিনি সকল দিক এবং সবকিছু পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন।'
অথচ দেবতাদের পত্নী হরণ হয়, কিন্তু সে জানে না।

'তিনি প্রথমে ছিলেন, মধ্যেও ছিলেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।' কোনো দেবতাই প্রথমে ছিল না অর্থাৎ তারা তাদের জন্মের পূর্বে ছিল না এবং এখনও নেই। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণসমূহ থেকে পাঠক মাত্রই জানেন, বিভিন্ন সময় দেবতারা মর্ত্যে চলে আসে, কিন্তু এখন আর কেউই আসে না।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আরো আছে,

एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः।
हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतद् विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १७॥

"That god, the maker of all things, the great Self , is perceived by the heart, the soul, the mind."

(THE UPANISHADS translated by F. Max Muller)

"প্রকৃত স্রষ্টা বিশ্বস্রষ্টা, সর্বব্যাপী ঈশ্বর। হৃদয়ের অনুভূতি, বুদ্ধি এবং মনের সাহায্যে তাঁকে জানা যায়।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ: ৪/১৭); দেবতাদের মধ্যে এসব অনুপস্থিত। দেবতারা সর্বব্যাপী নন।

এ বিষয়গুলো প্রমাণ করে যে, হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত দেবদেবীরা ঈশ্বর নন, তারা উপাস্য হতে পারে না।

ধর্মগ্রন্থ ও বিশ্বাসের বৈপরিত্ব

হিন্দুধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী, ঈশ্বরের কোনো গুণ বা ক্ষমতা যখন আকার বা রূপ পায়, তখন তাকে দেবদেবী বলে অথবা ঈশ্বরের সাকার রূপকে[৭] দেবদেবী বলে। তাদের বিশ্বাস দেবদেবীর পূজা করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, আমরা দেবদেবীদের পূজা-অর্চনা করি যেন, তারা মহান স্রষ্টার কাছে সুপারিশ করে আমাদের সাহায্য করে।

আবার কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, সৃষ্টিকর্তা মূলত একজনই আর সকল দেব-দেবীরা হলো সেই এক সৃষ্টিকর্তার শক্তি বা অবতার। অর্থাৎ ঈশ্বর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ নিয়ে আসেন। তাদের মতে, অবতার হলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মানুষের রূপে দেহ নিয়ে পৃথিবীতে আগমন। তাদের বিশ্বাস- ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য বা মানবজাতির জন্য বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর রক্তমাংসের শরীর নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন।

---

৭. যেমন, শক্তির রূপ- দূর্গা, বিদ্যার রূপ- স্বরস্বতী, ঐশ্বর্যের রূপ- লক্ষ্মী, পালনশক্তির রূপ- বিষ্ণু, সৃষ্টির রূপ- ব্রহ্মা, ধ্বংসের রূপ- শিব।

কিন্তু ধর্মগ্রন্থ বলছে, ঈশ্বর এক ও একক। তার কোনো রূপ নেই, স্বর্গে, মর্ত্যে কোথাও তার কোনো মূর্তি নেই। তাকে কেউ দেখতে পারে না, তিনি কোনো কিছুর মত নন। কালী, দূর্গা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি কোনো রূপ ঈশ্বরের নেই। অর্থাৎ প্রকৃত স্রষ্টার কোনো মূর্তি নেই এবং মূর্তির মূল সত্তা কল্পিত।

সকল মূর্তিই সৃষ্ট, মানুষ নিজের হাতে মূর্তি তৈরি করে। মূর্তিদের কোনো ক্ষমতা নেই। তারা নিজের কোনো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। তাহলে মানুষের উপকার করবে কীভাবে?
মানুষ মূর্তি তৈরি করে। উচিৎ ছিল মূর্তিরা মানুষের পূজা করবে। কারণ মানুষ মূর্তিদের স্রষ্টা।

হিন্দুধর্মে অবতার

অবতার শব্দটির বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা নিম্নরূপ-

অবতার একটি সংস্কৃত শব্দ যেখানে 'অব' অর্থ 'নিচে' এবং 'তার' অর্থ 'নামা'। সুতরাং অবতার অর্থ "নিচে নেমে আসা"। কতিপয় হিন্দু পণ্ডিতের মতে, ঈশ্বরের অবতার একটি সম্বন্ধ পদ এবং এর প্রকৃত অর্থ হলো "স্রষ্টার সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এমন ব্যক্তির আগমন"।

হিন্দুদের সবচেয়ে পবিত্রগ্রন্থ শ্রুতির অন্তর্ভুক্ত বেদের কোথাও অবতার শব্দটির উল্লেখ নেই। তবে স্মৃতিতে অর্থাৎ পুরাণ ও ইতিহাসে এর উল্লেখ রয়েছে।

চারটি বেদেরই বেশ কিছু জায়গায় ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত কতকগুলো ব্যক্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। **বেদের ভাষ্যমতে**, সৃষ্টিকর্তা মানুষদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচিত করেন এবং তার সাথে উচ্চতর পর্যায়ে যোগাযোগ করেন যিনি তাঁর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। এভাবে আমরা যদি ভগবদগীতা ও পুরানকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ বেদের সাথে তুলনা করি তাহলে আমাদেরকে মানতেই হবে যে, যখন ভগবতগীতা ও পুরাণে অবতারের কথা বলা হয়, তখন ঈশ্বর কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়।

সুতরাং হিন্দুধর্ম মতে, ঈশ্বরের পক্ষ থেকে যাকে অবতীর্ণ করা হয় তাকেই **অবতার** বলা হয়। সে হিসেবে যিনি সর্বশেষে আসবেন তাকে **অন্তিম অবতার** বলা হয়।

মানুষকে বোঝার জন্য স্রষ্টার বা ঈশ্বরের মানুষের রূপ ধারণের প্রয়োজন!

যারা এতে বিশ্বাস করে তারা বলে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা এত শুদ্ধ ও পুত-পবিত্র যে তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট, সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, সমস্যা, অনুভূতি, স্নেহ-ভালোবাসা, আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন। সুতরাং মানুষের আচার-আচরণ ও কাজকর্মের ক্ষেত্রে বিধি-বিধান তৈরির জন্য সৃষ্টিকর্তা মানুষের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে নেমে আসেন।

সৃষ্টিকর্তা আসলেই কি এতটা দুর্বল?

ধরুন আমি একটি টেপ রেকর্ডার তৈরি করলাম, তাহলে টেপ রেকর্ডারের জন্য কোনটি ভালো বা মন্দ তা বোঝার জন্য কি আমাকে টেপ রেকর্ডার হতে হবে? স্বাভাবিক ব্যবহার বা এমনকি ভুল ব্যবহারের কারণে টেপ রেকর্ডারে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে তা বোঝার জন্য প্রস্তুতকারককে নিজেকেই টেপ রেকর্ডারের ভূমিকা নেয়ার প্রয়োজন নেই।

তেমনিভাবে মানুষের জন্য কোনটি ভালো বা মন্দ তা জানতে সৃষ্টিকর্তাকে মানুষের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসার প্রয়োজন হয় না। যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তার নিজ সৃষ্টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তার কেবল ব্যবহার নির্দেশিকা প্রদান করা প্রয়োজন। সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে এমন একটি নির্দেশিকা, যা মানুষকে নিম্নোক্ত বিষয়ে অবগত করবে ও ব্যাখ্যা করবে -

১) মানব সৃষ্টির লক্ষ ও উদ্দেশ্য।

২) কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে।

৩) ইহ ও পারলৌকিক সাফল্য লাভের জন্য তাদের কি করা উচিত ও কি থেকে বিরত থাকা উচিত।

এ ব্যবহারবিধি লেখার জন্য স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে পৃথিবীতে নেমে আসার প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষের মধ্য থেকে তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য একজনকে নির্বাচিত করেন এবং ওহীর মাধ্যমে উচ্চতর পর্যায়ে তার সাথে যোগাযোগ করেন। এ ধরনের নির্বাচিত ব্যক্তিকেই বলা হয় সৃষ্টিকর্তার বাণী প্রচারক বা নবী বা অবতার। এসব নির্বাচিত মানবের কাছেই সৃষ্টিকর্তা তার বাণী প্রেরণ করেন যা আমাদের কাছে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে পরিচিত।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে জন্মান্তর ও কর্মফল

গীতায় এসেছে, "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়; নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি। ততা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-ন্যন্যানি সংযাতি নবনি দেহী॥" "মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে।" (শ্রীভগবদ্গীতা, ২.২২)

হিন্দু ধর্মমতে, আত্মার এ নতুন শরীর ধারণ করাকে বলা হয় জন্মান্তর বা পুনর্জন্ম। তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে, জন্মান্তরের সঙ্গে কর্মফলের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে আর তা হলো- ভালো কর্ম করলে ভালো ফল অর্থাৎ আত্মার মুক্তি এবং খারাপ কর্ম করলে জীবাত্মা পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে, নিজেকে পাপ মুক্ত করবার জন্য। অর্থাৎ ভালো কর্ম করে মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবাত্মা পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়, ২২ নং মন্ত্র- 'আত্মা **জীর্ণ শরীর** ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে।'

প্রশ্ন আসে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কোনো শিশু, কিশোর ও যুবক কি মৃত্যুবরণ করেনি?

আমরা প্রত্যক্ষদর্শী যে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে অনেক শিশু, কিশোর ও যুবক মৃত্যুবরণ করেছেন। শিশু, কিশোর ও যুবকের শরীর তো জীর্ণ বা অকেজো হয়নি, তাহলে আত্মা, শিশু ও যুবকের দেহ কেন ত্যাগ করলো?

পুনর্জন্মবাদঃ বিপক্ষে আরো দুইটি প্রমাণ

এক: বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সৃষ্টি উদ্ভিদ, তারপর প্রাণীজগত, তারপর পৃথিবীতে মানুষের জন্ম/আগমন। প্রশ্ন হলো, যখন কোনো মানুষ সৃষ্টি হয়নি, তখন মানুষের ভালো-মন্দ কর্মের সুযোগও হয়নি, তখন কাদের আত্মা গাছ-গাছালি এবং প্রাণীদের দেহে স্থানান্তরিত হল?

দুই: পৃথিবীতে ক্রমাগত প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কথা! যেসব আত্মা শুভকর্মের ফলে পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি পাবে, প্রাণীর হিসাব থেকে তারা বাদ পড়ে যাবে। ফলে ক্রমাগত মানুষের সংখ্যা কমবে, কমবে প্রাণীর সংখ্যাও। অথচ আমরা দেখছি পৃথিবীব্যাপী মানুষ, পশু, উদ্ভিদের সংখ্যা নিয়মিত বেড়েই চলছে। অতিরিক্ত প্রাণীগুলো কাদের প্রাণ/আত্মা?

পুনর্জন্মবাদের সঠিক অর্থ

সংস্কৃত ভাষায় 'পুণার' বা 'পুনা' অর্থ হচ্ছে, 'পরবর্তী কাল বা পুনরায়'। আর 'জন্ম' অর্থ হচ্ছে 'জীবন'। সুতরাং 'পুনর্জন্ম' অর্থ হচ্ছে: 'পরবর্তী জীবন বা মৃত্যুর পরের জীবন যে জীবনে দুনিয়ার জীবনের ভালো-মন্দের ফল ভোগ করবে, অর্থাৎ স্বর্গ ও নরকের জীবন'। এটাই পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরের সঠিক ও বিশুদ্ধ অর্থ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ সঠিক বলে বিবেচিত হয় না।

বিবেকের কাঠগড়ায় খ্রিষ্ট ধর্মগ্রন্থ

১. পবিত্র বাইবেল; পরিচিতি

‘ধর্মপুস্তক/বাইবেল/কিতাবুল মোকাদ্দস’ ধর্মগ্রন্থের নাম। এই ধর্মগ্রন্থের দুইটি ভাগ রয়েছে- পুরাতন নিয়ম/العهد القديم/Old Testament ও নবসন্ধি বা নতুন নিয়ম/العد الجديد/New Testament.

পুরাতন নিয়মে বা ওল্ড টেস্টামেন্টে ঈসার জন্মের পূর্ব পর্যন্ত ইসরাঈল জাতির ইতিহাস রয়েছে অর্থাৎ সে সব নবীদের কথা বলা আছে, যারা ঈসা (আ.) এর পূর্বে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। আর নতুন নিয়মে বা নিউ টেস্টামেন্টে আছে ঈসা ও তার শিষ্যদের কার্যকলাপের বিবরণ।

খ্রিষ্টানদের বৃহৎ দল তিনটি, ক্যাথলিক বা সর্বজনীন, অর্থোডক্স বা গোঁড়া, প্রটেস্ট্যান্ট বা প্রতিবাদী। প্রত্যেকের বাইবেলের মধ্যে ব্যবধান আছে। যেমন, ক্যাথলিক- ৪৬ পুস্তক, অর্থোডক্স- ৫১ পুস্তক, প্রটেস্ট্যান্ট- ৩৯ পুস্তক। এখানে মনে রাখতে হবে যে, পুরাতন নিয়মটি মূলত ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ। ইহুদী বাইবেল বা ‘তানাখ’ (Tanakh/Tenak)- এর পুস্তক সংখ্যা ২৪। পুরাতন নিয়মের মূল ভিত্তি গ্রীক সেপ্টুআজিন্ট (Septuagint)- এর মধ্যে ৫৩টি পুস্তক, অর্থোডক্স পুরাতন নিয়মে ৫১টি পুস্তক, ক্যাথলিক বাইবেলে ৪৬টি পুস্তক এবং প্রটেস্ট্যান্ট বাইবেলে ৩৯টি পুস্তক।

২. কিতাবুল মোকাদ্দসে আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়

পুরাতন নিয়মঃ

“Hear, O Israel: The Lord is our God, the Lord alone.” (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

“Hear, O Israel: The LORD…LORD is one!” **(The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr.)

“ইসরাঈলীরা শোনো, আমাদের প্রভু ঈশ্বর একক।” (বাইবেল, ডিউটারোনমি ৬:৪)

বাদশাহ দাউদ (আ.) বললেন,

“O LORD, there is none like You, nor is there any God besides You.” (1 chronicles 17:20) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

“There is no one like you, O Lord, and there is no God besides you.” (1 chronicles 17:20) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)
“হে আল্লাহ, তোমার মত আর কেউ নেই এবং তুমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই।” (১ খান্দাননামা ১৭:২০)

“O Lord, God of Israel, there is no God like you in heaven above or on earth beneath.” (1 king 8:23) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

“LORD God of Israel, there is no God in heaven above or on earth below like You.” (1 king 8:23) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

“ইসরাইলের মাবুদ, উপরে বেহেশতে কিংবা নিচে দুনিয়াতে তোমার মত মাবুদ আর কেউ নেই।” (১ বাদশাহ্‌নামা ৮:২৩; আরো দেখুন, যিশাইয়া ৪৩:১১, ৪৫:১২, ৫১:১২, ৪৩:১১, ৪৫:১২, হিজরত ২০:৩-৪, লেবীয় ১৯:১৮, যিরমিয় ২৪:৭, দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৫, ৪:৩৫, ৬:১৩, ১০:২০)

নতুন নিয়ম:

একদা বাইবেলের একজন লিপিকার যীশুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, ঈশ্বরের সর্বপ্রথম নির্দেশ কোনটি?

“One of the scribes came near and heard
them disputing with one another, and seeing
that he answered them well, he asked him,
Which commandment is the fi rst of all?” (Mark 12:28)
(THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

এর উত্তরে তিনি তা-ই পুনরুক্তি করলেন যা মূসা (আ.) বলেছিলেন-
'শামা ইসরাঈলু আদোনাই ইলা হাইনো আদনা ইখাত'
অর্থ- 'হে ইসরাঈলীরা শোনো! আমাদের প্রভু ঈশ্বর একক প্রভু।' (মার্ক ১২:২৯)

"Jesus answered, "The fi rst is, 'Hear, O Israel:
the Lord our God, the Lord is one." (Mark 12:29)
(THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

"We know that an idol is nothing in the world, and that there is no other God but one." **(The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

"We know that no idol in the world really exists and that there is no God but one." (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)
(1 corinthians 8:4)

"আমরা জানি জগতে প্রতিমা আসলে কিছুই নয় আর ঈশ্বরও মাত্র একজন ছাড়া আর কেউ নেই।" (১ করিন্থীয় ৮:৪)

"And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent." (John 17:3)
(THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE**, The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)
ঈসা বললেন, "তোমাকে অর্থাৎ একমাত্র সত্য আল্লাহকে আর তুমি যাকে পাঠিয়েছ সেই ঈসা মসীহকে জানতে পারাই অনন্ত জীবন।" (ইউহোন্না ১৭:৩ আরো দেখুন মথি ৪:১০, ৬:৬, ১২:৫০, ২২:৩৭, মার্ক ৯:৪০, ১২:২৯, লূক ১:৪৯, ৪:৮, ৫:২১, ৯:৫০, ১০:২৭, ২৫, ২৮, ৪১-৪৪, ইউহোন্না ৫:৪৪, ৮:৪১, ১৭:৩, ২০:১৭, রোমীয় ১৩:৯, ১৬:২৭, ১ করিন্থীয় ১:৬, গালাতীয় ১:১০, ৫:১৪, ফিলীপীয় ৪:৬, ইফিষীয় ৪:৬, ১ তিমথীয় ১:১, ১৭, ২:৪, ৬:১৫-১৬, ইয়াকুব ৪:১২, এহুদা/যিহুদা/যুদ ১:২৫, প্রকাশিত কালাম ২২:৯)

"You shall not bow down to them nor serve them. For I, the LORD your God, am a jealous God." (Deuteronomy 5:9)

(**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

"তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর পূজাও করবে না, সেবাও করবে না, কারণ কেবলমাত্র আমি আল্লাহই তোমাদের মাবুদ।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৯, ৭, হিজরত ২০:৫)

"You shall not make for yourself an idol,
whether in the form of anything that is in
heaven above, or that is on the earth beneath,
or that is in the water under the earth." (Exodus 20:4)
(THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

"পূজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মূর্তি তৈরি করবে না, তা আকাশের কোন কিছুর মত হোক বা মাটির উপরের কোন কিছুর মত হোক কিংবা পানির মধ্যেকার কোন কিছুর মত হোক।" (হিজরত ২০:৪, আরো দেখুন, লেবীয় ১৯:৪, ইয়ারমিয়া ২:১১, ৭:৯, ৩১, ৩২:৩৫-৩৭, দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৫-২০, ৩২, ১২:৩২, জবুর শরীফ ১০৫:৪, ১ বাদশাহনামা ১৮:৪০, ২ বাদশাহনামা ১৭:১৭, প্রজ্ঞাপুস্তক ১১:১৫, রোমীয় ১:২৩)

৩. আল্লাহর সঙ্গে শরীক করার পরিণতি

এ প্রসঙ্গে বাইবেলে বলা হয়েছে,

You shall not bow down to them or worship them; for I the Lord your God am a jealous God, punishing children for the iniquity of parents, to the third and fourth generation of those who reject me. (Deuteronomy 5:9)
(THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

যারা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করবে, তাদের গোনাহের শাস্তি তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্যন্ত পাবে। (দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৯, হিজরত ২০:৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করবে, তাদের সবাইকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। (দ্বিতীয় বিবরণ ৭:১৬)

আরো বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার সাব্যস্ত করবে, তাদের সবাইকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করতে হবে। (লেবীয় ২০:২ ; আরো দেখুন, মথি

৭:২১, ২৪, লূক ৪:৮, রোমীয় ২:১৩, ইয়াকুব ১:২২, ১ ইউহোন্না ২:১৭, লেবীয় ১৯:৪, ইয়ারমিয়া ২:১১, ৭:৯, ৩১, ৩২:৩৫-৩৭, হিজরত ২০:৬, ২০:২-১৭, ৭:১৯, ৩৩:১১, দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১০, ৪:১, ১৫-২০, ৩২, ১২:৩২, ২৩:৩০ জবুর শরীফ ১০৫:৪, ১ বাদশাহনামা ১৮:৪০, ২ বাদশাহনামা ১৭:১৭, প্রজ্ঞাপুস্তক ১১:১৫, রোমীয় ১:২৩)

৪. স্রষ্টার কোনো তুলনা নেই

মহান স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টি কখনো এক হতে পারে না। কারণ আল্লাহর মতো কেউ নেই, কোনো কিছুই নেই। ঈসা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। বিষয়টি বুঝার জন্য নিচে কয়েকটি প্রার্থক্য দেয়া হলো-

মহান স্রষ্টা	সৃষ্টি	ঈসা (আ.)
(১) আল্লাহ তা'আলা এক ও অবিভাজ্য। কোনো অবস্থাতেই তাঁকে ভাগ করা যায় না।	(১) কোনো সৃষ্টি একক নয়, সৃষ্টি জন্ম নেয় ও অপরকে জন্ম দেয়। সে কারণে সৃষ্টি একক ও অবিভাজ্য হতে পারে না।	(১) ঈসা সৃষ্টি, তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁর মাতার নাম মরিয়ম। (লূক ২:১-৭, কুর'আন ১৯:১৬-৩৫)
(২) মহান স্রষ্টা অমুখাপেক্ষী। কোনো অবস্থাতেই তাঁর কারো কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।	(২) সৃষ্টি মৃত্যুকালীন সময় পর্যন্ত একে অপরের মুখাপেক্ষী থাকে।	(২) ঈসা খাবার, ঘুম ইত্যাদির মুখাপেক্ষী ছিলেন (ইউহোন্না ১৯:২৯-৩০, মার্ক ১১:১২, লূক ৪:২)
(৩) মহান স্রষ্টার সমকক্ষ বা সমতুল্য কেউ নেই।	(৩) সৃষ্টির সমকক্ষ বা সমতুল্য আছে। তাই তাদের মধ্যে পরস্পর দ্বন্দ-ফাসাদ, ঝগড়া-	(৩) ঈসার সমকক্ষ বা সমতুল্য মানুষ ছিল। (মথি ২৬:৬৭-৬৮,

	বিবাদ, লেগে আছে/থাকে।	ইবরানী ৭:১৭)
(৪) মহান স্রষ্টা অনন্তকাল ধরে আছেন এবং থাকবেন, তাঁর মৃত্যু বা ধ্বংস নেই।	(৪) প্রত্যেক সৃষ্টি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকে, এরপর মৃত্যু বরণ করে।	(৪) ঈসার জন্ম ও মৃত্যুর সময়কাল নির্দিষ্ট।
(৫) মহান স্রষ্টা কখনো ঘুমান না। এমনকি এক মূহূর্তের জন্যও তাঁর তন্দ্রা আসে না।	(৫) সৃষ্টির ঘুম এবং তন্দ্রা আছে।	(৫) ঈসা ঘুমাতেন। (মথি ৮:২৪-২৫)
(৬) মহান স্রষ্টা খাওয়া-দাওয়া করেন না। তাঁর ক্ষুধা বা তৃষ্ণা নেই। সে জন্য তাঁর খাদ্যের প্রয়োজন হয় না।	(৬) সৃষ্টি খাদ্য ছাড়া বাঁচতেই পারে না।	(৬) ঈসা মানুষ ছিলেন। তাই খাদ্যের প্রয়োজন ছিল। (ইউহোন্না ১৯:২৯-৩০, মার্ক ১১:১২, লূক ৪:২)
(৭) মহান স্রষ্টার কোনো পরিবর্তন নেই। প্রথমে যেমন ছিলেন, বর্তমানেও তেমনি আছেন, ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবেন।	(৭) সৃষ্টির অবস্থার পরিবর্তন হয়। যেমনঃ শিশু, কিশোর, যৌবন, পৌঢ় ও বৃদ্ধকাল আছে।	(৭) ঈসার শিশু, কিশোর ও যৌবনকাল ছিল। (লূক ২:১৭, যোহন ১৯:২৯-৩০, মথি ১৯:২৮)

(৮) মহান স্রষ্টা সকল ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সবকিছুর পরিচালক।	(৮) কোনো সৃষ্টি সর্বশক্তির অধিকারী নয়। প্রত্যেকের শক্তি সীমিত।	(৮) ঈসা সৃষ্ট বা মাখলুক, তাই তিনি নিজ থেকে কিছুই করতে পারেন নি। (যোহন ৫:১৯, ৮:২৮, মথি ৮:২০)
(৯) মহান স্রষ্টা পুত পবিত্র। দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। সামান্যতম দোষ-ত্রুটি তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনা।	(৯) সৃষ্টি দোষ-ত্রুটি, ভালো মন্দ, উভয় গুণে সৃষ্ট।	(৯) ঈসার মধ্যে দোষ-ত্রুটি, ভালো-মন্দ উভয় গুণই ছিল। (মথি ১৫:৩২-২৯, লূক ১৩:১০-১৭, মার্ক ১০:৪৬-৫২)-ভালো, (লূক ৭:৩৪-৫০, ৮:১-৩, যোহন ১১:১-৫, ৩:৪-৫)- মন্দ
(১০) মহান স্রষ্টার মধ্যে শ্রান্তি, ক্লান্তি, দুঃখ-কষ্ট, ব্যাথা-বেদনা, ভুল-ভ্রান্তি এসব কিছুই নেই, থাকতেও পারে না।	(১০) সৃষ্টির মধ্যে শ্রান্তি, ক্লান্তি, দুঃখ-কষ্ট, ব্যাথা-বেদনা, ভুল-ভ্রান্তি সব কিছুই আছে, এসব ছাড়া কোনো সৃষ্টি চলতে পারে না।	(১০) ঈসার মধ্যে শ্রান্তি, ক্লান্তি, দুঃখ-কষ্ট, ব্যাথা-বেদনা, ভুল-ভ্রান্তি সব কিছুই ছিল। (মথি ৮:২০, ২৬:৬৭-৬৮, যোহন ১৮:২২, লূক ২২:৪৮, মার্ক

		১৪:৩২-৪০)
(১১) স্রষ্টার কোনো ভয় নেই। যেহেতু তিনি সবকিছুর স্রষ্টা সেহেতু তিনি কাউকে ভয় করেন না।	(১১) মাখলূক তার থেকে বড় জিনিসকে স্বভাবতই ভয় করে।	(১১) ঈসা সৃষ্টি; তাই তাঁরও ভয় ছিল। (ইউহোন্না ৭:১)

৫. ঈসার ঈশ্বরত্বের প্রমাণ কি?

প্রচলিত বাইবেল থেকে খ্রিষ্টানদের ঈসার ঈশ্বরত্ব দেয়া উদ্ধৃতিগুলোর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নরূপ-

৫.১। মৃতকে জীবিত করা

খৃষ্টানদের দাবী: ঈসা ঈশ্বর ছিলেন। কেননা তিনি মৃতকে জীবিত করেছেন।

মৃতকে জীবিত করা যদি ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হয়, তাহলে বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী ঈশ্বর পাঁচজন। কেননা ঈসা মাত্র তিনজন মৃতকে জীবিত করেছেন।[৮]

২. ১ম: অধ্যক্ষের কন্যা, যার কথা শুধু প্রথম তিন সুসমাচার লেখক (মথি, মার্ক ও লূক) উল্লেখ করেছেন। [মথি ৯/২৫, মার্ক ৫/৪২, লূক ৮/৫৫]

২য়: শুধু লূক তার গ্রন্থের ৭ম অধ্যায়ে যে মৃত ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। [লূক ৭/১১-১৬]

৩য়: লাসার নামক ব্যক্তি যাকে জীবিত করার ঘটনা শুধু যোহন তার পুস্তকের ১১শ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। [যোহন ১১/১-৪৪]

পক্ষান্তরে বাইবেলের বর্ণনায়, ইহিষ্কেল ভাববাদী হাজার হাজার মৃত মানুষকে জীবিত করেছেন। (বিস্তারিত দেখুন, ইহিষ্কেল ৩৭:১-১৪)

এলিয় (Eiija) একটি মৃত শিশুকে পুনর্জীবিত করেন। (১ রাজাবলি ১৭/১৭-২৪)

ইলীশায় (Elisha) একজন মৃত বালককে পুনর্জীবিত করেন। (২ রাজাবলি ৪/৮-৩৭)

মৃতকে জীবিত করা যদি ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হয়, তাহলে বাইবেলে বর্ণিত জীবন দানকারীগণ (পিতা ঈশ্বর, ঈসা, ইহিষ্কেল, এলিয় ও ইলীশায়) সবাই ঈশ্বর। এটা কোনোভাবেই যৌক্তিক নয়।

সুতরাং মৃতকে জীবিত করা কখনোই ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হতে পারেনা। বরং এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে মুজিযা[৩] মাত্র, যা নবী হিসেবে ঈসাকে দেওয়া হয়েছিল।

"ঈসা সেই নেতাদের বললেন, আমি সত্যিই আপনাদের বলছি, পুত্র নিজ থেকে কিছুই করতে পারেন না।" (ইউহোন্না ৫:১৯)

"Then Jesus answered and said to them, Most assuredly, I say to you, the Son can do nothing of Himself." (John 5:19)
(**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

৫.২। স্বশরীরে স্বর্গে গমণ

খ্রিষ্টান ভাইগণ বলেন যে, ঈসা স্বশরীরে স্বর্গে চলে গেছেন। তাই তিনি ঈশ্বর।

স্বর্গে যাওয়া যদি ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হয়, তাহলে বাইবেলের নবী ইনোক ও ইলিয়াস বড় ঈশ্বর।

কারণ বাইবেলের দাবী অনুসারে ইনোক স্বশরীরে অমর হয়ে স্বর্গে গিয়েছেন (পয়দায়েশ ৫:২৩-২৪)। তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়নি।

---

৩. মুজিযা অর্থ- 'অক্ষমকারী অলৌকিক নিদর্শন'। নবীগণ তাঁদের নবুওয়াতের দাবী প্রমাণ করতে যে সকল অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন সেগুলোকে 'মুজিযা' বলা হয়।

দ্বিতীয়ত; বাইবেল অনুসারে ইলিয়াস নবীকে জীবিত অবস্থায় বেহেশতে নেয়ার জন্য আগুনের রথ ও আগুনের কতকগুলো ঘোড়া এসেছিল। তিনিও স্বশরীরে স্বর্গে গিয়েছেন (২ বাদশাহ্‌নামা ২:১-১১)।

মোটকথা, এই সূত্র অনুযায়ী পিতা ঈশ্বর, ঈসা, ইনোক ও ইলিয়াস চারজন ঈশ্বরকে মানতে হবে, যা অসম্ভব। সুতরাং স্বশরীরে স্বর্গে গমণ করা ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হতে পারেনা।

৫.৩। ঈসা এই দুনিয়ার নন

খ্রিষ্টানগণ দাবী করেন যে, ঈসা ঈশ্বর। কেননা তিনি নিজেই তাকে ঈশ্বর বলেছেন। যেমন: ঈসা বললেন, "আমি উপর থেকে এসেছি আর আপনারা নীচ থেকে এসেছেন। আপনারা এই দুনিয়ার, কিন্তু আমি এই দুনিয়ার নই।" (ইউহোন্না ৮:২৩)। এখানে তাদের দাবী অনুসারে ঈসা ঈশ্বরত্বের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

কিন্তু একই কথা ঈসা তার শিষ্যদের ক্ষেত্রেও বলেছেন। ঈসা বললেন, "যদি তোমরা এই দুনিয়ার হতে তবে লোকেরা তাদের নিজেদের বলে তোমাদের ভালবাসত। কিন্তু তোমরা এই দুনিয়ার নও।" (ইউহোন্না ১৫:১৯)

"If you were of the world, the world would love its own. Yet because you are not of the world." (John 15:19)
(**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

ঈসার যে কথা তার ঈশ্বরত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে ঠিক একই কথা তার শিষ্যদের ঈশ্বরত্বের প্রতি ঈঙ্গিত করে। তাহলে বাইবেলের বর্ণনায় ঈশ্বর অনেকজন! এটা কোনোভাবেই যৌক্তিক নয়।

যীশুর এই বাক্যের সঠিক অর্থ হলো, তোমরা পার্থিব জগতের লোভ-লালসার অনুসারী ও জাগতিক স্বার্থান্বেষী। আর আমি তদ্রূপ নই, বরং আমি ঊর্ধ্বজগতের বা স্বর্গের মর্যাদার অভিলাসী এবং ঈশ্বরের প্রেম অনুসন্ধানী।

৫.৪। ঈসা আর ঈশ্বর এক নয়

ঈসা বললেন, "আমি আর পিতা এক" (ইউহোন্না ১০:৩০)। খ্রিষ্টানগণ দাবী করেন যে, এই কথাটি ঈসার ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করে।

অথচ ঈসা ঠিক একই কথা বলেছেন তার শিষ্যদের বিষয়ে। তিনি বলেন, "পিতা, তুমি যেমন আমার সংগে যুক্ত আছ আর আমি তোমার সংগে যুক্ত আছি তেমনি **তারাও যেন আমাদের সংগে যুক্ত থাকতে পারে**। তাতে দুনিয়ার লোকেরা বিশ্বাস করতে পারবে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ। যে মহিমা তুমি আমাকে দিয়েছ তা আমি তাদের দিয়েছি যেন আমরা যেমন এক তারাও তেমনি এক হতে পারে। অর্থাৎ **আমি তাদের সংগে যুক্ত ও তুমি আমার সংগে যুক্ত**, আর এভাবে যেন তারা পূর্ণ হয়ে এক হতে পারে। (ইউহোন্না ১৭:২১-২৩)

"That they all may be one, as You, Father, are in Me, and I in You; that they also may be one in Us, that the world may believe that You sent Me. And the glory which You gave Me I have given them, that they may be one just as We are one: I in them, and You in Me; that they may be made perfect in one." **(**John 17:21-23)

(**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

তাহলে কি আপনি বলবেন, ঈসাকে যে ঈশ্বরত্ব প্রদান করেছিলেন পিতা ঈশ্বর, সে ঈশ্বরত্ব তিনি শিষ্যদেরকে প্রদান করলেন এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও শিষ্য ঈশ্বরগণ সকলে মিলে অনেকজন ঈশ্বর! তা কখনোই নয়।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, যীশুর প্রেরিতগণ প্রকৃত অর্থে 'একসত্ত্বা' ছিলেন না, ঠিক তেমনি যীশুও প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের সাথে 'একসত্ত্বা' ছিলেন না।

বস্তুত, 'ঈশ্বরের সাথে এক' হওয়ার অর্থ হলো, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নির্দেশের সাথে নিজের ইচ্ছা ও কর্ম এক করে দেওয়া, তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা ও ধার্মিক জীবন যাপন করা।

ঈশ্বরের সাথে ঐক্য ও অংশীদারিত্ব বলতে যে এই অর্থ বুঝানো হয়েছে তা বাইবেল থেকেই প্রমাণিত হয়। যোহন তাঁর প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায়ে

লিখেছেন, "(৫) আমরা যে বার্তা তাঁহার কাছে শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইতেছি, তাহা এই, ঈশ্বর জ্যোতি, এবং তাঁহার মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই। (৬) আমরা যদি বলি যে, তাঁহার (ঈশ্বর) সহিত আমাদের সহভাগিতা (অংশীদারিত্ব) আছে (We have fellowship with him), আর যদি অন্ধকারে চলি, তবে মিথ্যা বলি, সত্য আচরণ করি না। (৭) **কিন্তু তিনি (ঈশ্বর) যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি জ্যোতিতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা (অংশীদারিত্ব) আছে** (We have fellowship one with another)।"

এ থেকে জানা যায় যে, বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী ঈশ্বরের সাথে এক হওয়া বা ঈশ্বরের সহভাগী বা অংশীদার হওয়ার অর্থ হলো ঈশ্বরের নির্দেশ মত জ্যোতি ও পুণ্যের পথে চলা।

৫.৫। আল্লাহর পুত্র

খ্রিষ্টানগণ দাবী করেন যে, ঈসা আল্লাহর পুত্র। এজন্য তার মধ্যে ঈশ্বরত্ব বিদ্যমান।

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, আদম, দাউদ, ইয়াকুব ও ইফ্রিমিয় আল্লাহর পুত্র। (জবুর ৮৯:২২, হিজরত ৪:২২, ইয়ারমিয়া ৩১:৯, লূক ৩:৩৮)

আল্লাহর অগণিত পুত্র আছে। (দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:১, ৩২:১৯, ইশাইয়া ১:২, ৩০:১)

সকল মানুষ আল্লাহর পুত্র। (দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:১, ৩২:১৯, ইশাইয়া ১:২, ৩০:১, হোসিয়া ১০:১)

সুতরাং পুত্র বলার দ্বারা ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হলে সকল মানুষকে ঈশ্বর বলতে হয় আর এটা অসম্ভব।

আল্লাহর **অনুগত বান্দাদেরকে** আল্লাহর পুত্র বলা হয়েছে। (রোমীয় ৮:১৪)

"For all who are led by the Spirit of God are children of God." (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

“For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God.” (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)
(Romans 8:14)

এখানে আমরা স্পষ্টত দেখতে পাই, বাইবেল অনুসারে আল্লাহর অনুগত বান্দাদেরকেই আল্লাহর পুত্র বলা হয়েছে।

৫.৬। অলৌকিক জন্ম

খ্রিষ্টানগণ দাবি করেন যে, ঈসা যেহেতু পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেহেতু এদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তার মধ্যে ঈশ্বরত্ব আছে।

বাইবেলে আছে, “আদম পিতামাতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছেন।” (লূক ৩:৩৮, ১ খান্দাননামা ১:১, পয়দায়েশ ৫:১)

আপনি কি বলবেন যে, পিতা ঈশ্বর, ঈসা ও আদম মিলে মোট তিনজন ঈশ্বর!

সুতরাং পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ কখনোই ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হতে পারে না।

৫.৭। অসুস্থকে সুস্থ করা

খ্রিষ্টানগণ দাবী করেন যে, ঈসা অসুস্থকে সুস্থতা দান করেছেন, এটা তার ঈশ্বরত্বের প্রমাণ। (মথি ৮:২৩-২৭, ৯:১-৮, ২৭-৩৪, মার্ক ২:১-১২, ৫:১-২০, ৭:৩৬, লূক ৫:১৭-২৫, ৮:২৬-২৯)

বাইবেলের বর্ণনায় অসুস্থকে সুস্থতা দানকারী আরো অনেকেই আছেন। (২ বাদশাহনামা ৪:৮-৩৭, লূক ১০:১-১০, প্রেরিত ১৬:১৬-১৮)

আপনি কি তাদেরকেও ঈশ্বর স্বীকার করেন!

সুতরাং অসুস্থকে সুস্থ করা ঈশ্বরত্বের প্রমাণ হতে পারে না।

৫.৮। ঈসার মধ্যে অপরিবর্তন

ঈসা মসীহ কালকে যেমন ছিলেন, আজকেও তেমনি আছেন এবং চিরকাল তেমনি থাকবেন। (ইবরানী ১৩:৮)। খ্রিষ্টানগণ দাবী করেন, এটা ঈসার ঈশ্বরত্বের প্রমাণ। কেননা তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই।

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী ঈসার শিশু, কিশোর ও যৌবনকাল ছিল। (লূক ২ অধ্যায়, মথি ১ ও ২ অধ্যায়)

৫.৯। ঈসা ঈশ্বর ছিলেন না

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, ঈসা তরিকাবন্দী নেবার সময় পানিতে আছেন, এমতাবস্থায় পাকরূহ কবুতরের আকৃতিতে ঈসার কাঁধে আর আল্লাহ তখন আসমান থেকে বলছেন, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র...."। (মথি ৩:১৭)

"And suddenly a voice came from heaven, saying, This is My beloved Son, in whom I am well pleased." (Matthew 3:17) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

সুতরাং 'ঈসা', 'পাকরূহ' ও 'আল্লাহ' আলাদা আলাদা সত্তা এবং তারা পৃথক পৃথক স্থানে অবস্থান করছেন। তাই তিনজনকে কোনোভাবেই এক বলা যাবে না।

অন্যত্র আছে, "প্রায় তিনটার সময় ঈসা জোরে চিৎকার করে বললেন, "ইলী, ইলী, লামা শবক্তানী" অর্থাৎ "আল্লাহ আমার, আল্লাহ আমার, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ?" (মথি ২৭:৪৬)

"And about three o'clock Jesus cried with a loud voice, "Eli, Eli, lema sabachthani?" that is, "My God, My God, why have You forsaken Me?" (Matthew 27:46) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

ঈসা যদি আল্লাহ হতেন, তবে তিনি "আল্লাহ আমার" বলে কাকে ডাকছেন? বুঝা গেল ঈসা আল্লাহ নন; বরং তিনি আল্লাহর গোলাম বা দাস।

“ঈসা সেই পাঁচটা রুটি আর দু'টা মাছ নিয়ে বেহেশতের দিকে তাকিয়ে শুকরিয়া জানালেন, আর লোকদের দেবার জন্য রুটি ভেংগে সাহাবীদের হাতে দিলেন। এভাবে তিনি সবাইকে মাছও ভাগ করে দিলেন।” (মার্ক ৬:৪১)

“Taking the five loaves and the two fish, he looked up to heaven, and blessed and broke the loaves, and gave them to his disciples to set before the people; and he divided the two fish among them all.” (Mark 6:41) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

ঈসা যদি আল্লাহ হতেন, তবে তিনি আল্লাহর শুকরিয়া জানাতেন না।

অন্যত্র আছে, ঈসা তাকে বললেন, “আমাকে ভাল বলছ কেন? আল্লাহ ছাড়া আর কেউই ভাল নয়।” (মার্ক ১০:১৮)

“So Jesus said to him, “Why do you call Me good? No one is good but One, that is, God.” (Mark 10:18) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

বুঝা গেল ঈসা এবং আল্লাহর সত্তা ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন।

ঈসা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে মুনাজাত করলেন.... তিনি বললেন, “আব্বা, পিতা, তোমার কাছে তো সবই সম্ভব। এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে তুমি নিয়ে যাও। তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হোক।” (মার্ক ১৪:৩৫-৩৬)

“He went a little farther, and fell on the ground, and prayed that if it were possible, the hour might pass from Him. And He said, “Abba, Father, all things are possible for You. Take this cup away from Me; nevertheless, not what I will, but what You will.” (Mark 14:35-36) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

প্রথমত: ঈসা যদি আল্লাহ হতেন তাহলে “আব্বা, পিতা” কাকে বলেছেন?

দ্বিতীয়ত: ঈসা বলেছেন, "তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক...."। যদি তিনি আল্লাহ হন, তাহলে তার ইচ্ছায় না হয়ে অন্য এক সত্তার ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি এতো ব্যস্ত কেন?

বরং তিনি আল্লাহর গোলাম ছিলেন এবং আল্লাহর নিকট তিনি নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করেছেন।

ঈসা জানতেন যে, তিনি আল্লাহরই কাছ থেকে এসেছেন এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাচ্ছেন। (ইউহোন্না ১৩:৩)

"Jesus, knowing that the Father had given all things into His hands, and that He had come from God and was going to God." (John 13:3) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

অন্যত্র আছে, "ঈসা মরিয়মকে বললেন, আমাকে ধরে রেখো না, কারণ আমি এখনও উপরে পিতার কাছে যাই নি। তুমি বরং ভাইদের কাছে গিয়ে বল, যিনি আমার ও তোমাদের পিতা, যিনি আমার ও তোমাদের আল্লাহ আমি উপরে তাঁর কাছে যাচ্ছি।" (ইউহোন্না ২০:১৭)

"Jesus said to her, "Do not cling to Me, for I have not yet ascended to My Father; but go to My brethren and say to them, 'I am ascending to My Father and your Father, and to My God and your God." (John 20:17) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

ঈসা নিজেই যদি আল্লাহ হন, তাহলে তিনি কেন বলেন 'যিনি আমার ও তোমাদের আল্লাহ আমি উপরে তাঁর কাছে যাচ্ছি?' বুঝা গেল তিনি আল্লাহ নন। তিনি বললেন, 'উপরে আমি যার কাছে যাচ্ছি, তিনি আমার ও তোমাদের আল্লাহ।'

"ঈসা বললেন, তোমাকে, অর্থাৎ একমাত্র সত্য আল্লাহকে আর তুমি যাঁকে পাঠিয়েছ সেই ঈসা মাসীহকে জানতে পারাই অনন্ত জীবন।" (ইউহোন্না ১৭:৩)

"And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent." (John 17:3) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এসব কিছু প্রমাণ করে যে, ঈসা কোনোভাবেই আল্লাহ হতে পারে না; বরং তিনি আল্লাহর গোলাম ছিলেন।

আমরা কয়েকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করলাম মাত্র। এমন অনেক উদ্ধৃতি বাইবেলে আছে যেগুলো প্রমাণ করে যে, ঈসা প্রেরিত; আল্লাহর বান্দা ও নবী।

অবতারত্বের অসারতা সম্পর্কে আরো জানতে পড়ুন; মথি ৩:১৩-১৭, ৭:২১-২৩, ৯:৮, ১০:৩২-৩৭, ১১:২৫-২৭, ১৯, ১২:১৮-২১, ৩১-৩২, ১২:৪৮-৫০, ১৩:৩৪-৩৫, ৪৩, ১৪:১৮-১৯, ১৫:৩-৬, ১৩, ৩৫-৩৬, ১৬:১৭, ২৩, ২৭, ২৮, ১৭:৫, ১৮:১০, ১৪, ১৯, ৩৫, ১৯:৬, ২৬, ২০:২৩, ২১:১৩, ১৮, ৩২, ৪২-৪৩, ৪৬, ২২:২৯, ৩২, ৩৭-৩৮, ২৩:৯-১০, ২২, ৩৯, ২৪:২২-২৪, ৩০, ৩৬, ২৬:৩৯-৪২, ২৭:১১, ২৯, ৩৭, ৪০, ৪৩, ৪৬-৫০, ৫৪, ২৮:৫, ১৮-২০, মার্ক ১:১, ১৪-১৫, ২৪, ২:২-৭, ১০-১১, ২৬, ৩:৩৫, ৪:১২, ১৪-২৬, ৩০-৩৩, ৫:৬-৭, ৬:৪১, ৭:৮-৯, ১১-১৩, ৮:৬, ৩৩-৩৫, ৯:১, ৬, ৩৬, ১০:৬, ১৫, ১৮, ৩৩, ৪০, ৪৫, ১১:১২, ২২, ২৫-২৬, ৩০, ১২:১৭, ২৯-৩২, ১৩:২৬-৩২, ১৪:২১-২২, ৩৫-৩৬, ৬২-৬৩, ১৫:১৯, ৩৪, ১৬:১৯ লূক ১:৩২, ২:২১, ৫২, ৩:২১, ৪:৮, ১২, ১৮, ২৪, ৪৩, ৬:১২, ৯:১৬, ৩৫, ৪৮, ১০:১৬, ২১, ১১:২০, ১৩:১৮, ২১, ২৮, ২৯, ১৪:১৪, ১৬:১৩-১৫, ১৭:১০, ১৫-১৮, ১৮:২, ৪, ৬, ১১, ১৪, ১৬-১৯, ২৭-২৯, ৪৩, ১৯:১১, ৩৭-৩৮, ৪৪, ২০:৪, ২১, ২৫, ৩৬-৩৮, ২১:২৩, ৩১, ২২:১৬, ১৮ ইউহোন্না/যোহন ১:১৮, ৩:১৬-২১, ৫:১৮-২৪, ৩৭-৩৮, ৬:২৭-২৯, ৪৫, ৮:৩৮, ৪০, ৪৫, ১০:৩৬, ১১:২৭, ৪১, ১২:২৬, ২৮, ৪৯, ১৩:৩, ১৪:১-২, ২০, ৩১, ১৫:১-৫, ২০:১৭ প্রেরিত/শিষ্যচরিত, ২:২২-২৪, ৩২-৩৬, ৩:১৩-১৫, ২২, ২৬, ৪:১০, ২৫-২৭, ৩০, ৫:৩০-৩২, ৭:৫৫-৫৬, ১৩:২৯-৩৩, ১৪:২৭, ১৬:১০, ১৪, ১৭, ৩২, ১৭:৩-৪, ২৯, ২৪-২৭, ১৮:৫, ২৭, ১৯:৬, ২০:২১, ২৪, ২২:১৪, ২৫:১৪, ২৮:৩১, রোমীয় ৩:২২, ১ করিন্থীয় ১৫:২৮, ২ করিন্থীয় ১:২০-২১, গালাতীয় ১:৩-৪, ১৬, ২:২১, ৩:১৪, ২৬, ৪:২-৪, ৫-৬, ৮-৯, ২৩, ৬:৭, ইফিষীয়/এফেসীয়/ইফিষীয় ১:১-৪-৬, ১৭, ২:৫-৬, ১০, ৩:১২, ১৮, ৪:৩২, ৬:২৩, ফিলিপীয় ২:৭-৯, কলসীয় ১:৩-৪, ১৩, ১৯, ২২, ২:১৯, ৩:১, ১৭, ১ থিষলনীকীয়/ থেসালোনিকীয়/থিষলনীকীয় ১:২-৩, ১০, ২:১৪, ৪:১৪, ৫:২৩, ২ থিষলনীকীয় ২:১৬-১৭, ইবরানী ৭:১৭, প্রকাশিত কালাম/প্রকাশিত বাক্য/প্রত্যাদেশ ২:৭, ৩:৪, ১২, ২১, ৪:৫, ৫:৯, ১৩, ৭:১০, ১৭, ১২:১০

৬. ঈসা মসীহ আল্লাহর বান্দা ও নবী ছিলেন

প্রচলিত ইনজিলের বর্ণনায় ঈসা কখনো বলেননি যে, আমি তিনের এক । তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছেন আল্লাহর প্রেরিত একজন নবীরূপে। প্রচলিত ইনজিলের কয়েকটি বর্ণনা দেখুন;

ঈসা একদিন তিনি তার নিজের গ্রামে গিয়েছিলেন। তখন সেখানকার লোকেরা তাকে সম্মান দেয়নি, বরং উপহাস করে বলেছে, একি সেই ছুতার মিস্ত্রি নয়? একি মরিয়মের ছেলে নয়? তখন ঈসা তাদের ঠাট্টা উপহাসের প্রতি উত্তরে বলেছেন, "নিজের গ্রাম, নিজের আত্মীয়-স্বজন ও নিজের বাড়ি ছাড়া আর সব জায়গাতেই নবীরা সম্মান পান।" (মার্ক ৬:৩-৪, মথি ১৩:৫৫-৫৭, লূক ৪:২৪)

"Then Jesus said to them, Prophets are not without honor, except in their hometown, and among their own kin, and in their own house." (Mark 6:4) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

একবার গালীলে যাওয়ার সময় ঈসা সামেরিয়া প্রদেশে থামেন। সেখানে একজন অ-ইহুদী খারাপ সামেরীয় স্ত্রী লোককে কূয়া থেকে পানিতে তুলতে দেখে তিনি তার কাছে পানি চান। কথার একপর্যায়ে, সেই স্ত্রী লোকটি যে ইতিমধ্যে পাঁচজন স্বামী বদল করেছেন এবং বর্তমানে সে যার সাথে থাকে সে লোক তার স্বামী নয়- একথা ঈসা তাকে বলেন। এতে সেই স্ত্রী লোকটি অবাক হন এবং ঈসাকে বলে "আমি এখন বুঝতে পারলাম আপনি একজন নবী।" (ইউহোন্না ৪:১৯)

"The woman said to Him, Sir, I perceive that You are a prophet." (John 4:19) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

ঈসা তখন সেই স্ত্রী লোকের কথার প্রতিবাদ করেননি। বলেননি যে, 'আমি নবী নই, আমি আল্লাহ্।'

গালিল সাগরের অন্য পাড়ে ঈসা যখন পাঁচটি রুটি প্রায় পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ালেন, তখন উপস্থিত লোকেরা বলেছিল, "দুনিয়াতে যে নবীর আসবার কথা আছে ইনি সত্যিই সেই নবী।" (ইউহোন্না ৬:১৪)

"Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, "This is truly the Prophet who is to come into the world." (John 6:14) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

ঈসা (আ.) তাদের কথার কোনো প্রতিবাদ করেননি। তার মানে তিনি নবী ছিলেন।

বিশ্রামবারে ঈসা এক অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন। এতে বিশ্রামবারের নিয়ম ভঙ্গ হওয়ায় ইহুদীরা ক্ষেপে যায় এবং সেই অন্ধ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি তার সমন্ধে কি বল? কারণ সে তো তোমার চোখ খুলে দিয়েছে।" লোকটি বলল, "তিনি একজন নবী।" (ইউহোন্না ৯:১৭)

"They said to the blind man again, "What do you say about Him because He opened your eyes?"
He said, "He is a prophet." (John 9:17) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

অর্থাৎ অন্যান্যরাও ঈসাকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করতেন।

ঈসা নায়িন গ্রামের এক বিধবার মৃত ছেলেকে জীবিত করেন, সেখানকার লোকেরা তখন বলেছে "আমাদের মধ্যে একজন মহান নবী উপস্থিত হয়েছেন।" (লূক ৭:১৬)

"Then fear came upon all, and they glorified God, saying, "A great prophet has risen up among us" (Luke 7:16) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

নবী হিসেবে ঈসা উম্মত সংগ্রহ করেছেন। যেমন, মথিকে বলেছেন, "এসো আমার উম্মত হও।" (মথি ৯:৯, আরো দেখুন, মার্ক ১:১৭-১৯, লূক ৫:১০, ২৭, ইউহোন্না ১:৩৯)

কুরআনে বলা হয়েছে, মারইয়ামের পুত্র ঈসা আল্লাহর নবী ও বান্দা ছিলেন। (সূরা নিসা ১৭১, সূরা মারইয়াম ৩০)

৭. ঈসা আল্লাহর গোলাম ছিলেন

কিতাবুল মোকাদ্দসে ‘আল্লাহর বাছাই করা বান্দা’ শিরোনামে আছে, নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে এই কথা বলা হয়েছিল, “আমার গোলাম ঈসা যাকে আমি বেছে নিয়েছি।” (মথি ১২:১৭-১৮)

“Here is my servant, whom I have chosen.” (Matthew 12:18) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

অন্যত্র আছে, মাবুদ বলেছেন, “দেখ আমার গোলাম, যাকে আমি সাহায্য করি; আমার বাছাই করা বান্দা যার উপর আমি সন্তুষ্ট।” (ইশাইয়া ৪২:১)

“Here is my servant, whom I uphold, my chosen, in whom my soul delights.” (Isaiah 42:1) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

“ঈসা বলেছেন, আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, গোলাম তার মালিক থেকে বড় নয়। যাকে পাঠানো হয়েছে সে তাঁর চেয়ে বড় নয়, যিনি তাকে পাঠিয়েছেন।” (ইউহোন্না ১৩:১৬)

“Most assuredly, I say to you, a servant is not greater than his master; nor is he who is sent greater than he who sent him.” (John 13:16) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

আরো বলা হয়েছে, “ঈসা গোলাম হয়ে এবং মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে সীমিত করে রাখলেন” (ফিলিপীয় ২:৭, আরো দেখুন, মথি ৮:২০, ৯:৬, ১১:১৯, ১৩:৩৭, ১৬:২৭, ১৭:৯, ১২, ১৯:২৮. ২০:১৮, ২৪:৩৪, ৩৯, ৪৪, ২৬:২, ইউহোন্না ৯:৩৫, ১২:৩৪, ১৩:৩১, ১ তিমথীয় ২:৫)

“But emptied himself, taking the form of a slave, being born in human likeness. And being found in human form.” (Philippians 2:7) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

ঈসার শিষ্যরাও বিশ্বাস করতেন যে, ঈসা আল্লাহর বান্দা ও গোলাম ছিলেন। “পিতর বললেন, ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের খোদা, অর্থাৎ আমাদের পূর্ব পুরুষদের খোদা, এই কাজ দ্বারা নিজের গোলাম ঈসার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।” (প্রেরিত ৩:১৩)

“The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, glorified His Servant Jesus.” **(**Acts 3:13) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

অন্যত্র আছে, “ঈসার শিষ্যরা সম্মিলিত দু'আর মধ্যে বলেছেন, তোমার পবিত্র গোলাম ঈসা (Your holy Servant Jesus), যাকে তুমি মসীহ হিসাবে নিযুক্ত করেছিলে।” (প্রেরিত ৪:২৭)

ত্রিত্ববাদ খণ্ডন

Trinity-এর সাধারণ অর্থ 'তিনত্ব', তিনের সমাহার বা তিনের সমষ্টি।

খ্রিষ্টধর্মের পরিভাষায় এর অর্থ এক ঈশ্বরতত্ত্বের মধ্যে **পিতা (God), পুত্র (যীশু) ও পবিত্র আত্মা (Holy Spirit)**- এই তিন ব্যক্তির মিলন। এই পরিভাষার জন্য বাংলায় 'ত্রিতত্ত্ব' ও 'ত্রিত্ব'; দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়। খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করেন, পিতা, পুত্র ও পাকরুহ (পবিত্র আত্মা)- এ তিনজন মিলে প্রকৃত স্রষ্টা। অর্থাৎ তিনজনে মিলে এক স্রষ্টা। তারা ত্রিত্বের ব্যাখ্যা করেন এভাবে- ১+১+১= ১ (পিতা+পুত্র+পাকরূহ= স্রষ্টা)।

তবে খ্রিষ্টান ধর্মগুরু ও পণ্ডিতগণ সহ সকলেই একমত যে, এই (Trinity) শব্দটি বাইবেলের পুরাতন বা নতুন নিয়মের কোথাও নেই। খ্রিষ্টের কোন বাক্যে কখনো এই শব্দটি বা এই অর্থের কোন শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। এমনকি খ্রিষ্টের প্রেরিতগণ, শিষ্যগণ বা তাদের শিষ্যগণও এই পরিভাষাটি কখনো ব্যবহার করেন নি। মূলত দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীতে এই পরিভাষাটির জন্ম। কে এই পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাও নিশ্চিতরূপে জানা যায় না।

খ্রিষ্টান ধর্মগুরুগণ মনে করেন যে, দ্বিতীয়-তৃতীয় খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু কার্থেজের প্রেসবিটার (Presbyter) টার্টোলিন (Tertullian), যিনি ২২০ খ্রিষ্টাব্দের পরে মৃত্যুবরণ করেন, তিনিই সর্বপ্রথম এই পরিভাষাটির ব্যবহার করেন। তখনো এই পরিভাষাটির অর্থ ও ব্যবহার স্পষ্ট ছিল না। সত্যিকার অর্থে বিগত ২০০০ বছরে কখনো এই পরিভাষাটির অর্থ স্পষ্ট হয়নি। খ্রিষ্ট ধর্মের মধ্যে অগণিত দল, উপদল, মতভেদ সবকিছুই মূলত এই বিশ্বাসটির ব্যাখ্যা নিয়ে। প্রথম খ্রিষ্টীয় শতকগুলোতে অনেক খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ই একেশ্বরবাদী ছিলেন। মানুষ ঈশ্বর হতে পারে বা ঈশ্বর মানুষের দেহ গ্রহণ করতে পারেন এইরূপ বিশ্বাস কখনোই ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে ছিল না।

তবে পৌত্তলিক রোমানগণের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস অতি-প্রচলিত ছিল। তারা সম্রাটকেও ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিভু হিসেবে পূজা করত। এছাড়া

গ্রীক দর্শনভিত্তিক রোমান ধর্মে ‘প্রজ্ঞা (Logos)’ কে ঈশ্বরের প্রকাশ বলে বিশ্বাস করা হতো।

পৌল ও প্রথম যুগের কিছু খ্রিষ্টান গুরু এত সকল বিশ্বাসকে ভিত্তি করে প্রথম ‘যীশুর’ ঈশ্বরত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। এরপর এই বিশ্বাসের সাথে একত্ববাদের সমন্বয় এবং যীশুর ঈশ্বরত্বের সাথে মানবত্বের সমন্বয় করার ক্রমাগত প্রচেষ্টার চূড়ান্ত রূপ হলো এই ত্রিত্ববাদ।

ভূমিকা

ত্রিত্ববাদ প্রমাণ করতে গিয়ে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা বাইবেল থেকে যে উদ্ধৃতি পেশ করেন, তা হলো, “তখন ঈসা কাছে এসে তাদের এই কথা বললেন, বেহেশতের ও দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে। এজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার উম্মত কর। পিতা, পুত্র ও পাকরুহের নামে তাদের তরিকাবন্দী দাও।” (মথি ২৮: ১৯)

কেউ আপনাকে বললেন যে, “লাল মিয়া, কালা মিয়া ও সবুজের যৌথ উদ্যোগে ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। তাই উল্লেখিত তিনজনের নামে আপনাকে আমি দাওয়াত করছি।” একথা শুনে, আপনি কি বুঝবেন যে, লাল মিয়া, কালা মিয়া ও সবুজ তিনজনে মিলে একই দেহ এবং একই সত্ত্বা! তিনজন নয়; ত্রিশজনের নামেও দাওয়াত হতে পারে, তার মানে এই নয় যে, তারা সকলে মিলে একই দেহ বা একই সত্ত্বা!

দ্বিতীয়ত: যদি আপনি ত্রিত্ত্ববাদ মানেন, তবে বাইবেলের যে সকল পদে একত্ববাদের স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? সেখানে তো ‘একমাত্র’ বলা আছে।

প্রথম বিষয়

নতুন নিয়মের অনেক স্থানেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। যোহন লিখিত সুসমাচারের ১ম অধ্যায়ের ১৮ পদে বলা হয়েছে :

“ঈশ্বরকে কেহ কখনো দেখে নাই।”

“No one has seen God at any time.” (John 1:18) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম প্রত্রের ৬ অধ্যায়ের ১৬ পদে বলা হয়েছে : “যাঁহোক, মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না।”

"....whom no man has seen or can see...." (1 Timothy 6:16) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

যোহনের প্রথম পত্রের ৪র্থ অধ্যায়ের ১২ পদে বলা হয়েছে: "ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই।"

"No one has seen God at any time." (1 John 4:12) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এ সকল পদ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যাকে দেখা যায় তিনি কখনোই ঈশ্বর হতে পারেন না, যদিও ঈশ্বরের বাক্যে বা ভাববাদিগণের বাক্যে বা প্রেরিতগণের বাক্যে তাঁর(যীশুর) বিষয়ে 'ঈশ্বর' বা অনুরূপ কোন শব্দ ব্যবহার করা হয়। কাজেই কারো বিষয়ে শুধু 'ঈশ্বর' বা অনুরূপ কোন শব্দের প্রয়োগ দেখেই ধোঁকাগ্রস্ত হয়ে তাঁকে ঈশ্বর বলে পূজা করা যায় না।

ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে যদি 'ঈশ্বর' বা অনুরূপ শব্দের প্রয়োগ করা হয়, তবে তার জন্য নির্ধারিত কোন কারণ বা সূত্র থাকে। যেমন, মোশির নামে প্রচলিত 'পাঁচ পুস্তকের' কোথাও কোথাও কোন কোন স্বর্গদূত বা ফিরিশতাকে ঈশ্বর বলা হয়েছে।

[ত্রিত্ববাদ খণ্ডন অধ্যায়ে পুরাতন নিয়মের ক্ষেত্রে ১৮৪৪ সালে লন্ডনে মুদ্রিত আরবী বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। আর নতুন নিয়মের ক্ষেত্রে ১৮৬০ সালে বৈরুতে মুদ্রিত আরবী বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে]

১ম প্রমাণ : ঈশ্বরের দূতকে ঈশ্বর বা সদাপ্রভু বলে আখ্যায়িত করা

আদিপুস্তকের ১৮ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনটি পুরুষ মম্রির এলোন বনের নিকট আব্রাহামকে দর্শন দেন। এই তিনটি পুরুষ ছিলেন ঈশ্বরের দূত বা ফিরিশতা। তাঁরা আব্রাহাম ও সারাকে "ইসহাকের' জন্মের সুসংবাদ প্রদান করেন এবং লোটের শহর সদোমের ধ্বংসের কথা জানান। এই স্থানে তিন দূতের মধ্যে একজন দূত যিনি আব্রাহামের সাথে কথোপকথন করেন, তাকে বারংবার ঈশ্বর বা সদাপ্রভু বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে ১৪ বার দূতের ক্ষেত্রে এই প্রকারের শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে।

"And the Lord went his way, when he had finished speaking to Abraham; and Abraham returned to his place." (Genesis 18:33) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

২য় প্রমাণ : ঈশ্বরের দূতকে ঈশ্বর বলে আখ্যায়িত করা

আদিপুস্তকের ৩২ অধ্যায়ে ঈশ্বরের সাথে যাকোবের মল্লযুদ্ধের বর্ণনায় বলা হয়েছে : "(২৪) আর যাকোব তথায় একাকী রহিলেন, এবং একজন পুরুষ প্রভাত পর্যন্ত তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন; (২৫) কিন্তু তাঁহাকে জয় করিতে পারিলেন না দেখিয়া, তিনি যাকোবের শ্রোণিফলকে আঘাত করিলেন। তাঁহার সহিত এইরূপ মল্লযুদ্ধ করাতে যাকোবের উরুফলক স্থানচ্যুত হইল। (২৬) পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হইল। যাকোব কহিলেন, আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না। (২৭) পুনশ্চ তিনি কহিলেন, তোমার নাম কি? তিনি উত্তর করিলেন, যাকোব। (২৮) তিনি কহিলেন, তুমি যাকোব নামে আর আখ্যাত হইবে না, কিন্তু ইস্রায়েল(ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধকারী) নামে আখ্যাত হইবে; কেননা তুমি ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ। (২৯) তখন যাকোব জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বিনয় করি, আপনার নাম কি? বলুন। তিনি বলিলেন, কি জন্য আমার নাম জিজ্ঞাসা কর? পরে তথায় যাকোবকে আশীর্বাদ করিলেন। (৩০) তখন যাকোব সেই স্থানের নাম পনূয়েল(ঈশ্বরের মুখ) রাখিলেন; কেননা তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বরকে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিলাম, তথাপি আমার প্রাণ বাঁচিল।" শমরীয় তোরাহে এখানে বলা হয়েছে: "আমি ঈশ্বরের দূতকে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিলাম।"

"So Jacob called the place Peniel saying, "For I have seen God face to face, and yet my life is preserved." (Genesis 32:30) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

এখানে যাকোবের সাথে যিনি মল্লযুদ্ধ করেছিলেন তাঁকে 'ঈশ্বর' বলা হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন একজন দূত বা ফিরিশতা। তিনটি বিষয় তা নিশ্চিত করে; প্রথমত, 'ঈশ্বরকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না' ইতোপূর্বে পাঠক তা জেনেছেন। দ্বিতীয়ত, এই মল্লযোদ্ধা যদি স্বয়ং ঈশ্বর বা সদাপ্রভু হন, তবে প্রমাণিত হবে যে,

তিনি অত্যন্ত দুর্বল ও অতি অক্ষম। কারণ তিনি সারারাত ধরে যাকোবের সাথে লড়াই করেও তাকে কূটকৌশল ছাড়া কাবু করতে পারেন নি। তৃতীয়ত, হোশেয় ভাববাদীর পুস্তকে স্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যাকোব মূলত দূতের সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিলেন।

৩য় প্রমাণ : ভাববাদীকে ঈশ্বর বলা

যাত্রাপুস্তকের ৭ম অধ্যায়ের ১ম পদটি নিম্নরূপ : "তখনও সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ, আমি ফরৌণের কাছে তোমাকে ঈশ্বর করিয়া[১০] নিযুক্ত করিলাম (I have made thee a god to pharaoh); আর তোমার ভ্রাতা হারোণ তোমার ভাববাদী হইবে।"

"So the LORD said to Moses: "See, I have made you as God to Pharaoh." (Exodus 7:1) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

যাত্রাপুস্তকের ৪র্থ অধ্যায়ের ১৬ পদে বলা হয়েছে: "তোমার পরিবর্তে সে লোকদের কাছে বক্তা হইবে; ফলতঃ সে তোমার মুখস্বরূপ হইবে এবং তুমি তাহার ঈশ্বর স্বরূপ হইবে।"

"So he shall be your spokesman to the people. And he himself shall be as a mouth for you, and you shall be to him as God." (Exodus 4:16) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এই পদদ্বয়ে মোশির ক্ষেত্রে 'ঈশ্বর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বা মোশিকে ঈশ্বর বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মোশির প্রতি প্রেমের দাবি এবং মোশিকে সকল ভাববাদীর উপরে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করা সত্ত্বেও ইহূদীগণ এই ধরনের পদের উপর নির্ভর করে মোশিকে ঈশ্বরের আসনে বসাননি।

৪র্থ প্রমাণ : সাধারণ মানুষকে ঈশ্বর বলা

---

১০. বাংলা বাইবেলে: "ঈশ্বর স্বরূপ করিয়া"; মূলত "স্বরূপ" শব্দটি অতিরিক্ত।

গীতসংহিতার আরবী অনুবাদের ৮১ গীত ও অন্যান্য অনুবাদের ৮২ গীতের ৬ পদে বলা হয়েছে: "আমিই বলিয়াছি, তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সকলে পরাৎপরের (মহান ঈশ্বরের) সন্তান।"

"I say, "You are gods, children of the Most High, all of you." (Psalm 82:6) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

এখানে শুধু বিশেষ মানুষদেরকেই নয়; গড়ভাবে সাধারণ মানুষদেরকে "ঈশ্বর" ও "ঈশ্বরের" পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫ম প্রমাণ : শয়তানকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করা

করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্রের 8 অধ্যায়ে রয়েছে: "কিন্তু আমাদের সুসমাচার যদি আবৃত থাকে, তবে যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদেরই কাছে আবৃত থাকে। তাহাদের মধ্যে এই যুগের ঈশ্বর (God of this world) অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করিয়াছে, যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যে খ্রিষ্ট তাঁহার গৌরবের সুসমাচারের দীপ্তি তাহাদের প্রতি উদয় না হয়।"

"In their case the god of this world has blinded the minds of the unbelievers, to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God." (2 Corinthians 4:4) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

প্রটেস্ট্যান্ট পণ্ডিতগণের ধারণা অনুসারে, এখানে God of this world বা 'এই যুগের ঈশ্বর' বলতে শয়তানকে বুঝানো হয়েছে। তাহলে দেখা গেল, শয়তানকেও ঈশ্বর বলা হয়েছে বাইবেলে।

প্রিয় পাঠক!

উপরের আলোচনা থেকে আপনি নিশ্চিত বুঝতে পেরেছেন যে, বাইবেলে 'ঈশ্বর', 'সদাপ্রভু' ইত্যাদি শব্দ অনেক সৃষ্টজীব, বস্তু বা কর্মের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এই জাতীয় কোন শব্দ যদি কোন মানুষ বা অনুরূপ কোন সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তাকে কোনভাবেই একজন জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান মানুষ এই সব শব্দের ভিত্তিতে প্রকৃত 'ঈশ্বর' বলে মনে করতে পারেন না। যার সৃষ্টি, পরিবর্তন, মানবীয় দুর্বলতা সুস্পষ্ট ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাকে এভাবে 'ঈশ্বর' বা 'সদাপ্রভু' বলার কারণে তাকে প্রকৃত

ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করার অর্থ হবে পবিত্র পুস্তকের সকল সুস্পষ্ট প্রমাণ, বাক্য, জ্ঞান ও বিবেকের সকল দাবি ও প্রমাণকে অস্বীকার করা।

দ্বিতীয় বিষয়

আদম থেকে মোশি পর্যন্ত কোন জাতিগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে 'ত্রিত্ববাদীয়' ধর্মবিশ্বাসের অস্তিত্ব ছিল না।

বাইবেলের মধ্যে এমন একটি বাক্যও নেই যা থেকে বুঝা যায় যে, খ্রিষ্টানগণের পূর্বে অন্য কোন জাতির মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল।

(মোশির ব্যবস্থা ও ধর্মবিশ্বাসে এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে যে ত্রিতত্ত্ববাদের অস্তিত্ব নেই তা সকলেই জানেন। এজন্য কোন পৃথক প্রমাণ পেশের প্রয়োজন নাই। যে কেউ প্রচলিত বাইবেলের পুরাতন নিয়ম (পঞ্চপুস্তক) পাঠ করলেই তা বুঝতে পারবেন।)

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণাদির মাধ্যমে ত্রিত্ববাদ খণ্ডন

প্রথম প্রমাণ

আমরা জানি যে, খ্রিষ্টানগণের নিকট একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ উভয়ই প্রকৃত ও বাস্তব সত্য।

একই বিষয়ে প্রকৃত 'তিন' ও প্রকৃত 'এক' একত্রিত হওয়ার দাবি করলে 'দুইটি প্রকৃত বিপরীত বিষয়' একত্রিত হওয়ার দাবি করা হবে।

প্রকৃত 'তিন' অথবা প্রকৃত 'একাধিক্য' দ্বারা নিঃসন্দেহে বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব বোঝায় এবং প্রকৃত 'এক' দ্বারা একত্ববাদ বা একেশ্বরবাদ বোঝায়। কাজেই যিনি ঈশ্বরকে প্রকৃত 'তিন' অর্থাৎ ত্রিত্বে বিশ্বাস করেন, তিনি কখনোই ঈশ্বরকে প্রকৃত 'এক' বলে বিশ্বাস করতে পারেন না অর্থাৎ প্রকৃত একেশ্বরবাদী বলে গণ্য হতে পারেন না।

তারা বলে থাকেন, "একথা ঠিক যে, প্রকৃত ত্রিত্ব ও প্রকৃত একত্ব দুইটি পরস্পর-বিরোধী বিষয় এবং তা একত্রিত হতে পারে না। কিন্তু তা সৃষ্টি জগতের ক্ষেত্রে। স্রষ্টা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তা পরস্পর-বিরোধী বিষয় নয়।"

দুইটি বিষয় যখন প্রকৃত বিরোধী বলে প্রমাণিত হয় তখন একই ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে একই সময়ে একই দিক থেকে তা একত্রিত হতে পারে না। একথা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন সত্য, স্রষ্টার ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। লক্ষ্য করুন:

(১) যা প্রকৃত 'এক' তার পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ এক-তৃতীয়াংশ থাকতে পারে না। কিন্তু 'তিন'-এর একটি পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে, তা হলো 'এক'।

(২) তিন হলো 'তিনটি এক'-এর সমষ্টি। 'প্রকৃত এক' কখনো একাধিক 'এক'-এর সমষ্টি হতে পারে না।

(৩) প্রকৃত 'এক' তিন-এর একটি অংশ। যদি একই বস্তু একই সময়ে 'তিন' ও 'এক' হয় তবে বুঝতে হবে যে, বস্তুটি একই সময়ে নিজেই পূর্ণ এবং নিজেই নিজের অংশ....। যা গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় প্রমাণ

তাঁরা দাবি করেন যে, ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে তিনটি পৃথক পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র সত্তা বিদ্যমান। যদি এই দাবি সঠিক হয় তাহলে যেমন একাধিক অনাদি সত্তার বিদ্যমানতা প্রমাণিত হবে, তেমনি এতে প্রমাণিত হবে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বরং ঈশ্বর আপেক্ষিক সমন্বয়ের নাম। কারণ একটি বস্তু যখন একাধিক স্বতন্ত্র সত্তার সংমিশ্রণে অস্তিত্ব লাভ করে, তখন তা তার অস্তিত্বের জন্য প্রতিটি অংশের মুখাপেক্ষী থাকে।

অনাদি, অনন্ত, চিরন্তন সত্তা ঈশ্বর কখনো কারো মুখাপেক্ষী হতে পারেন না।

খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস অনুসারে 'ঈশ্বর'-এর তিনটি অংশের প্রতিটি অংশই অন্য অংশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তা, যদিও তাঁরা সকলেই একটি 'সমষ্টির' অংশ। আর যদি প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র সত্তা হন এবং কেউ কারো মুখাপেক্ষী না হন তবে এইরূপ স্বতন্ত্র তিনের সমন্বয়ে কখনো প্রকৃত 'এক' গঠিত হতে পারে না।

কোন বস্তুর অংশ সেই বস্তুর পূর্ণরূপ হতে পারে না। এক্ষেত্রে পুর্ণরূপটি তার অংশগুলোর মুখাপেক্ষী। আর এইরূপ মুখাপেক্ষী বস্তু কখনোই অনাদি, অনন্ত ও চিরন্তন সত্তারূপে গণ্য হতে পারে না।

তৃতীয় প্রমাণ

যাকোবাইট খ্রিষ্টানগণের মতে "ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর কোন দেহও ছিল না এবং মানবীয় সত্তাও ছিল না। পরে তিনি দেহ গ্রহণ করেন এবং মানুষ রূপে প্রকাশিত হন।"

এই মতটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ঈশ্বরকে মানুষের রূপে বা অবতার রূপে নিজেকে প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন নেই।

যদি তাঁরা বলেন যে, ঈশ্বরের 'পুত্র' অংশ ঈশ্বরের 'সত্তা'-র মধ্যেও থাকলেন, আবার অবতরণ করে 'যীশু'-র দেহের সাথেও মিশে গেলেন, তবে তা বাতিল মত বলে গণ্য হবে। কারণ একই সত্তা কিভাবে দুই স্থানে অবতরণ করবেন?

আর যদি তাঁরা বলেন যে, তিনি ঈশ্বরের সত্তার মধ্যে তাঁর স্থান পরিত্যাগ করে যীশুর দেহ গ্রহণ করেন বা দেহের সাথে মিশ্রিত হয়ে যান, তবে এতে প্রমাণিত হবে যে, ঈশ্বরের সত্তা তাঁর একটি অংশ হারিয়ে ফেলেন। ঈশ্বরের একটি অংশ ঈশ্বর থেকে বের হয়ে চলে যায়, ফলে ঈশ্বরই তাঁর ঈশ্বরত্ব হারিয়ে ফেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খ্রিষ্টের বাক্যের দ্বারা ত্রিত্ববাদ খণ্ডন

প্রথম বাক্য

যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ের ৩ পদে যীশুখ্রিষ্ট ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলেছেন, "আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে যীশুখ্রিষ্টকে, জানিতে পায়।"

"And this is eternal life, that they may know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent." (John 17:3) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এখানে যীশু অনন্ত জীবন কী তা অতি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, অনন্ত জীবন হলো স্রষ্টাকে একমাত্র সত্য ঈশ্বর বা উপাস্য বলে জানা এবং যীশুখ্রিষ্টকে তাঁর প্রেরিত বলে জানা।

যীশু এ কথা বলেছিলেন ঈশ্বরকে সম্বোধন করে প্রার্থনার মধ্যে। যদি সত্যই 'ত্রিত্বে বিশ্বাসের' উপর অনন্ত জীবনের ভিত্তি হতো তবে নিশ্চয়ই তিনি এখানে উল্লেখ করতেন- 'ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা জানিবে তোমার সত্ত্বা তিনটি সম্পূর্ণ সত্ত্বার সমন্বয়'।

উপরের খ্রিষ্টীয় বাক্য থেকে প্রমাণিত হলো যে, অনন্ত জীবন হলো স্রষ্টার প্রকৃত একত্বে বিশ্বাস করা এবং খ্রিষ্টের প্রেরিতত্বে বিশ্বাস করা।

দ্বিতীয় বাক্য

মার্ক লিখিত সুসমাচারের ১২ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "(২৮) আর অধ্যাপকদের একজন নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে তর্ক বিতর্ক করিতে শুনিয়া, এবং যীশু তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ উত্তর দিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সকল আজ্ঞার মধ্যে কোনটি প্রথম? (২৯) যীশু উত্তর করিলেন, প্রথমটি এই, 'হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু; (৩০) আর তুমি

তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে। (৩২) অধ্যাপক তাঁহাকে কহিল, বেশ, গুরু, আপনি সত্য বলিয়াছেন যে, তিনি এক এবং তিনি ব্যতীত অন্য নাই; (৩৩) আর সমস্ত অন্তঃকরণ, সমস্ত বুদ্ধি ও সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁহাকে প্রেম করা এবং প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করা সমস্ত হোম ও বলিদান হইতে শ্রেষ্ঠ। (৩৪) তখন সে বুদ্ধিপূর্বক উত্তর দিয়াছে দেখিয়া যীশু তাহাকে কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য হইতে তুমি দূরবর্তী নও।"

"Then one of the scribes came, and having heard them reasoning together, perceiving that He had answered them well, asked Him, "Which is the first commandment of all?"
Jesus answered him, "The first of all the commandments is: 'Hear, O Israel, the LORD our God, the LORD is one. And you shall love the LORD your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.' This is the first commandment. And the second, like it, is this: 'You shall love your neighbor as yourself.' There is no other commandment greater than these."
So the scribe said to Him, "Well said, Teacher. You have spoken the truth, for there is one God, and there is no other but He. And to love Him with all the heart, with all the understanding, with all the soul, and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself, is more than all the whole burnt offerings and sacrifices."
Now when Jesus saw that he answered wisely, He said to him, "You are not far from the kingdom of God." (Mark 12:28-34) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এ থেকে একটি বাস্তব মহাসত্য জানা গেল। ঈশ্বরের রাজ্যের নৈকট্যের মূল কারণ হলো একত্ববাদ, অর্থাৎ একথা বিশ্বাস করা যে, ঈশ্বর একমাত্র উপাস্য এবং তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই।

যদি ত্রিত্ববাদের উপরে মুক্তি নির্ভর করতো, তবে নিশ্চয়ই তা পঞ্চপুস্তক ও অন্য সকল ভাববাদীর গ্রন্থে প্রথম আজ্ঞা হিসেবে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হতো।

দ্বিতীয় বিবরণের ৪র্থ অধ্যায়ে রয়েছে, “(৩৫) সদাপ্রভুই ঈশ্বর, তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই, ইহা যেন তুমি জ্ঞাত হও... ।”

“To you it was shown so that you would acknowledge that the Lord is God; there is no other besides him.” (Deuteronomy 4:35) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

উক্ত গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে, “(৪) হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু; (৫) আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে।”

“Hear, O Israel: The LORD our God, the LORD is one! You shall love the LORD your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength.” (Deuteronomy 6:4-5) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকের ৪৫ অধ্যায়ে রয়েছে, “(৫) আমিই সদাপ্রভু, আর কেহ নয়; আমি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই; তুমি আমাকে না জানিলেও আমি তোমার কটি বদ্ধ করিব; (৬) যেন সূর্যোদয়ের স্থানাবধি(পূর্ব থেকে) পশ্চিম দিক পর্যন্ত লোকে জানিতে পারে যে, আমি ব্যতীত অন্য নাই; আমিই সদাপ্রভু, আর কেহ নয়।”

“I am the Lord, and there is no other; besides me there is no god. I arm you, though you do not know me, so that they may know, from the rising of the sun and from the west, that there is no one besides me; I am the Lord, and there is no other.” (Isaiah 45:5-6) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

তাহলে জানা গেল যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল মানুষকে মুক্তির জন্য জানতে হবে যে, ঈশ্বর এক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই।

যিশাইয় পুস্তকের ৪৬ অধ্যায়ের ৯ পদে বলা হয়েছে; “আমিই ঈশ্বর, আর কেহ নয়; আমি ঈশ্বর, আমার তুল্য কেহ নাই।”

“for I am God, and there is no other; I am God, and there is no one like me.” (Isaiah 46:9) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

তৃতীয় বাক্য

মার্ক লিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ের ৩২ পদে বলা হয়েছে, "কিন্তু সেই দিনের বা সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না; স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।"

"But about that day or hour no one knows, neither the angels in heaven, nor the Son, but only the Father." (Mark 13:32) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

যীশু এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, কিয়ামত বা বিনাশ দিবসের জ্ঞান একমাত্র ঈশ্বরের আছে, আর কারো নেই। অন্য সকল সৃষ্টির সাথে তাঁর নিজেকেও তিনি এই জ্ঞান থেকে বঞ্চিত বলে উল্লেখ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনিও অন্য সকল সৃষ্টির সমান বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

যদি তিনি ঈশ্বর হতেন তবে এ কথা বলা কখনোই সম্ভব ছিল না।

চতুর্থ বাক্য

মথি লিখিত সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ে রয়েছে, "(২০) তখন সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা আপনার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রণিপাতপূর্বক তাঁহার কাছে কিছু যাচঞা করিলেন। (২১) তিনি তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি চাও? তিনি কহিলেন, আজ্ঞা করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই পুত্রের এক জন আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে, আর একজন বাম পার্শ্বে, বসিতে পায়। (২২) কিন্তু যীশু উত্তর করিয়া কহিলেন, ... (২৩)... কিন্তু যাহাদের জন্য তাহার পিতা কর্তৃক স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাদের ভিন্ন আর কাহাকেও আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বা বাম পার্শ্বে বসিতে দিতে আমার অধিকার নাই।"

"...but to sit at my right hand and at my left, this is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared by my Father." (Matthew 20:23) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

এখানে যীশু তার অধিকার ও ক্ষমতা অস্বীকার করলেন এবং একমাত্র ঈশ্বরেরই সকল ক্ষমতা, তা ঘোষণা করলেন। তিনি ঈশ্বর হলে নিশ্চয় তার নিজের অধিকার ও ক্ষমতা স্বীকার করতেন।

পঞ্চম বাক্য

মথি লিখিত সুসমাচারের ১৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "(১৬) আর দেখো, এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হে সৎ গুরু, অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আমি কিরুপ সৎকর্ম করিব? (১৭) তিনি তাহাকে কহিলেন, আমাকে কেন সৎ কহিতেছেন? একজন ব্যতীত আর কেউই সৎ নন, তিনি ঈশ্বর।"[১১]

"So He said to him, "Why do you call Me good? No one is good but One, that is, God." (Matthew 19:17) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

যীশু বিনয়ভরে নিজেকে সৎ বলতেও আপত্তি করেছেন। তিনি ঈশ্বর হলে তাঁর উপর দায়িত্ব ছিল যে, তিনি বলবেন, "পিতা এবং আমি এবং পবিত্র-আত্মা ছাড়া আর কেউই সৎ নন।"

ষষ্ঠ বাক্য

মথি লিখিত সুসমাচারের ২৭ অধ্যায়ে রয়েছে, "(৪৬) আর নয় ঘটিকার সময়ে যীশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া ডাকিয়া কহিলেন, এলী এলী লামা শবকতানী অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?"

"And about the ninth hour Jesus cried out with a loud voice, saying, "Eli, Eli, lama sabachthani?" that is, "My God, My

---

১১. বাংলা বাইবেলে এই পদদ্বয়ের অনুবাদ অন্যভাবে করা হয়েছে।

১৯৯২ সালে মুদ্রিত আরবী বাইবেলের ভাষ্য একইরূপ। পক্ষান্তরে বাংলা বাইবেলের ভাষা নিম্নরূপ: "(১৬) আর দেখো, এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হে গুরু, অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আমি কিরূপ সৎকর্ম করিব? (১৭) তিনি তাহাকে কহিলেন, আমাকে সৎ-এর বিষয়ে কেন জিজ্ঞাসা করো? সৎ একজন মাত্র আছেন।" এখানে অনুবাদের পরিবর্তন লক্ষণীয়।

God, why have You forsaken Me?” (Matthew 27:46) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

যীশু যদি ঈশ্বরই হতেন তবে ‘ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?’ বলে অন্য কোন ঈশ্বরের নিকট তিনি ত্রাণ বা সাহায্য প্রার্থনা করতেন না। কারণ ঈশ্বর এরূপ অসহায় হতে পারেন না।

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে যীশু যাঁর কাছে ত্রাণ প্রার্থনা করে চিৎকার করেছিলেন তিনিই হলেন প্রকৃত ও সত্য ঈশ্বর।

বাইবেল অনুসারে ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, যাকে কোন ক্লান্তি, শ্রান্তি বা দুর্বলতা স্পর্শ করতে পারে না, যিনি চিরঞ্জীব, পবিত্রতম।

যিশাইয়র ৪০ অধ্যায়ের ২৮ পদে বলা হয়েছে, “তুমি কি জ্ঞাত হও নাই? তুমি কি শুন নাই? অনাদি অনন্ত ঈশ্বর, সদাপ্রভু, পৃথিবীর প্রান্ত সকলের সৃষ্টিকর্তা ক্লান্ত হন না, শ্রান্ত হন না; তাঁহার বুদ্ধির অনুসন্ধান করা যায় না।”

“Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the LORD, The Creator of the ends of the earth, Neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable.” (Isaiah 40:28) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

উক্ত গ্রন্থের ৪৪ অধ্যায়ের ৬ পদে রয়েছে, “সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের রাজা, তাহার মুক্তিদাতা; বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমিই আদি, আমিই অন্ত, আমি ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর নাই।”

“I am the First and I am the Last; Besides Me there is no God.” (Isaiah 44:6) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

যিরমিয়ের ১০ অধ্যায়ের ১০ পদে রয়েছে, “কিন্তু সদাপ্রভু সত্য ঈশ্বর; তিনিই জীবন্ত (living) ঈশ্বর ও অনন্ত কালস্থায়ী রাজা.... ।”

“But the LORD is the true God; He is the living God and the everlasting King.” (Jeremiah 10:10) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

হাবাক্কুক ১ম অধ্যায়ের ১২ পদে রয়েছে, "হে সদাপ্রভু, আমার ঈশ্বর, আমার পবিত্রতম, তুমি কি অমর নহ? (অনাদিকাল হইতে নহ?)"

"Are You not from everlasting, O LORD my God, my Holy One." (Habakkuk 1:12) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

১ম তিমথীয়ের ১ম অধ্যায়ের ১৭ পদে বলা হয়েছে, "যিনি যুগ পর্যায়ের রাজা, অক্ষয় (Immortal) অদৃশ্য একমাত্র ঈশ্বর... ।"

"To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever." (1 Timothy 1:17) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

সপ্তম বাক্য

যোহন লিখিত সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ের ১৭ পদে উল্লেখ করা হয়েছে, মগ্দলীনী মরিয়মকে সম্বোধন করে যীশু বলেন, "আমাকে স্পর্শ করিও না, কেননা এখনও আমি ঊর্ধ্বে পিতার নিকটে যাই নাই; কিন্তু তুমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে আমি ঊর্ধ্বে যাইতেছি।"

"Jesus said to her, "Do not cling to Me, for I have not yet ascended to My Father; but go to My brethren and say to them, 'I am ascending to My Father and your Father, and to My God and your God." (John 20:17) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এখানে যীশু ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর নিজেকে অন্য সকল মানুষের সমান বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর"। তিনি সুস্পষ্টভাবে বললেন যে, তাঁর শিষ্যরাও তাঁরই মত ঈশ্বরের পুত্র। অর্থাৎ তারাও যেমন ঈশ্বরের প্রকৃত পুত্র নয়, বরং রূপক অর্থে 'ঈশ্বরের দাস' অর্থে ঈশ্বরের পুত্র, তিনিও ঠিক তেমনি রূপক অর্থে 'ঈশ্বরের দাস' অর্থে

ঈশ্বরের পুত্র; প্রকৃত অর্থে নন। ঈশ্বর যেমন তাদের সকলের ঈশ্বর, ঠিক তেমনিভাবে তিনি তাঁরও ঈশ্বর।

নবম বাক্য

যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ের ২৪ পদে যীশুর নিম্নের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, "আর তোমরা যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ, তাহা আমার নয়, কিন্তু পিতার, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

"He who does not love Me does not keep My words; and the word which you hear is not Mine but the Father's who sent Me." (John 14:24) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এখানেও যীশু স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তিনি ঈশ্বর নন, বরং ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং তাঁর মুখ থেকে যে বাক্য তারা শুনেছে তা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহী অর্থাৎ প্রত্যাদেশ বা প্রেরণা।

দশম বাক্য

মথি লিখিত সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেন, "(৯) আর পৃথিবীতে কাহাকেও 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিও না, কারণ তোমাদের পিতা এক জন। (১০) তোমরা 'আচার্য' বলিয়া সম্ভাষিত হইও না, কারণ তোমাদের আচার্য এক জন, তিনি খ্রিষ্ট।"

এখানে যীশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করা হয়েছে এবং তাঁর প্রেরিতত্ব প্রমাণ করা হয়েছে। যীশু স্পষ্টতই বলেছেন, সকলের পিতা বা ঈশ্বর একজনই আর তিনি আচার্য বা শিক্ষক মাত্র।

একাদশ বাক্য

মথি লিখিত সুসমাচারের ২৬ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, "তখন যীশু তাঁহাদের সহিত গেৎশিমানী নামক এক স্থানে গেলেন, আর আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, আমি যতক্ষণ ঐখানে গিয়া প্রার্থনা করি, ততক্ষণ তোমরা এইখানে বসিয়া থাক। (৩৭) পরে তিনি পিতরকে এবং সিবদিয়ের দুই

পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, আর দুঃখার্ত ও ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। (৩৮) তখন তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হইয়াছে; তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জাগিয়া থাক। (৩৯) পরে তিনি কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া উবুড় হইয়া পড়িয়া প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দুরে যাউক; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক। (৪০) পরে তিনি সেই শিষ্যদের নিকটে আসিয়া দেখিলেন... (৪২) পুনরায় তিনি দ্বিতীয় বার গিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, হে আমার পিতঃ, আমি পান না করিলে যদি ইহা দূরে যাইতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক। (৪৩) পরে তিনি আবার আসিয়া দেখিলেন... (৪৪) আর তিনি পুনরায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়া তৃতীয় বার পূর্বমত কথা বলিয়া প্রার্থনা করিলেন।"

"And He took with Him Peter and the two sons of Zebedee, and He began to be sorrowful and deeply distressed. Then He said to them, "My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with Me." He went a little farther and fell on His face, and prayed, saying, "O My Father, if it is possible, let this cup pass from Me; nevertheless, not as I will, but as You will." (Matthew 26:37-39) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

উপরের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত যীশুর অবস্থা ও কথাগুলো সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি ঈশ্বর ছিলেন না, বরং ঈশ্বরের দাস ও মানুষ ছিলেন। ঈশ্বর কি কখনো দুঃখার্ত, বেদনার্ত ও আকুল হতে পারেন? ঈশ্বর কি মৃত্যুবরণ করেন? ঈশ্বর কি অন্য ঈশ্বরের কাছে এভাবে আকুল আবেগ ও কাতরতা নিয়ে প্রার্থনা করেন? কখনোই নয়।

সর্বোপরি, খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস অনুসারে যীশু ঈশ্বর ছিলেন, তাঁর রক্ত দিয়ে বিশ্ববাসীকে নরক থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই তিনি দেহ গ্রহণ করে এই বিশ্বে এসেছিলেন। তাহলে এই দুঃখ, বেদনা ও আহাজারির অর্থ কী? আর সম্ভব হলে এই পানপাত্র দূরীভূত করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনারই বা অর্থ কী?

দ্বাদশ বাক্য

যীশুর অভ্যাস ছিল, তিনি যখন নিজের সম্পর্কে বলতেন তখন নিজেকে 'মনুষ্যপুত্র' (son of man) বলে উল্লেখ করতেন। সুসমাচারগুলো বা প্রচলিত নতুন নিয়মের পুস্তকগুলো পাঠ করলে বিষয়টি খুবই সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ শুধু মথি লিখিত সুসমাচার থেকেই কয়েকটি স্থানের উল্লেখ করছি; ৮ অধ্যায়ের ২০ পদ, ৯ অধ্যায়ের ৬ পদ, ১৬ অধ্যায়ের ১৩ ও ২৭ পদ, ১৭ অধ্যায়ের ৯, ১২ ও ২২ পদ, ১৮ অধ্যায়ের ১১ পদ, ১৯ অধ্যায়ের ২৮ পদ, ২০ অধ্যায়ের ১৮ ও ২৮ পদ, ২৪ অধ্যায়ের ২৭ পদ, ২৬ অধ্যায়ের ২৪, ৩৫ ও ৬৪ পদ।

বাহ্যত 'মনুষ্যপুত্র' মানুষ ছাড়া আর কিছুই হতে পারেন না।

[হিব্রু বা সেমিটিক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভু অর্থে ঈশ্বরকে 'পিতা' বলার প্রচলন ছিল। তেমনিভাবে মানুষদেরকে বা ঈশ্বরের প্রিয় মানুষদেরকে 'ঈশ্বরের পুত্র' বলার প্রচলন ছিল। এই অর্থে যীশুও ঈশ্বরকে পিতা বলতেন। তবে মানুষ যেন অতি ভক্তির কারণে তাঁকে প্রকৃত অর্থে "ঈশ্বরের পুত্র' বলে শির্ক বা অংশীদারিতায় নিপতিত না হতে পারে, এজন্য তিনি নিজেকে সর্বদা 'মনুষ্যপুত্র' বলে আখ্যায়িত করতেন।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বের পক্ষে পেশকৃত বাক্যাবলির অসারতা প্রমাণ

প্রথম দলিল

যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে পেশকৃত প্রথম দলিল হলো, বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে যীশুর ক্ষেত্রে 'ঈশ্বরের পুত্র' (Son of God) কথাটির প্রয়োগ।

দু'টি কারণে এই দলিলটি গ্রহণযোগ্য নয় :

প্রথমত, 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটির বিপরীতে বাইবেলে বারংবার যীশুকে 'মনুষ্য পুত্র' (Son of man) বলা হয়েছে যা পাঠক ইতোপূর্বে জানতে পেরেছেন। এছাড়া তাঁকে বারংবার 'দাউদের পুত্র' বা 'দাউদ সন্তান' (Son of David) বলেও অভিহিত করা হয়েছে। (দেখুন মথি ১/১, ৯/২৭, ১২/২৩, ১৫/২২, ২০/৩০, ৩১, ২১/৯, ১৫, ২২/৪২; মার্ক ১০/৪৭, ৪৮, লূক ১৮/৩৮, ৩৯)

দ্বিতীয়ত, 'ঈশ্বরের পুত্র' (Son of God) কথাটির মধ্যে 'পুত্র' শব্দটি কখনোই তার প্রকৃত ও আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। কারণ সকল জ্ঞানী একমত যে, আভিধানিক ও প্রকৃত অর্থে পুত্র বলতে বুঝানো হয় পিতামাতা উভয়ের জৈবিক মিলনের মাধ্যমে যার জন্ম। এ অর্থ 'ঈশ্বরের পুত্র' (Son of God)-এর ক্ষেত্রে কোনভাবেই প্রযোজ্য হতে পারে না।

বরং 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটি যীশুর ক্ষেত্রে 'ধার্মিক' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

বাইবেলে বিভিন্ন স্থানে যীশু ছাড়া অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, যেমনভাবে 'পাপী'র ক্ষেত্রে 'দিয়াবলের পুত্র' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

মথি লিখিত সুসমাচারের ৫ অধ্যায়ে রয়েছে, “(৯) ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারণ তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আখ্যাত হইবে।... (৪৪) কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও; (৪৫) যেন তোমরা আপনাদের পিতার সন্তান হও... ।”

“Blessed are the peacemakers, For they shall be called sons of God.” (Matthew 5:9)

“But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father...” (Matthew 5:44-45)

(**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

যোহন লিখিত সুসমাচারের ৮ম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদীগণ ও খৃস্টের মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হয় : “(৪১) তোমাদের পিতার কার্য তোমরা করিতেছ। তাহারা তাঁহাকে কহিল, আমরা ব্যভিচারজাত নহি; আমাদের একমাত্র পিতা আছেন, তিনি ঈশ্বর। (৪২) যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হইতেন, তবে তোমরা আমাকে প্রেম করিতে... (৪৪) তোমরা তোমাদের পিতা দিয়াবলের এবং তোমাদের পিতার অভিলাষ সকল পালন করাই তোমাদের ইচ্ছা; সে আদি হইতেই নরঘাতক, সত্যে থাকে নাই, কারণ তাহার মধ্যে সত্য নাই। সে যখন মিথ্যা বলে, তখন আপনা হইতেই বলে, কেননা সে মিথ্যাবাদী ও তাহার পিতা।”

“You do the deeds of your father.” Then they said to Him, “We were not born of fornication; we have one Father-God.” Jesus said to them, “If God were your Father, you would love Me....” (John 8:41-42)

“You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it.” (John 8:44)

(**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এখানে আমরা দেখছি যে, ইহুদীগণ দাবি করেন যে, একমাত্র একজনই তাদের পিতা, তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। যীশু তাদেরকে বললেন; না, বরং তোমাদের পিতা হলো দিয়াবল।

এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, দিয়াবল তাদের প্রকৃত পিতা নয়। পুত্র শব্দটি এখানে প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

ইহুদীদের বক্তব্যের অর্থ হলো, আমরা ধার্মিক ও ঈশ্বরের আদেশ পালনকারী। আর যীশুর কথার অর্থ হলো, তোমরা ধার্মিক ও ঈশ্বরের আদেশ পালনকারী নও, বরং তোমরা অধার্মিক ও দিয়াবলের আদেশ পালনকারী।

যোহনের প্রথম পত্রের ৩ অধ্যায়ে রয়েছে, "(৯) যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপাচরণ করে না।"

"Whoever has been born of God does not sin..." (1 John 3:9) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

উক্ত পত্রের ৫ অধ্যায়ে রয়েছে, "(১) যে কেহ বিশ্বাস করে যে, যীশুই সেই খ্রিষ্ট, সে ঈশ্বর হইতে জাত।"

"Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God." (1 John 5:1) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

রোমীয় ৮ অধ্যায়ের ১৪ পদে বলা হয়েছে, "কেননা যত লোক ঈশ্বরের আজ্ঞা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র।"

"For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God." (Romans 8:14) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

ফিলিপীয় ২ অধ্যায়ে রয়েছে, "(১৪) তোমরা বচসা ও তর্কবিতর্ক বিনা সমস্ত কার্য কর, (১৫) যেন তোমরা অনিন্দনীয় ও অমায়িক হও, এই কালের সেই কুটিল ও বিপথগামী লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও।"

"Do all things without complaining and disputing, that you may become blameless and harmless, children of God without

fault in the midst of a crooked and perverse generation." (Philippians 2:14-15) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

উপরে উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলো সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে, 'ঈশ্বরের পুত্র' কথাটি যীশু ও অন্যান্য ব্যক্তি; যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা দ্বারা চালিত হয় তাদের ক্ষেত্রে 'ধার্মিক' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এছাড়া আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়। বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোতে **'পিতা'** ও **'ঈশ্বর পুত্র'** শব্দদ্বয়কে অসংখ্য ও অগণিত স্থানে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি উদ্ধৃতি প্রদান করছি।

প্রথম : লূক তাঁর সুসমাচারের ৩ অধ্যায়ে খৃষ্টের বংশাবলি বর্ণনা করতে যেয়ে বলেছেন, "আদম **ঈশ্বরের পুত্র**।" (লূক ৩/২৩-৩৮)

দ্বিতীয় : যাত্রাপুস্তক ৪ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঈশ্বর সদাপ্রভু, মোশিকে নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করেন, "(২২) আর তুমি ফরৌণকে কহিবে, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, **ইস্রায়েল আমার পুত্র**, আমার প্রথমজাত। (২৩) আর আমি তোমাকে বলিয়াছি, আমার সেবা করণার্থে আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দেও; কিন্তু তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অসম্মত হইলে; দেখ, আমি তোমার পুত্রকে, তোমার প্রথমজাতকে, বধ করিব।"

"Then you shall say to Pharaoh, 'Thus says the LORD: "Israel is My son, My firstborn. So I say to you, let My son go that he may serve Me. But if you refuse to let him go, indeed I will kill your son, your firstborn." (Exodus 4:22-23) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এখানে দুই স্থানে 'ইস্রায়েল'-কে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে, উপরন্তু তাকে প্রথমজাত পুত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

তৃতীয় : গীতসংহিতার ৮৮ (প্রচলিত বাইবেলে ৮৯) গীতে দায়ূদ সদাপ্রভু ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলেছেন, "(১৯) একদা তুমি নিজ সাধুকে দর্শন দিয়া কথা কহিয়াছিলে, বলিয়াছিলে, আমি সাহায্য করিবার ভার একজন বীরকে সমর্পণ করিয়াছি, আমি প্রজাদের মধ্যে মনোনীত একজনকে উন্নত করিয়াছি। (২০) আমার দাস দায়ূদকেই পাইয়াছি, আমার পবিত্র তৈলে তাহাকে অভিষিক্ত করিয়াছি। (২৬) সে আমাকে ডাকিয়া বলিবে, তুমি **আমার পিতা**, আমার ঈশ্বর (Thou art my father, my God), ও আমার পরিত্রাণের শৈল। (২৭) আবার আমি তাহাকে **প্রথমজাত** করিব, পৃথিবীর রাজগণ হইতে সর্বোচ্চ করিয়া নিযুক্ত করিব।"

"Then you spoke in a vision to your faithful one, and said: "I have set the crown on one who is mighty, I have exalted one chosen from the people. I have found my servant David; with my holy oil I have anointed him. He shall cry to me, 'You are my Father, my God, and the Rock of my salvation!' I will make him the firstborn, the highest of the kings of the earth." (Psalm 89:19-20, 26-27) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

এখানে দায়ূদকে বীর (Mighty), মনোনীত (Chosen) ও ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র (Firstborn) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

চতুর্থ : যিরমিয় ৩১ অধ্যায়ের ৯ পদে ঈশ্বরের নিম্নোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, "যেহেতু আমি ইস্রায়েলের **পিতা** এবং ইফ্রয়িম আমার **প্রথমজাত পুত্র**।"

"For I am a Father to Israel, And Ephraim is My firstborn." (Jeremiah 31:9) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এখানে যোষেফের দ্বিতীয় পুত্র ইফ্রয়িমকে ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। কাজেই, কারো ক্ষেত্রে 'ঈশ্বরের পুত্র' বা অনুরূপ শব্দ বলা হলে যদি তাতে তার ইশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়, তবে ইস্রায়েল, দায়ূদ ও ইফ্রয়িমই ঈশ্বরত্বের বেশি অধিকারী; কারণ তাদেরকে 'ঈশ্বরের প্রথমজাত পুত্র' বলা হয়েছে। আর আবরাহাম, মোশি ও অন্যান্য পূর্ববর্তী

ভাববাদীদের ব্যবস্থা অনুসারে প্রথমজাত পুত্রই সম্মান ও মর্যাদার সর্বাধিক অধিকার ভোগ করেন।

এখানে খ্রিষ্টানগণ বলতে পারেন যে, যীশুকে নতুন নিয়মের কোন কোন পুস্তকে 'ঈশ্বরের একজাত পুত্র (Only begotten son)' বলা হয়েছে। এতে তাঁর বিশেষত্ব বুঝা যায়। কিন্তু আমরা বলব যে, এক্ষেত্রে 'একজাত' বা 'একমাত্র' শব্দটি কখনোই তার প্রকৃত অর্থে গৃহীত হতে পারে না। কারণ স্বয়ং ঈশ্বর এই 'একজাত পুত্রের' আরো অনেক ভাইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে তিনজনকে 'প্রথমজাত' বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই 'পুত্র' বা 'প্রথমজাত' শব্দের ন্যায় 'একজাত' শব্দটিও রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পঞ্চম : ২ শমূয়েল ৭ অধ্যায়ে শলোমনের বিষয়ে ঈশ্বরের নিম্নোক্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, "আমি তাহার **পিতা** হইব ও সে আমার **পুত্র** হইবে।" "I will be his Father, and he shall be My son." (2 Samuel 7:14) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

যদি কারো সম্পর্কে 'ঈশ্বরের পুত্র' বললে তার ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়, তবে ঈশ্বরত্বের বিষয়ে যীশুর চেয়েও শলোমনের দাবি অধিক জোরালো বলে প্রমাণিত হবে, কারণ শলোমন যীশুর পূর্ববর্তী এবং তাঁর পিতামহদের অন্যতম।

ষষ্ঠ : দ্বিতীয় বিবরণের ১৪ অধ্যায়ের ১ পদে, হোশেয় ১ অধ্যায়ের ১০ পদে ইস্রায়েল সন্তানদের সকলকেই 'ঈশ্বরের পুত্র' বা 'ঈশ্বরের সন্তান' (children of the LORD) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সপ্তম : যিশাইয় ৬৩ অধ্যায়ের ১৬ পদে ঈশ্বরকে সম্বোধন করে যিশাইয় ভাববাদী বলেছেন, "তুমি তো আমাদের পিতা; যদ্যপি আব্রাহাম আমাদিগকে জানেন না ও ইস্রায়েল আমাদিগকে স্বীকার করেন না, তথাপি তুমি সদাপ্রভু **আমাদের পিতা**, অনাদিকাল হইতে আমাদের মুক্তিদাতা, এই তোমার নাম।"

"Doubtless You are our Father, Though Abraham was ignorant of us, And Israel does not acknowledge us. You, O LORD, are our Father; Our Redeemer from Everlasting is Your name." (Isaiah 63:16) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

উক্ত পুস্তকের ৬৪ অধ্যায়ের ৮ পদে বলা হয়েছে, "কিন্তু এখন, হে সদাপ্রভু, তুমি **আমাদের পিতা**।"

"But now, O LORD, You are our Father." (Isaiah 64:8) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এভাবে যিশাইয় ভাববাদী তাঁর নিজের ও সকল ইস্রায়েলীয়দের বিষয়ে বললেন যে, 'ঈশ্বর আমাদের পিতা'।

অষ্টম : ইয়োব ৩৮ অধ্যায়ের ৭ পদে রয়েছে, "তৎকালে প্রভাতীয় নক্ষত্রগণ একসঙ্গে আনন্দরব করিল, **ঈশ্বরের পুত্রগণ** সকলে জয়ধ্বনি করিল।"

"When the morning stars sang together, And all the sons of God shouted for joy?" (Job 38:7) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

নবম : গীতসংহিতার ৬৭ (পরবর্তী সংস্করণে ৬৮) গীতের ৫ পদে বলা হয়েছে, "ঈশ্বর আপন পবিত্র বাসস্থানে **পিতৃহীনদের পিতা** ও বিধবাদের বিচারকর্তা।"

"A father of the fatherless, a defender of widows, Is God in His holy habitation." (Psalm 68:5) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এখানে ঈশ্বরকে পিতৃহীনদের পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দশম : আদি পুস্তকের ৬ অধ্যায়ে রয়েছে, "(২) তখন **ঈশ্বরের পুত্রেরা** মনুষ্যদের কন্যাগণকে সুন্দরী দেখিয়া যাহার যাহাকে ইচ্ছা, সে তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল। (৪) তৎকালে পৃথিবীতে মহাবীরগণ ছিল এবং

তৎপরেও ঈশ্বরের পুত্রেরা মনুষ্যদের কন্যাদের নিকটে গমন করিলে তাহাদের গর্ভে সন্তান জন্মিল, তাহারাই সেকালের প্রসিদ্ধ বীর।"

"that the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful; and they took wives for themselves of all whom they chose." (Genesis 6:2)
"There were giants on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of men and they bore children to them. Those were the mighty men...." (Genesis 6:4)
(**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এখানে 'ঈশ্বরের পুত্রেরা' বলতে অভিজাতদের পুত্রদেরকে বুঝানো হয়েছে। আর 'মনুষ্যদের কন্যাগণ' বলতে সাধারণ মানুষদের কন্যাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এজন্য **১৮১১** খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত আরবী অনুবাদে অনুবাদক প্রথম পদটির অনুবাদে লিখেছেন, "(২) তখন **অভিজাতদের পুত্রেরা** সাধারণ মানুষদের কন্যাগণকে সুন্দরী দেখিয়া যাহারা যাহাকে ইচ্ছা, সে তাহাকে বিবাহ করিতে লাগিল।"

এভাবে আমরা দেখছি যে, বাইবেলে 'অভিজাত মানুষের পুত্র'কেও 'ঈশ্বরের পুত্র' বলা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, 'অভিজাত মানুষ'-কেও বাইবেলের পরিভাষায় 'ঈশ্বর' বলা যায়।

একাদশ : বাইবেলের নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোতে অনেক স্থানেই ঈশ্বরকে 'তোমাদের পিতা' বলা হয়েছে। যীশুর শিষ্যদেরকেও এভাবে বলা হয়েছে এবং অন্যদেরকেও এভাবে বলা হয়েছে।

দ্বাদশ : পিতা-পুত্রের ন্যায় সুসম্পর্কিত হওয়ার কারণে কখনো কখনো বাইবেলে 'পিতা' বা 'সন্তান' শব্দকে বিশেষ সম্পর্ক বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।

লূক লিখিত সুসমাচারের ২০ অধ্যায়ে যীশু জগৎমুখি মানুষদেরকে "জগতের সন্তান (The children of this world)" বলেছেন এবং

স্বর্গবাসীদেরকে “**ঈশ্বরের সন্তান** (Children of God)” ও “পুনরুত্থানের সন্তান (Children of the Resurrection)” বলেছেন।

লূক ২০: (৩৪) যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, এই জগতের সন্তানেরা বিবাহ করে এবং বিবাহিতা হয়। (৩৫) কিন্তু যাহারা সেই জগতের এবং মৃতগণের মধ্য হইতে পুনরুত্থানের অধিকারী হইবার যোগ্য গণিত হইয়াছে, তাহারা বিবাহ করে না এবং বিবাহিতাও হয় না। (৩৬) তাহারা আর মরিতেও পারে না, কেননা তাহারা দূতগণের সমতুল্য, এবং পুনরুত্থানের সন্তান হওয়াতে **ঈশ্বরের সন্তান**।

“Jesus answered and said to them, “The sons of this age marry and are given in marriage. But those who are counted worthy to attain that age, and the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage; nor can they die anymore, for they are equal to the angels and are sons of God, being sons of the resurrection.” (Luke 20:34-36) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এ বাক্যগুলো থেকে বুঝা যায় যে, ধার্মিক, যীশুর প্রতি বিশ্বাসী ও ঈশ্বরের নির্দেশ মান্যকারী ও সৎকর্মশীলদেরকে বাইবেলে ‘ঈশ্বরের পুত্র’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় দলিল

যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে পেশকৃত দ্বিতীয় দলিল হলো, যোহন লিখিত সুসমাচারের ৮ অধ্যায়ের ২৩ পদে রয়েছে, “তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা অধঃস্থানের, আমি ঊর্ধ্বস্থানের; তোমরা এ জগতের, আমি এ জগতের নহি।”

খ্রিষ্টানগণ যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে এ কথাটির ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা বলেন, যীশু বলছেন যে, তিনি এ জগতের নন। এতে বুঝা যায় যে, একটি নিগূঢ় রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি এ কথা বলেছেন। আর তা হলো যে, তিনি মানুষরূপী হলেও মানুষ নন, বরং স্বর্গের বা ঊর্ধ্বজগতের ঈশ্বর।

তাদের এই ব্যাখ্যা দু'টি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়:

প্রথমত, এই ব্যাখ্যা নতুন ও পুরাতন নিয়মের অগণিত বাক্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয়ত, যীশু তাঁর শিষ্যদের ক্ষেত্রেও এরূপ কথা বলেছেন।

যোহনের সুসমাচারের ১৫ অধ্যায়ের ১৯ পদে যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছেন, "তোমরা যদি জগতের হইতে, তবে জগৎ আপনার নিজস্ব বলিয়া ভালবাসিত; কিন্তু তোমরা ত জগতের নহ, বরং আমি তোমাদিগকে জগতের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়াছি, এই জন্য জগৎ তোমাদিগকে দ্বেষ করে।"

"If you were of the world, the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you." (John 15:19) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

যোহনের সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ে রয়েছে, "(১৪) আমি তাহাদিগকে তোমার বাক্য দিয়াছি; আর জগৎ তাহাদিগকে দ্বেষ করিয়াছে, কারণ তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই। (১৬) তাহারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই।"

"I have given them Your word; and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world." (John 17:14)
"They are not of the world, just as I am not of the world." (John 17:16)
(**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এভাবে যীশু তাঁর শিষ্যদের সম্পর্কে বললেন যে, তাঁরা এই জগতের নন। উপরন্তু তিনি স্পষ্টভাবেই এ বিষয়ে তাঁদেরকে তাঁরই মত একই পর্যায়ের বলে উল্লেখ করলেন। তিনি যেমন এ জগতের নন, তাঁর শিষ্যরাও ঠিক তেমনি এ জগতের নন। খ্রিষ্টানদের দাবি অনুসারে, যদি এ জগতের না

হওয়ার কারণে ঈশ্বরত্ব প্রমাণিত হয়, তবে যীশুর শিষ্যগণ সকলেই ঈশ্বর ছিলেন বলে প্রমাণিত হবে।

যীশুর এই বাক্যের সঠিক অর্থ হলো, তোমরা পার্থিব জগতের লোভ-লালসার অনুসারী ও জাগতিক স্বার্থান্বেষী। আর আমি তদ্রূপ নই, বরং আমি ঊর্ধ্বজগতের বা স্বর্গের মর্যাদার অভিলাসী এবং ঈশ্বরের প্রেম অনুসন্ধানী।

তৃতীয় দলিল

যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে পেশকৃত তৃতীয় দলিল হলো, যোহন লিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ে যীশুর নিম্নোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, "আমি ও পিতা, আমরা এক (I and my Father are one)"।

খ্রিষ্টানগণ দাবি করেন যে, এই বাক্য যীশুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করে। তারা বলেন যে, 'আমি ও পিতা এক' এই কথাটি বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করা যাবে না কারণ খ্রিষ্টের একটি মানবীয় আত্মা ও দেহ ছিল এবং মানুষ হিসেবে তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন, বরং এর ব্যাখ্যা করতে হবে। এর ব্যাখ্যা হলো, ঈশ্বরত্বের দিক থেকে তিনি পরিপূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন। এ দিক থেকে তিনি ও পিতা এক ছিলেন।

দু'টি কারণে তাদের এই দাবি গ্রহণযোগ্য নয়:

প্রথম কারণ: খৃস্টের বাক্য যীশুর অন্যান্য বাক্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাদের এই ব্যাখ্যা বাইবেলের অন্যান্য বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয় কারণ: এরূপ কথা যীশুর শিষ্যদের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে। যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৭ অধ্যায়ে রয়েছে যে, যীশু তাঁর শিষ্যদের বিষয়ে বলেন, "(২১) যেন তাহারা সকলে এক হয় (they all may be one); পিতঃ, **যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদের মধ্যে এক** থাকে (that they also may be one in us); যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ। (২২) আর তুমি

আমাকে যে মহিমা দিয়াছ, তাহা আমি তাহাদিগকে দিয়াছি; **যেন তাহারা এক হয়, যেমন আমরা এক** (that they may be one, even as we are one); (২৩) **আমি তাহাদের মধ্যে ও তুমি আমাতে যেন তাহারা একের মধ্যে** পরিপূর্ণতা লাভ করে।[১২] (I in them, and You in Me, that they may be made perfect in one)।"

"that they all may be one, as You, Father, are in Me, and I in You; that they also may be one in Us, that the world may believe that You sent Me. And the glory which You gave Me I have given them, that they may be one just as We are one: I in them, and You in Me; that they may be made perfect in one." (John 17:21-23) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এখানে যীশু বলেছেন "যেন তাহারা সকলে এক হয়", "যেন তাহারা এক হয় যেমন আমরা এক" এবং "যেন তাহারা একের মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে"।

এ বাক্যগুলো থেকে বুঝা যায় যে, তাঁরা সকলে এক ছিলেন। দ্বিতীয় বাক্যে যীশু উল্লেখ করেছেন যে, 'ঈশ্বরের সাথে তাঁর একত্ব' যেরূপ 'তাঁদের মধ্যকার একত্ব'-ও ঠিক তদ্রূপ।

এ কথা সুস্পষ্ট যে, যীশুর প্রেরিতগণ প্রকৃত অর্থে 'একসত্ত্বা' ছিলেন না, ঠিক তেমনি যীশুও প্রকৃত অর্থে ঈশ্বরের সাথে 'একসত্ত্বা' ছিলেন না।

বস্তুত, 'ঈশ্বরের সাথে এক' হওয়ার অর্থ হলো, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও নির্দেশের সাথে নিজের ইচ্ছা ও কর্ম এক করে দেওয়া, তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্য করা ও ধার্মিক জীবন যাপন করা।

ঈশ্বরের সাথে এরূপ ঐক্যের মূল পর্যায়ে খ্রিষ্ট, প্রেরিতগণ ও সকল বিশ্বাসী সমান। পার্থক্য হলো ঐক্যের শক্তি ও দুর্বলতায়। এরূপ ঐক্যে খ্রিষ্ট অন্যদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও তাঁর ঐক্য পূর্ণতর।

---

১২. বাংলা বাইবেলের ভাষ্য : যেন তাহারা সিদ্ধ হইয়া এক হয়।

ঈশ্বরের সাথে ঐক্য ও অংশীদারিত্ব বলতে যে এই অর্থ বুঝানো হয়েছে তা বাইবেল থেকেই প্রমাণিত হয়। যোহন তাঁর প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায়ে লিখেছেন, "(৫) আমরা যে বার্তা তাঁহার কাছে শুনিয়া তোমাদিগকে জানাইতেছি, তাহা এই, ঈশ্বর জ্যোতি, এবং তাঁহার মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নাই। (৬) আমরা যদি বলি যে, তাঁহার(ঈশ্বর) সহিত আমাদের সহভাগিতা(অংশীদারিত্ব) আছে (We have fellowship with him), আর যদি অন্ধকারে চলি, তবে মিথ্যা বলি, সত্য আচরণ করি না। (৭) **কিন্তু তিনি(ঈশ্বর) যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি জ্যোতিতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহভাগিতা(অংশীদারিত্ব) আছে** (We have fellowship with one another)।"

"This is the message which we have heard from Him and declare to you, that God is light and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another." (1 John 1:5-7) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

ফার্সী অনুবাদে, বাইবেলে এখানে সহভাগিতা বা অংশীদারিত্ব শব্দের পরিবর্তে 'ইত্তিহাদ' (union) বা 'একত্ব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে- "আমরা যদি বলি যে, তাঁহার সহিত আমরা এক... তবে পরস্পরে আমাদের এক হইয়াছি....।"

এ থেকে জানা যায় যে, বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ঈশ্বরের সাথে এক হওয়া বা ঈশ্বরের সহভাগী বা অংশীদার হওয়ার অর্থ হলো ঈশ্বরের নির্দেশ মত জ্যোতি ও পুণ্যের পথে চলা।

চতুর্থ দলিল

যীশুর ঈশ্বরত্বের পক্ষে পেশকৃত চতুর্থ দলিল হলো, যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ে রয়েছে, "(৯)... যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে; তুমি কেমন করিয়া বলিতেছ, পিতাকে আমাদের

দেখাউন? (১০) তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন? আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলি, তাহা আপনা হইতে বলি না; কিন্তু পিতা আমাতে থাকিয়া আপনার কার্য সকল সাধন করেন।" (ইউহোন্না ১৪:৯-১০)

খ্রিষ্টানগণ দাবী করেন যে, এগুলো প্রমাণ করে, খ্রিষ্ট ও ঈশ্বর একই সত্ত্বা ছিলেন, যা ঈসার ঈশ্বরত্বের প্রমাণ। কারণ, তিনি বলেছেন যে, তাকে দেখলেই পিতাকে দেখা হয় এবং পিতা তার মধ্যে রয়েছেন।

তাদের এই দাবি দু'টি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমত, 'খ্রিষ্ট ও ঈশ্বর একই সত্ত্বা ছিলেন, সেকারণে যীশুকে দেখাই হল ঈশ্বরকে দেখা'- এই ব্যাখ্যা খৃস্টের অন্যান্য ঐশ্বরিক বাক্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

মথি লিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের ৪০ পদে রয়েছে, যীশু বলেন, **"যে তোমাদিগকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে;** আর **যে আমাকে গ্রহণ করে, সে আমার প্রেরণকর্তাকেই গ্রহণ করে।"**

"He who receives you receives Me, and he who receives Me receives Him who sent Me." (Matthew 10:40) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

লূক লিখিত সুসমাচারের ৯ অধ্যায়ের ৪৮ পদে রয়েছে, ছোট্ট শিশুটির বিষয়ে তিনি বলেন, **"যে কেহ আমার নামে এই শিশুটিকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে;** এবং **যে কেহ আমাকে গ্রহণ করে, সে তাঁহাকেই গ্রহণ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"**

"and said to them, "Whoever receives this little child in My name receives Me; and whoever receives Me receives Him who sent Me." (Luke 9:48) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

লূক লিখিত সুসমাচারের ১০ অধ্যায়ের ১৬ পদে রয়েছে, যে ৭০ ব্যক্তিকে তিনি দুই জন করে বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করেছিলেন তাদের বিষয়ে তিনি বলেন, **“যে তোমাদিগকে মানে, সে আমাকেই মানে;** এবং যে তোমাদিগকে অগ্রাহ্য করে, সে আমাকেই অগ্রাহ্য করে; আর **যে আমাকে অগ্রাহ্য করে, সে তাঁহাকেই অগ্রাহ্য করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।”**

“He who hears you hears Me, he who rejects you rejects Me, and he who rejects Me rejects Him who sent Me.” (Luke 10:16) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

সুতরাং বাইবেলের উল্লিখিত বর্ণনায় যীশু ও ঈশ্বর যদি একই সত্ত্বা হন, তবে যীশু ও তার শিষ্যদেরকেও একই সত্ত্বা হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে যীশু ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ আলাদা দু'টি সত্ত্বা।

উল্লিখিত বর্ণনাগুলো লক্ষ্য করলে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নৈকট্যলাভ অর্থেই যীশু বলেছেন, “যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে।” অর্থাৎ যে আমাকে বুঝেছে ও জেনেছে সে প্রকৃতপক্ষে আমার প্রেরণকারী ঈশ্বরকেই জেনেছে। এখানে ঈশ্বরকে দেখা বলতে ঈশ্বরকে জানা বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, 'আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন'- এরূপ কথা যীশুর শিষ্যদের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে।

যোহন লিখিত সুসমাচারের ১৪ অধ্যায়ের ২০ পদে যীশু বলেছেন, “সেই দিন তোমরা জানিবে যে, **আমি আমার পিতাতে আছি, ও তোমরা আমাতে আছ, এবং আমি তোমাদের মধ্যে আছি।”**

“At that day you will know that I am in My Father, and you in Me, and I in you.” (John 14:20) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

তিনি আরো বলেন, "পিতা, তুমি যেমন আমার সংগে যুক্ত আছ আর আমি তোমার সংগে যুক্ত আছি তেমনি **তারাও আমাদের সংগে যুক্ত থাকে।"** (ইউহোন্না ১৭:২১)

"that they all may be one, as You, Father, are in Me, and I in You; that they also may be one in Us." (John 17:21) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

১ করিন্থীয় ৬ অধ্যায়ের ১৯ পদে[১৩] বলা হয়েছে, "অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, **যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন**, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ? আর তোমরা নিজের নও।"

"Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own?" (1 Corinthians 6:19) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

২ করিন্থীয় ৬ অধ্যায়ের ১৬ পদে রয়েছে, "আর প্রতিমাদের সহিত ঈশ্বরের মন্দিরেরই বা কি সম্পর্ক? আমরাই ত **জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির**, (যেমন ঈশ্বর বলিয়াছেন, আমি তাহাদের মধ্যে বসতি করিব)।"

"What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God; as God said, "I will live in them..." (2 Corinthians 6:16) (THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE)

ইফিষীয় ৪র্থ অধ্যায়ের ৬ পদে রয়েছে, "সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের নিকটে ও **সকলের মধ্যে** (In you all)[14] আছেন।

---

১৩. বাংলায় বাইবেলে শেষ বাক্যটি ২০ পদে অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪. বাংলা বাইবেলে "সকলের অন্তরে"।

"one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all." (Ephesians 4:6) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

প্রচলিত ইঞ্জিলে বলা হয়েছে যে, **সকলের মধ্যেই** ঈশ্বর আছে। (১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০, ২ করিন্থীয় ৬:১৬, ইফিষীয় ৪:৬)

তৃতীয় দলিলের আলোচনায় পাঠক দেখেছেন যে, যীশু তাঁর শিষ্যদের বিষয়ে ঈশ্বরকে সম্বোধন করে বলেছেন, "**আমি তাহাদের মধ্যে** ও তুমি আমাতে।"

কারো মধ্যে ঈশ্বরের থাকা বা অবস্থান করা যদি উক্ত ব্যক্তির সাথে ঈশ্বরের একত্ব (Union) বা উক্ত ব্যক্তির ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করে, তবে বাইবেলের উপর্যুক্ত বক্তব্যগুলোর বর্ণনায়- যীশুর মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন। সুতরাং যীশু ঈশ্বর! সেই যীশু ও শিষ্যগণ এক এবং যেহেতু বর্ণনানুসারে শিষ্যগণের মধ্যে যীশুর অবস্থান পাওয়া যায়। কাজেই শিষ্যগণ সকলেই ঈশ্বর! এটা কোনোভাবেই যৌক্তিক নয়।

বাইবেলের বর্ণনায়, যীশুর মধ্যে বা কোনো মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অবস্থানের প্রকৃত অর্থ হলো- তাদের ইবাদত ও আনুগত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে একমাত্র ঈশ্বরেরই অবস্থান। অপরদিকে ঈশ্বরের মধ্যে যীশুর বা কোনো মানুষের অবস্থানের প্রকৃত অর্থ হলো- এক ঈশ্বরের আনুগত্যের মাঝেই যীশু ও তার শিষ্যরা সর্বদা অবস্থান করবেন। পক্ষান্তরে কোনো মানুষের মধ্যে যীশুর অবস্থানের প্রকৃত অর্থ হলো- যীশুকে আনুগত্য করা বা মান্য করার মাধ্যমে স্রষ্টার আনুগত্য করা বা মান্য করা।

এই অর্থেই যোহনের প্রথম পত্রের ৩ অধ্যায়ের ২৪ পদে বলা হয়েছে, "আর যে ব্যক্তি তাঁহার আজ্ঞাসকল পালন করে, সে তাঁহাতে থাকে, ও তিনি তাহাতে থাকেন; আর তিনি আমাদিগকে যে আত্মা দিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা আমরা জানি যে, তিনি আমাদের মধ্যে থাকেন।" "(And he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. And

hereby we know that he abideth in us, by the Spirit which he hath given us)"

"Now he who keeps His commandments abides in Him, and He in him. And by this we know that He abides in us, by the Spirit whom He has given us." (1 John 3:24) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

(পৌলের কোন কথা আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি খ্রিষ্টের শিষ্য বা প্রেরিত ছিলেন না এবং ঐশ্বরিক প্রেরণাপ্রাপ্তও ছিলেন না। উপরন্তু আমরা তার বিশ্বস্ততাতেই বিশ্বাস করি না।

ঈশ্বরের গৌরব প্রমাণের জন্য পৌল মিথ্যা কথা বলতেন বলে নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, "কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?" (রোমান ৩/৭)

"For if the truth of God has increased through my lie to His glory, why am I also still judged as a sinner?" (Romans 3:7) (**The MacArthur Daily Bible** by John F. MacArthur, Jr)

এ থেকে জানা যায় যে, তিনি যে বিষয়কে 'ঈশ্বরের গৌরব' প্রকাশক বলে কল্পনা করেছেন, সে বিষয়ে ঈশ্বর, যীশু বা পবিত্র আত্মার নামে বানোয়াট ও মিথ্যা কথা বলতে মোটেও দ্বিধা করতেন না। কাজেই তার কোন কথাই বিশ্বাসযোগ্য নয়।)

কিছু সংশয় ও তার নিরসন

১। মাযহাব কী এবং কেন

মাযহাব একটি আরবি শব্দ। ইমামদের গবেষণালব্ধ মতামত বা অভিমতকে আরবিতে মাযহাব বলা হয়।

কোনো একটি বিষয়ে রাসূল (সা.) থেকে একাধিক আমল প্রমাণিত হয়েছে। ফলে একাধিক মতামত গড়ে উঠেছে। যেমন, সালাতে রাসূল (সা.) কখনো হাত বেধেছেন বুকের উপরে, কখনো বুকের নিচে, কখনো নাভির সাথে মিলিয়ে হাত বেধেছেন, কখনও নাভি সংলগ্ন নিচে হাত বেধেছেন। কোনো কোনো সাহাবা রাসূল (সা.) এর কাছ থেকে বুকের উপরে হাত বাধার আমলটি গ্রহণ করেছেন, কোনো কোনো সাহাবা নাভির উপরে হাত বাধার আমল গ্রহণ করেছেন, আবার কোনো কোনো সাহাবা নাভি সংলগ্ন নিচে হাত বাধার আমলটি গ্রহণ করেছেন।

ফলে যে সাহাবী যে আমলের ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) এর কাছ থেকে যে পদ্ধতিতে শিখেছেন, তিনি সেই পদ্ধতিতে আমল করেছেন। তার ছাত্ররা (তাবেঈরা) সেই পদ্ধতিতে আমল করেছেন। পরবর্তীতে তার ছাত্রদের ছাত্ররা (তাবে-তাবেঈরা) সেই পদ্ধতিতে আমল করেছেন।

এভাবে কোন একটি বিষয়ে রাসূল (সা.) এর কাছ থেকে একাধিক আমল নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে, ফলে এক্ষেত্রে একাধিক মাযহাব বা মতামত বা ভিন্নমত তৈরি হয়েছে। সুতরাং একই বিষয়ে একাধিক আমল হক হতে পারে।

প্রসিদ্ধ মাযহাব চারটি- হানাফি, মালেকী, শাফিঈ, হাম্বলী। কিন্তু তাবেঈনদের যুগে আরো অনেক মাযহাব ছিল। যেমন, তাবারীর মাযহাব, সুফিয়ান সাওরীর মাযহাব ইত্যাদি।

চার মাযহাবের ঈমামগণের অভিমত তাদের মাযহাবে যতটা সুবিন্যস্তভাবে গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত হয়েছে, অন্য কোন ঈমামের মতামত এভাবে

সুবিন্যস্তভাবে গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত হয়নি। ফলে এই চারজন ঈমামের মাযহাব গোটা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে।

মাযহাব কে দ্বীন মনে করা শির্ক। দ্বীন হল কুরআন এবং হাদিস মানা। আমরা মাযহাব মানবো দ্বীন পালনের উপকরণ হিসেবে।

যদি মাযহাবের কোন ঈমামের কোন মত হাদিসের বিরোধী বলে আপনি নিশ্চিত বুঝতে পারেন তবে আপনি হাদিস মানবেন। এটাই সকল মাযহাবের ইমামদের অভিমত।

আল্লাহকে এক এবং নবীজি (সা.)-কে তাঁর সর্বশেষ রাসূল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার পর আমরা সকলেই এক উম্মেতের অন্তর্ভুক্ত।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا۪

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান: আয়াত ১০৩)

২। ইসলামী শরীয়তে জিহাদ

'জিহাদ' শব্দের অর্থ- প্রচেষ্টা, সংগ্রাম বা পরিশ্রম। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আল্লাহর বিধান পালন এবং তাঁর দীন প্রচারের সকল প্রচেষ্টাকেই কখনো কখনো 'জিহাদ' বলা হয়েছে। যেমন, অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের প্রতি দাওয়াত প্রদান এবং তাদের অন্যায় কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করাকে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জালিম শাসকের সম্মুখে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কথা বলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। হজ্জকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। তবে ইসলামী পরিভাষা ও ফিকহ অনুযায়ী, জিহাদ মূলত 'কিতাল' বা ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পরিচালিত সশস্ত্র যুদ্ধকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

মদিনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ অনেক 'কিতাল' করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করেন। দাওয়াতের ভিত্তিতে মদিনার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে নেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে গ্রহণ করেন। এভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

মক্কার কোরায়শদের অত্যাচারে এবং তাদের ষড়যন্ত্রের মুখে মুসলমানরা মদিনায় হিজরত করে।

মুসলমানরা কাফেরদের কবল থেকে বেরিয়ে গেছে এবং মদিনায় নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে, এটা দেখে কাফেরদের ক্রোধ আরো বেড়ে যায়।

কোরায়শরা মুসলমানদের খবর পাঠালো, তোমরা মনে করো না, মক্কা থেকে গিয়ে নিরাপদে থাকবে; আমরা ইয়াসরেব পৌঁছে তোমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বো। (রাহমাতুল লিল আলামিন, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা. ১১৬)

এরপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন-

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 39

'যাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হল, কেননা তারা মজলুম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।' (সূরা আল-হাজ্জ: আয়াত ৩৯)

তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর...??

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে তাদের প্রতি। সুতরাং তোমরা যমীনে বিচরণ কর চার মাস, আর জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের অপদস্থকারী। আর মহান হজ্জের দিন মানুষের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা, নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রাসূলও। অতএব যদি তোমরা তাওবা করো, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম।

আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখো, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর যারা কুফরী করেছে তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। তবে মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছো, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তোমরা তাদেরকে দেওয়া চুক্তি তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো (ঘোষিত ৪ মাস) অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাটিতে বসে তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দাও। তা এজন্য যে তারা অজ্ঞ সম্প্রদায়। কীভাবে মুশরিকদের জন্য চুক্তি-অঙ্গীকার থাকবে আল্লাহর কাছে ও তাঁর রাসূলের কাছে? অবশ্য মসজিদে হারামের কাছে যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছো তাদের কথা আলাদা। যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য ঠিক থাকে, ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য ঠিক থাক। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।" (সূরা আত-তাওবা: আয়াত ১-৭)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন- "যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো (ঘোষিত ৪ মাস) অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর..."

অনেক সময় যারা ইসলাম বিদ্বেষী তারা কুরআনের অন্যান্য আয়াত উল্লেখ না করে এবং এ আয়াতগুলো পূর্বের ও পরের বক্তব্য ব্যতিরেকে উল্লেখ করে দাবি করেন যে, ইসলামে সকল কাফির বা অমুসলিমকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ আয়াতে সুস্পষ্টতই বলা হয়েছে, যে সকল কাফির জনগোষ্ঠীর সাথে বা যে সকল কবীলা বা গ্রাম রাষ্ট্রের সাথে (তৎকালীন প্রেক্ষাপটে) তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাদের মধ্যে যারা চুক্তি ভঙ্গ করেনি তাদের চুক্তি বহাল থাকবে। আর যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে

তাদেরকে তোমাদের পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিল ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিয়ে চার মাসের সময় দাও। এ সময়ের মধ্যে তারা যদি দীন গ্রহণ করে বা বশ্যতা গ্রহণ করে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে নিরাপত্তা দিবে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ঘোষিত চার মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করবে। তাদের বাহিনীকে যেখানে পাওয়া যাবে আক্রমন করা হবে এবং হত্যা বা বন্দী করা হবে।

এখানে অযোদ্ধা মুশরিকদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। এ আয়াতের নির্দেশ পালনে কখনোই রাসূলুল্লাহ (সা.) অযোদ্ধা মুশরিকদেরকে পথে প্রান্তরে ধরে হত্যা করতে নির্দেশ দেননি।

অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

"আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে এবং সীমালজ্ঘন করো না।" (সূরা আল-বাকারাঃ আয়াত ১৯০)

রাসূলুল্লাহ (সা.) সাধারণ অমুসলিম নাগরিককে হত্যা কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ "যদি কোনো ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক বা অমুসলিম দেশের অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধও লাভ করতে পারবে না, যদিও জান্নাতের সুগন্ধ চল্লিশ বৎসরের দুরত্ব থেকে লাভ করা যায়।"

মুশরিকগণ বলতে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হলো সে সকল চুক্তিভঙ্গকারী মুশরিক জনগোষ্ঠী বা কবীলা রাষ্ট্রের যোদ্ধাদেরকে বুঝানো হয়েছে। এখানে প্রথমে, শেষে ও মাঝে বারংবার চুক্তিরক্ষাকারীদের চুক্তি রক্ষা করতে ও নিরাপত্তাপ্রার্থীদের নিরাপত্তা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বাকি সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতর্কিত বা গোপন আক্রমণ না করে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে চার মাসের সময় দেওয়া হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে মানব ইতিহাসে যুদ্ধের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক ঘোষণা।

৩। ইসলামী শরীয়তে দাস-দাসী গ্রহণ

ইসলামী শরীয়তে দাস-দাসী গ্রহণ কেবলমাত্র যুদ্ধপরবর্তী কাফির যুদ্ধবন্দীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে কেবলমাত্র তাদের পরিবারকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে বন্দী করা হয়। তবে পরিবারের কেউ মুসলিম হলে তাকে বন্দী করতে পারবে না, ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী।

ইসলামী শরীয়তে দাস-দাসী গ্রহণ, তাদের সাথে আচরণ, পাশ্চাত্যের দাসত্ব/দাস-দাসীর সংজ্ঞা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বদরের যুদ্ধে ৭০ জন বন্দীর সাথে মুসলমানদের আচরণ কেমন ছিল তা লক্ষ করা যাক।

বদরের যুদ্ধে মোশরেকদের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভের পর রাসূল (সা.) তিন দিন বদর প্রান্তরে অবস্থান করেন। চতুর্থ দিন তিনি মদিনার পথে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে সাফরা প্রান্তরে নবী (সা.) নযর ইবনে হারেসকে হত্যার নির্দেশ দেন। বড়ো কোরায়শ অপরাধীদের অন্যতম এ লোকটি বদরের যুদ্ধে মোশরেকদের পতাকা বহন করছিলো। ইসলামের শত্রুতায় এবং রাসূল (সা.)-কে কষ্টদানে সে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। এরপর রাসূল (সা.) আরকুয যারিয়ায় পৌঁছে সেখানে ওকবা ইবনে আবু মোয়ায়তকে হত্যার নির্দেশ দেন। এ লোকটিই নামায আদায়রত অবস্থায় রাসূল (সা.) এর পিঠে উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছিলো এবং গলায় চাদর জড়িয়ে হত্যা করতে চেয়েছিলো। হযরত আবু বকর (রা.) সময়মতো উপস্থিত না হলে এ দুর্বৃত্ত রাসূল (সা.)-কে গলা টিপে হত্যাই করে ফেলেছিলো।

যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুই দুর্বৃত্তকে হত্যা করা ছিলো জরুরী। কেননা তারা শুধু যুদ্ধবন্দীই ছিলো না; বরং আধুনিক পরিভাষায় যুদ্ধাপরাধীও ছিলো।

রাসূল (সা.) মদিনায় আসার একদিন পর যুদ্ধবন্দীরা এসে পৌঁছে। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে যুদ্ধবন্দীদের সাথে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দেন। এ উপদেশের ফলে সাহাবায়ে কেরাম নিজেরা খেজুর খেয়ে থাকতেন, কিন্তু কয়েদীদের রুটি খেতে দিতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মদিনায় খেজুরের চেয়ে রুটির মূল্য ও গুরুত্ব ছিলো অধিক।

মদিনায় পৌঁছার পর রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে অবশিষ্ট যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ফেদিয়া (মুক্তিপণ) নিয়ে যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) যুদ্ধবন্দীদের শিরশ্ছেদ করার পরামর্শ দেন।

রাসূল (সা.) হযরত আবু বকরের পরামর্শ পছন্দ করেন। মোশরেকদের কাছ থেকে **ফেদিয়া বা মুক্তিপণ** নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফেদিয়ার পরিমাণ ছিলো এক হাজার, তিন হাজার এবং চার হাজার দেরহাম পর্যন্ত।

মক্কাবাসীরা লেখাপড়া জানতো। পক্ষান্তরে মদিনাবাসীরা পড়ালেখার সাথে পরিচিত ছিলো না। এ কারণে এরূপ সিদ্ধান্তও রাখা হয়েছিলো, যাদের মুক্তিপণ প্রদানের সামর্থ নেই, তারা মদিনায় দশটি করে শিশুকে লেখাপড়া শেখাবে। শিশুরা ভালোভাবে লেখাপড়া শিক্ষা করলে শিক্ষক কয়েদীদের জন্য সেটাই হবে ফেদিয়া বা মুক্তিপণ। ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের সাথে এরূপ মানবিক আচরণকেই উৎসাহিত করে।

রাসূল (সা.) বদরের যুদ্ধের কয়েকজন বন্দীর ওপর অনুগ্রহ করে তাদের কাছ থেকে ফেদিয়া গ্রহণ করেননি, তাদের এমনিতেই মুক্তি দেয়া হয়। তারা হচ্ছে মোত্তালেব ইবনে হানতাব, সাইফী ইবনে আবু রেফায়া এবং আবু আযযা জুমাহী।

ইসলামী শরীয়তে যুদ্ধবন্দী দাস-দাসী গ্রহণের উদ্দেশ্য

ইসলামী শরীয়তে যুদ্ধবন্দী দাস-দাসী গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হল অসহায়ের দায়িত্ব নেয়া, মহিলা ও বাচ্চাদেরকে আশ্রয় দেয়া, উত্তম আচরণের দ্বারা তাদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা, তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল

হবার সুযোগ দিয়ে মুক্তির পথ সুগম করা। তাদেরকে বণ্টন করে মুসলিম যোদ্ধারা নিজ নিজ জিম্মায় নিবে এবং একইসাথে তাদের আশ্রয় ও খাওয়া-পরার দায়িত্ব নিবে। যে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হবে, সে বিক্রি করে আরেকজন যে দায়িত্ব পালনে সক্ষম তার জিম্মায় দিবে।

রাসূল (সা.) বলেছেন, 'দাস তোমার ভাই যে তোমার অধীনস্থ। তুমি যা খাও তা থেকেই তাকে খেতে দাও। তুমি যা পরিধান কর তা থেকেই তাকে পরাও। সাধ্যাতীত কাজের বোঝা চাপিও না। সাধ্যের বাইরে কাজ হলে তাকে সাহায্য কর। (সহীহ বুখারী-২৩৭৭)

ইসলামী শরীয়তে তাদেরকে 'আমার দাস'- এভাবে সম্বোধন করাও নিষেধ। ডাকার সময় 'আমার বালক' বা 'আমার খাদিম'- এভাবে ডাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (তিরমিযী হা.নং: ১৯৪৯)

ইসলামী শরীয়তে দাস-দাসীকে প্রহার করা নিষিদ্ধ। কেউ যদি প্রহার করে তবে তাকে তার দাস বা দাসীকে মুক্ত করে দিতে হবে।

নবীজি (সা.) বলেছেন, 'কেউ যদি তার দাসকে চড় দেয় বা পিটায় তার প্রায়শ্চিত্ত হল সে তাকে মুক্ত করে দেবে।' (সহীহ মুসলিম-১৬৫৭)

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী দাস যদি চায় তবে সে নিজেকে মুক্ত করার চুক্তি করতে পারবে।

সূরা নূরের ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ .

'আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায় তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর।'

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দাস মুক্ত করাকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। রাসূল (সা.) ৬৩ জন দাস মুক্ত করেছেন। সাহাবীরাও নানান সময়ে দাস মুক্ত করেছেন।

ইসলামী শরীয়তে যুদ্ধবন্দী দাসী বা উপপত্নী

ইসলামী শরীয়ত যুদ্ধবন্দী দাসীদের ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের পাশবিক আচরণ কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, তাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা দান করেছে এবং তাদের ইজ্জত রক্ষণের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছে।

বণ্টন ও মালিকানা গ্রহণের মাধ্যমে একজন মুসলিম একজন বন্দিনীকে আশ্রয় দিবে ও তার খাওয়া-পরার যাবতীয় দায়িত্ব নিবে। ইসলাম যৌনকামনাকেও মানুষের একটি মৌলিক প্রয়োজন মনে করে। দাসীরও চাহিদা থাকবে, স্বাভাবিক। ইসলাম তাদের যৌন চাহিদা তাদের সম্মতিতে মালিকানার দ্বারা বৈধভাবে পূরণ করার এখতিয়ার দিয়েছে।

এভাবে ইসলাম যুদ্ধবন্দী দাসীদেরকে উপপত্নীর মর্যাদা দিয়েছে। অর্থাৎ পত্নীর থেকে কম মর্যাদার কিন্তু তাদের ভরণপোষণ সমান।

ইসলামী শরীয়তে যুদ্ধবন্দী দাসীদের সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা

বণ্টন এবং মালিকানা গ্রহণের পূর্বে কেউ তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। কেউ মালিকানা বণ্টনের আগে সহবাস করলে সে ব্যভিচারী গণ্য হবে এবং ঐ মুসলিমকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হবে।

একজন যুদ্ধবন্দী দাসী/বন্দিনীর সাথে তাঁর সম্মতি মোতাবেক কেবলমাত্র তার মালিকই সহবাস করতে পারবে এবং সেটা হবে বন্দিনীর একবার মাসিক হবার পর।

মালিকের সাথে সহবাসে কোনো দাসীর ঘরে যদি সন্তান হয় তাহলে ঐ দাসীকে তার মালিক আর বিক্রি করতে পারবে না। ঐ দাসী সারাজীবন তার উপপত্নীর মর্যাদায় ভূষিত হবে। এ অবস্থায় ঐ মুসলিমের স্ত্রীর সন্তান এবং তার দাসীর সন্তান সমান মর্যাদা পাবে; এমনকি সম্পত্তির ক্ষেত্রেও।

অনেক সময় একজন বন্দিনী কয়েকজন মুসলিমের মালিকানায় দেওয়া হয়। এ অবস্থায় ঐ বন্দিনী কারো জন্যই বৈধ নয়।

উল্লেখ্য, (১) স্বামী-স্ত্রী একসাথে বন্দী হলে কোন মুসলিম সেনা স্ত্রীর গায়ে হাত দিতে পারবে না। (২) মূর্তিপূজক দাসী তার মালিকের জন্য কোনোভাবে বৈধ নয় যতক্ষণ সে ইসলাম-খ্রিষ্ট-ইহুদি ধর্মের কোনটা গ্রহণ না করে। (৩) দাসের সাথে তার মালিক মহিলা সম্পর্ক করতে পারবে না। দাস চাইলে অন্য কোনো মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে।

দাসীর যৌন কামনা তার পূর্ণ সম্মতিতে মালিকের দ্বারা পূরণ হতে পারে।

দাসী যদি তার মালিককে খুশি না করে, তাহলে মালিক তাকে জোর করতে পারবে না এবং তাকে বিক্রি করে দিবে। হয়তো সে নতুন মালিককে পছন্দ করবে ও তাকে খুশি করবে। আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেছেন, "দাসদের মধ্যে যারা তোমাদের সন্তুষ্ট করে তাদেরকে তোমাদের খানা থেকে খাওয়াও, তোমাদের পোশাক থেকে পরাও। কিন্তু যারা তোমাদের সন্তুষ্ট করে না তাদেরকে বিক্রি করে দাও। এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে শাস্তি দিও না।" (আবু দাউদ, হাদিস নং: ৫১৪২)

অথবা দাস-দাসী যদি অন্য কোথাও বিয়ে বসতে চায় তবে এর মাধ্যমেও তারা যৌনকামনা পূরণ করতে পারে। মালিক তাদেরকে বিয়ের ক্ষেত্রে বাধা দিবেনা এবং বিয়ের পর ঐ দাসী আর মালিকের জন্য বৈধ থাকবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ ۚ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

"তোমাদের অবিবাহিতের জন্য বিয়ের ব্যবস্থা করো। এবং তোমাদের সক্ষম দাসদাসীদের জন্যও।" (সূরা আন-নূর: আয়াত ৩২)

দাসী যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে মালিক চাইলে দাসীকে মুক্ত করে বিয়ে করতে পারে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ.

"মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না যদি না তারা মুসলমান হয়। মুশরিক নারীর চেয়ে তো মুসলিম দাসীই উত্তম, যদিও মুশরিক নারী তোমাদের কাছে মুগ্ধকর লাগে।" (সূরা আল-বাকারাহঃ আয়াত ২২১)

যেমন, রাসূল (সা.) সাফিয়্যা (রা.)-কে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি হৃষ্টচিত্তে ইসলাম কবুল করেন। এরপর তিনি হযরত সাফিয়্যা (রা.)-কে আযাদ করে দেন এবং তাকে বিবাহ করেন।

ইসলামী শরীয়তে দাস-দাসী গ্রহণের দু'টি ক্ষেত্র আমরা জানতে পারলাম।

১। কাফির যুদ্ধবন্দীদের ক্ষেত্রে। যেমন, বনু কোরায়যার যুদ্ধে যুদ্ধবন্দী মহিলাদের মধ্যে রায়হানা বিনতে আমর ইবনে খানাফাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের জন্যে পছন্দ করেন।

২। একজন মালিক তার যুদ্ধবন্দী দাস বা দাসীকে আরেকজনের কাছে বিক্রি করলে। অতঃপর আরেকজন ঐ দাস বা দাসীর নতুন মালিক হিসেবে গণ্য হবে।

আরো একটি ক্ষেত্রে দাস-দাসী গ্রহণ ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত।

৩। একজন মালিক তার যুদ্ধবন্দী দাস বা দাসীকে আরেকজনের নিকট উপহারস্বরূপ অর্পণ করলে। যেমন, রাসূল (সা.)-কে মিশরের বাদশাহ মোকাওকিস উপঢৌকনস্বরূপ মারিয়া কিবতিয়া এবং সিরীন; দুজনকে প্রেরণ করেন। রাসূল (সা.) মারিয়াকে নিজের কাছে রেখেছিলেন।

৪। স্ত্রীগণ শস্যক্ষেত্র- সর্বোত্তম উপমা না মর্যাদাহানি?

আরবের ইয়াহুদীদের বিশ্বাস ছিল, যদি স্ত্রীর সাথে পেছন দিক হতে যোনিপথে সহবাস করা হয়, তবে সেই সঙ্গমে সন্তান জন্ম নিলে তার চক্ষু টেরা হবে।
আনসারী নারীরা, যারা একসময় ইহুদী ছিল তারাও এই কুসংস্কার অনুসারে এই নিয়মে সহবাস পছন্দ করতো না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সূরা বাকারার ২২৩ নং আয়াত নাযিল করেন,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۠ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۠ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। যেদিক দিয়ে ইচ্ছে শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর এবং নিজেদের জন্য ভবিষ্যতের ব্যবস্থা কর। এবং আল্লাহকে ভয় কর। এবং জেনে রাখ আল্লাহর সাথে তোমাদের মুলাকাত হবেই। বিশ্বাসীদের জন্য সুসংবাদ।"

নারীর গর্ভ সন্তান ধারণ করে, ঠিক যেমন শস্যক্ষেত্র আমাদেরকে ফসল দেয় এবং উক্ত আয়াত অনুসারে সন্তান ধারণ করতে যোনিপথে যেকোনো দিক দিয়েই সহবাস করা যাবে, যেভাবে শস্যক্ষেত্রে যেদিক দিয়ে ইচ্ছে বীজ বপন, সার ইত্যাদি পরিচর্যা করে ভবিষ্যত ফসলাদির ব্যবস্থা করা যায়। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যত সন্তানের কোনো ক্ষতি হবেনা। স্ত্রীগণ শস্যক্ষেত্র; এর থেকে সর্বোত্তম উপমা আর কি হতে পারে।

৫। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অমুসলিমদের কাছ থেকে জিযিয়া

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের নিরাপদে বসবাস এবং তাদের জীবন-সম্পদ ও ইয্যত-আব্রুর নিরাপত্তা লাভের বিনিময় হিসেবে তাদের ওপর আরোপিত নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদকে 'জিযিয়া' বলা হয়। এ জিযিয়া গ্রহণ অমুসলিমদের অধিকার খর্ব করা নয়, বরং তাদেরই নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমের জান-মাল-ইয্যত-আব্রু মুসলিমের জান-মাল ও ইয্যত-আব্রুর মতোই পবিত্র।

জিযিয়া শুধুমাত্র যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদের থেকে দেশ রক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেওয়ার বিনিময়ে প্রতি বছর আদায় করা হয়।

অপরদিকে যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম নয় তাদের থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের জিযিয়া গ্রহণ ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত নয়। যেমন, শিশু-কিশোর, নারী, পাগল, শারীরিকভাবে অক্ষম, অতি বয়োবৃদ্ধ বা অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগী।

অমুসলিমদের এই জিযিয়া দেওয়ার বিনিময়ে যুদ্ধের সময় ইসলামী রাষ্ট্র তাদেরকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দিবে। মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রীয় যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য নয়, তবে যদি সে সামরিক দায়িত্ব পালন করে তবে তাকে জিযিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় অমুসলিমরা মুসলমানদের মতই সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। শুধুমাত্র নিরাপত্তার স্বার্থে তাদেরকে জিযিয়া প্রদান করতে হবে।

জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ:

জিযিয়ার পরিমাণ আর্থিক সঙ্গতি বা সক্ষমতা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। অধিকাংশ ইমামের মতে জিযিয়ার কোনো বিশেষ পরিমাণ নির্ধারিত নেই। সরকার তাদের আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনা করে তাদের জন্য সহজবোধ্য যেকোনো পরিমাণ নির্ধারণ করবে। এ কর আদায়ে তাদের ওপর কোনরূপ কঠোরতা প্রদর্শন করা নিষিদ্ধ।

রাসূল (সা.) বলেন, “যেই ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদেরকে কষ্ট দেবে, আমি তার বিরুদ্ধে। শেষ বিচারের দিন আমি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো।”

রাসূলুল্লাহ (সা.) নাজরানবাসী খৃষ্টানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে উল্লেখ করেন, “নাজরানবাসী এবং তাদের সঙ্গীরা আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করছে তাদের ধন-সম্পদ, তাদের উপাসনালয় এবং আর যা কিছু তাদের আছে তার জন্যে।”

উমার (রা.) জেরুজালেমবাসী খৃষ্টানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে লিখেন, “ধর্মের ব্যাপারে তাদের উপর কোনো বাড়াবাড়ি হবে না। তাদের কারো কোনো অনিষ্ট করা হবে না।”

আল্লাহ্র রাসূল (সা.) এর হাদিস অনুযায়ী ইসলামী আইন বিশারদগণ বলেন- অমুসলিম নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান ওয়াজিব এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম।

অমুসলিমদের কেউ অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাকে জিযিয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হতো এবং বায়তুল মাল থেকে তার জন্য ভাতা বরাদ্দ করা হতো।

জিযিয়া আদায় না করে কোন অমুসলিম মারা গেলে সেটা তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে আদায় করা কিংবা তার উত্তরাধিকারীদের উপর দায়-দায়িত্ব চাপানো ইসলামী শরীয়তে অনুমোদিত নয়।

৬। উম্মুল মুমিনিন

নবীজির প্রথম স্ত্রী মা হযরত খাদিজা (রা.)

নবীজি (সা.) যৌবনের এক দীর্ঘ সময় (প্রায় তিরিশ বছরকাল) একজন স্ত্রীর সাথেই অতিবাহিত করেন। তিনি ছিলেন মা খাদিজা (রা.)। মা খাদিজা (রা.) ছিলেন মক্কার অন্যতম সম্পদশীলা এবং সম্ভ্রান্ত একজন নারী। তিনি নিজেই নবীজি (সা.) কে তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীতায় মুগ্ধ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বয়স্কা একজন নারী এবং একইসাথে একজন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারী। নবীজি (সা.) তার প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন। তখন রাসূল (সা.) এর বয়স ছিলো পঁচিশ এবং মা খাদিজার (রা.) বয়স ছিলো চল্লিশ।

নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর নবুওয়াতের ঘোষণার সাথে সাথেই যিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনেন তিনি হলেন উম্মুল মোমেনিন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)। তিনি ঈমানের ঘোষণার সাথে সাথে নিজের সমস্ত সম্পদ আল্লাহর রাসূলের হাতে সোপর্দ করে দেন।
রাসূল (সা.) খাদিজা (রা.) এর সমস্ত সম্পদ দ্বীন ইসলামের খিদমতেই ব্যয় করেন। সম্পদ দ্বারা নবীজি (সা.) কখনোই দুনিয়ার মোহগ্রস্ত হননি।

মা সাওদা (রা.) কে বিবাহ

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর প্রথম স্ত্রী খাদিজা (রা.) এর সাথে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত সংসার করেন। যতদিন পর্যন্ত খাদিজা (রা.) বেঁচে ছিলেন, ততদিন তিনি অন্য কোনো বিয়ে করেননি। আম্মাজান হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ওফাতের পর রাসূল (সা.) আরেকজন বয়স্কা ও বিধবা নারীকে

বিয়ে করেন। তিনি হলেন হযরত সাওদা (রা.)। সাওদা (রা.) এর স্বামী মারা যাওয়ায় তিনি তাঁকে বিয়ে করেন।

ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ নবীজির অন্যতম সাহাবীগণ, চার খুলাফায়ে রাশেদীনকে আল্লাহ তা'য়ালা নবীজি (সা.) এর সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করেন। রাসূল (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) এর কন্যা হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) এর কন্যা হযরত হাফসা (রা.) কে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। একইভাবে হযরত ওসমান (রা.) এর সাথে পর পর দুই কন্যাকে বিবাহ দেন এবং হযরত আলী (রা.) এর সাথে প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.) এর বিবাহ দেন।

উক্ত চারজন সাহাবী ক্রান্তিকালে ইসলামের সৈনিক হিসাবে অতুলনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছিলেন।

মা হযরত আয়েশা (রা.) কে বিবাহ

নবুয়তের একাদশ বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূল (সা.) হযরত আয়েশা (রা.) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন হযরত আয়েশা (রা.) এর বয়স মাত্র ছয় বছর। হিজরতের প্রথম বছর শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা (রা.) স্বামী গৃহে গমন করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিলো নয় বছর।[১৫] (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫০)

হযরত আয়েশা (রা.) জ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় তৎকালীন আরব কন্যাদের মধ্যে ছিলেন শ্রেষ্ঠ। সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.) এর অবস্থান চতুর্থ।

আবু মুসা আল আশআরি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন- "এমন কখনো হয়নি (ফিকহি বিষয়ে) আমরা কোনো কিছুর সমাধানের জন্য আয়েশা (রা.) এর কাছে গেলাম, কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পাইনি।"

---

১৫. নাস্তিকদের ইসলাম বিদ্বেষের জবাবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল ৮-১৩ বছর বয়স এবং আয়েশা (রা.) স্বামী গৃহে গমন করেন নয় বছর বয়সে।

আয়েশা (রা.) ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সা.) আর কোনো কুমারী নারীকে বিবাহ করেননি। তিনি ছাড়া নবীজি (সা.) এর অন্যান্য স্ত্রীগণ হয় বিধবা ছিলেন কিংবা তালাকপ্রাপ্তা, বয়সেও সবাই ছিলেন পূর্ণবয়স্কা।
আয়েশা (রা.) যে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী হবেন, সেটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই হুকুমপ্রাপ্ত।

বুখারীর হাদিসে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা.) কে একবার বললেন– "(হে আয়েশা) আমি তোমাকে দুইবার স্বপ্নে দেখেছিলাম। একটি রেশমের ওপরে কার যেন মুখচিহ্ন। আমি যখন রেশমের ওপর থেকে আবরণ সরালাম, আমি দেখলাম সেটা তোমার মুখাবয়ব। তখন কেউ একজন আমাকে বলল, (হে মুহাম্মাদ) এটা তোমার স্ত্রী। আমি বললাম, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়, তাহলে এটাই হবে।"

মা হযরত যয়নব বিন্‌ত জাহাশ (রা.) কে বিবাহ

জাহেলী যুগের একটি রীতি আরব সমাজে দীর্ঘদিন পুরুষানুক্রমে চলে আসছিলো। তা হলো, কাউকে পালকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করলে সে আসল পুত্রের মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করতো। এ নিয়ম আরব সমাজে এমনই দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে বসেছিলো, যা বিলোপ করা সহজসাধ্য বিষয় ছিলো না। অথচ এ নিয়ম ইসলামের বিবাহ, তালাক, সম্পত্তি আইন এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে ছিলো মারাত্মকভাবে সংঘাতপূর্ণ।

জাহেলী যুগের এ কুসংস্কার নির্মূলে আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (সা.) এর সাথে হযরত যয়নব বিনতে জাহশের বিয়ের ফায়সালা দেন।

হযরত যয়নব (রা.) প্রথমে হযরত যায়দের স্ত্রী ছিলেন, আর যায়দ (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.) এর পালকপুত্র। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় হযরত যায়দ (রা.) স্ত্রীকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এটা সে সময়ের কথা যখন সকল কাফের শক্তি আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছিলো। কাফেররা সে সময় খন্দক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। এদিকে পালকপুত্র বিষয়ক জাহেলী যুগের রীতি নির্মূলে আল্লাহর নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে।

রাসূল (সা.) ধারণা করলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি যায়দ তার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং তিনি যায়দের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিবাহ করতে হয়, তাহলে মোনাফেক, মোশরেকরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল প্রোপাগান্ডা শুরু করবে এবং সরলপ্রাণ মুসলমানদের নানা রকমের কুমন্ত্রণায় নিক্ষেপ করে তাদের মনে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। তাই রাসূল (সা.) এ চেষ্টাই করেন যেন হযরত যায়দ (রা.) স্ত্রীকে তালাক না দেন। এতে তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে রাসূল (সা.) এর বিয়ে করার প্রশ্ন ওঠবে না, কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা এটা পছন্দ করেননি।

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন,

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِیْۤ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَیْهِ اَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِیْ فِیْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِیْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۚ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰىهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰى زَیْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَیْ لَا یَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ حَرَجٌ فِیْۤ اَزْوَاجِ اَدْعِیَآىِٕهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا.

'স্মরণ করো, আল্লাহ তায়ালা যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছো, তুমি তাকে বলছিলে, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং আল্লাহকে ভয় করো, তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছো আল্লাহ তায়ালা তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন, তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত।' (সূরা আহযাব, আয়াত ৩৭)

অবশেষে হযরত যায়দ (রা.) হযরত যয়নবকে তালাক দেন। এরপর ইদ্দতকাল শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত যয়নব (রা.)-এর সাথে রাসূল (সা.)-এর বিয়ের ফায়সালা জানিয়ে দেন এবং এ বিয়ে তাঁর জন্যে অত্যাবশ্যক করে দেন। দেরী করার কোনো অবকাশও রাখা হয়নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা নাযিল করেন,

'অতপর যায়দ যখন তার সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করলো তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে পালক পুত্রদের

স্ত্রীদের ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে; যখন তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহসম্পর্ক ছিন্ন করে। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়ে থাকে।' (সূরা আহযাব, আয়াত ৩৭)

এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিলো, পালিত পুত্রের ব্যাপারে জাহেলী যুগের রীতি-নীতি কার্যকরভাবে উৎখাত করা। এর আগেই কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে এ কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ

'তোমরা ওদের ডাকো ওদের পিতৃ পরিচয়ে, আল্লাহর দৃষ্টিতে এটাই ন্যায়সঙ্গত।' (সূরা আহযাব, আয়াত ৫)

সমাজজীবনে কোনো রেওয়াজ বদ্ধমূল হয়ে গেলে তখন শুধু কথা দিয়ে তার পরিবর্তন সম্ভব হয় না; বরং যিনি সেই রেওয়াজের পরিবর্তন চান তাকে কাজের মাধ্যমে বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হয়।

যেমন, সাহাবীগণ নবী করীম (সা.)-এর জন্যে জীবন দেয়া, তাঁর জন্যে বেঁচে থাকাকে নিজেদের সৌভাগ্য এবং সাফল্য মনে করতেন। অথচ হোদায়বিয়ার চুক্তি সম্পাদনের পর রাসূল (সা.) যখন তাদের নিজ নিজ কোরবানীর পশু জবাই করতে নির্দেশ দেন, তখন কেউ সাড়া দেননি। রাসূল (সা.) তখন ভীষণ মনোকষ্টে ভুগছিলেন। হযরত উম্মে সালামা (রা.) তখন রাসূল (সা.)-কে পরামর্শ দেন, আপনি নিজের কোরবানীর পশু জবাই করুন। তিনি তাই করেন। তখন প্রত্যেকেই রাসূল (সা.)-এর অনুসরণের জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেন। তারা ছুটে গিয়ে নিজেদের কোরবানীর পশু জবাই করেন। এ ঘটনা থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, শক্তিশালী কোনো রসম রেওয়াজের পরিবর্তন সাধনে কথা ও কাজের পার্থক্য কতো বেশী। আর জাহেলী যুগের পালিত পুত্র বিষয়ক রেওয়াজ নিরসনের লক্ষ্যেই আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা.)-এর পালিত পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে তাঁর বিবাহ দেন।

এ বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর মোনাফেকরা রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালাতে শুরু করে। তারা নানা ধরনের গুজব রটাতে থাকে।

এর কিছুটা প্রভাব সরলপ্রাণ মুসলমানদের ওপরও এসে পড়ে। এ প্রোপাগান্ডাকে শক্তিশালী করতে মোনাফেকরা শরীয়তের একটি যুক্তিও খুঁজে নেয়। তারা প্রচার করে, ইসলাম চারটি বিয়ে বৈধ করেছে, অথচ রাসূল (সা.) তাঁর পালিত পুত্র যায়দের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পঞ্চম স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। একজন মুসলমানের জন্যে চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ তো ইসলামে বৈধই নয়। প্রচার-প্রোপাগান্ডার মূল বিষয় ছিলো, হযরত যায়দ (রা.) কে রাসূল (সা.)-এর ছেলে মনে করা হতো, ছেলের স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা তো নির্লজ্জতাপূর্ণ ঘৃণ্য কাজ। অবশেষে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আহযাবে উল্লিখিত দুটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ তায়ালা অন্য এক আয়াতে বলেন, 'মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যেকার পুরুষদের কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.) এবং খাতামুন নবী'।

সাহাবীরা তখন বুঝতে পারেন, ইসলামে পালিত পুত্রের কোনো মূল্য নেই।

উল্লেখ্য, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অসীম জ্ঞানের ভিত্তিতেই রাসূল (সা.) কে বিয়ের সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যাপকতা দিয়েছেন, যা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি।

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) প্রতি ঈমান এনেছে, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا.

অর্থ: আর যদি তোমরা ভয় করো যে, তোমরা সুবিচার করতে পারবে না ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি, তাহলে বিয়ে করো নারীদের মধ্য থেকে যাদের তোমাদের কাছে ভালো লাগে- দুই, তিন, বা চারজন। তবে যদি আশঙ্কা করো যে, (তাদের মধ্যে) সমতা বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটি (করো) অথবা তোমাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে (অধিকারভুক্ত

দাসী); এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা অবিচার করবে না। (সূরা আন-নিসা, আয়াতঃ ৩)

উম্মুল মুমিনিনদের সাথে রাসূল (সা.) অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ, সম্মানজনক, উচ্চ পর্যায়ের উত্তম জীবন যাপন করতেন। নবীসহধর্মিণীরা নম্রতা, ভদ্রতা, শালীনতা, ধৈর্য সহিষ্ণুতা, সেবাপরায়ণতা, স্বামীর অধিকার পূরণ ইত্যাদি সকল বিষয়েই ছিলেন প্রশংসনীয় ভূমিকা পালনকারিণী।

নবীজীর স্ত্রীগণ সকলেই আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা এ থেকেই অনুমান করা যায়, তাদের কেউই দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েননি। নবী করীম (সা.) নয়জন স্ত্রী রেখে ইনতিকাল করেছিলেন।

উপরন্তু, প্রত্যেকেই একটি পরিবারের সদস্য। তাই পরিবারে রাসূল (সা.) কীরূপ আচরণ করেছেন সেটা জানার গুরুত্ব অপরিসীম, আর সেটা একমাত্র স্ত্রীদের পক্ষেই জানানো সম্ভব। এই বিশাল পরিমাণ জ্ঞানের উৎস তাঁর স্ত্রীদের থেকে পাওয়া গেছে। তাদের বক্তব্য থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার জানা সম্ভব হয়েছে। তিনি কীভাবে খেতেন, ঘুমাতেন, কীভাবে স্ত্রীদের সাথে আচরণ করতেন, দাসদের সাথে তাঁর ব্যবহার কেমন ছিল, এসব বিষয়ে বহু হাদীস উম্মুল মুমিনীনদের মাধ্যমে জানা যায়।
এভাবেই আল্লাহ তাআলা নবীজির (সা.) সব সুন্নাহ পরবর্তী সকল প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

শালীন, সুশৃঙ্খল ও ভারসাম্যপূর্ণ একটি সমাজ বিনির্মাণ

১। ইসলামী শরীয়তে পর্দার বিধান

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুমিন পুরুষকে তার চোখ এবং লজ্জাস্থান হিফাজত করতে হুকুম দিয়েছেন। এতে একদিকে সে যিনা-ব্যাভিচারের পাপ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখতে সক্ষম হবে, অপরদিকে তার স্ত্রীর অধিকার সুরক্ষিত থাকবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ .

"মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। এটাই তাদের জন্যে অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।" (সূরা আন-নূর: আয়াত ৩০)

আল্লাহ তা'আলা মুমিন নারীদেরকে তাদের সৌন্দর্য গোপন রাখতে হুকুম দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا .

"হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদের ও কন্যাদের এবং মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়।

এতে তাদের চেনা সহজতর হবে। ফলে তাদের উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা আল-আহযাব: আয়াত ৫৯)

আল্লাহ তা'আলা সূরা আন-নূর এর ৩১ নং আয়াতে আরো বলেন,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۠ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۠ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۠ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

“মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি ও লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত করে রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারও কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।” (সূরা আন-নূর: আয়াত ৩১)

রাসূল (সা.) বলেছেন, “মেয়েরা যখন বালিকা হয়ে যায়, তখন তাদের শরীরের কোনো অংশ দেখা বা দেখানো জায়েজ নয়।” (সহীহ মুসলিম)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেছেন, “মহিলারা হলো পর্দায় থাকার বস্তু। তারা যখন পর্দা উপেক্ষা করে বাইরে

আসে, তখন শয়তান তাদেরকে অন্য পুরুষের চোখে আকর্ষণীয় করে দেখায়।" (তিরমিযী শরীফ)

নারীরা কথাবার্তার মাধ্যমে পুরুষকে আকর্ষণ করতে না পারে সে লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يٰنِسَاۤءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا.

"হে নবীপত্নীগণ, তোমরা অন্য নারীদের মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বোলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি সে প্রলুব্ধ না হয়। তোমরা সংগত কথাবার্তা বলবে।" (সূরা আল-আহযাব: আয়াত ৩২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰۤى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا.

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয় তা একটি অশ্লীল কাজ ও খারাপ পন্থা।" (সূরা বনী ইসরাঈল: আয়াত ৩২)

রাসূল (সা.) বলেছেন, "কোনো বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া চোখের যিনা, অশ্লীল কথাবার্তা বলা জিহ্বার যিনা, অবৈধভাবে কাউকে স্পর্শ করা হাতের যিনা, ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে হেটে যাওয়া পায়ের যিনা, খারাপ কথা শোনা কানের যিনা আর যিনার কল্পনা করা ও আকাঙ্খা করা মনের যিনা। অতঃপর লজ্জাস্থান একে পূর্ণতা দেয় অথবা অসম্পূর্ণ রেখে দেয়।" (সহীহ বুখারী)

হযরত বুরাইদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) আলী (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে আলী! কোন অপরিচিত মহিলার উপর হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে তা ফিরিয়ে নিবে এবং দ্বিতীয়বার তার প্রতি আর দৃষ্টিপাত করবেনা। কেননা প্রথম দৃষ্টি তোমার আর দ্বিতীয়টি তোমার নয় (শয়তানের)। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

নবী (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন অপরিচিত নারীর প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কিয়ামতের দিনে তার চোখে উত্তপ্ত গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হবে।" (কাদীর)

রাসূল (সা.) বলেছেন, "কোনো পুরুষ যখন কোনো মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হয়, তখন তাদের তৃতীয় সঙ্গী হয় শয়তান।" (তিরমিযী)

"বেগানা নারী কে স্পর্শ করা কতো বড় পাপ। নিশ্চয়ই তোমাদের কারো মাথায় পেরেক ঢুকে দেয়া ঐ মহিলাকে স্পর্শ করা থেকে অনেক ভালো, যে তার জন্য হালাল নয়।" (তাবারানী ছহীহুল জামে হাদিস)

শরী'আত পর্দা ফরয করেছে, নারী-পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি সংযত রাখতে বলেছে এবং গায়ের মাহরাম স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নির্জনে মিলিত হওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এভাবে ব্যভিচারের সকল উপায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন। "আমি এবং মাইমুনা (রা.) রাসূল (সা.) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একজন অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মাখতুম (রা.) সেখানে আসতে লাগলেন। তখন রাসূল (সা.) বললেন, 'তোমরা তার থেকে পর্দা কর, আঁড়ালে চলে যাও।' আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ তিনি তো অন্ধ। তিনি তো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না। তখন রাসূল (সা.) বললেন, 'তোমরাও কি অন্ধ। তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছোনা'।" (আবু দাউদ)

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন,

"নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রামাদানের সিয়াম পালন করে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করে ও স্বামীর আনুগত্য করে তখন সে জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।" (মুসনাদে আহমাদ: ১৬৬১)

২। ইসলামে পিতামাতার মর্যাদা

ইসলাম পিতামাতার সাথে সন্তানের 'উফ' শব্দটি বলাও অনুমোদন করেনি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا.

"আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে কথা বলবে সম্মানসূচক নম্রভাবে।" (সূরা বনি ইসরাঈল: আয়াত ২৩)

পিতা হচ্ছে জান্নাতের দরজাগুলোর মাঝে মধ্যবর্তী দরজা, চাও তো তা নষ্ট করে দাও এবং চাও তো তা হিফাযত করো।

(তিরমীযি, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা, ৩/৩৫৯, হাদীস নং-১৯০৬)

৩। ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা

যাকাত ইসলামের অন্যতম একটি স্তম্ভ। সালাতের পরে এরই উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি, যার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে, তাকে যাকাত দিতে হবে। নগদ টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, গৃহপালিত পশু, কল-কারখানা, দোকান-পাট, পণ্য দ্রব্য, জমির উৎপন্ন ফসল, খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি সকল সম্পদেরই যাকাত দিতে হয়। যাকাত সম্পদকে পবিত্র করে।

সাধারণভাবে নিজের ধন-সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ (২.৫ শতাংশ) গরীব-মিসকীন ও অভাবগ্রস্ত লোকদের মাঝে বণ্টন করে নিজের সম্পদকে পবিত্র করাকে যাকাত বলা হয়।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

خُذۡ مِنۡ اَمۡوَالِهِمۡ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيۡهِمۡ بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡ ؕ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمۡ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ.

"তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধন করার জন্য তাদের সম্পদ থেকে সাদাকাহ (যাকাত) গ্রহণ করো.... ।" (সূরা আত-তাওবা: আয়াত ১০৩)

আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আত-তাওবার ৬০ নং আয়াতে আট শ্রেণির লোকেরা যারা যাকাত লাভের যোগ্য, তাদের কথা বলেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَالۡمَسٰكِيۡنِ وَالۡعٰمِلِيۡنَ عَلَيۡهَا وَالۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوۡبُهُمۡ وَفِى الرِّقَابِ وَالۡغٰرِمِيۡنَ وَفِىۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ وَابۡنِ السَّبِيۡلِ ؕ فَرِيۡضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ.

'যাকাত তো কেবল দরিদ্র, মিসকীন, তা আদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, (সত্যের দিকে) যাদের মন আকৃষ্ট করা প্রয়োজন তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য এবং (সহায়-সম্বলহীন) পথিকের জন্য। এটা আল্লাহর অবশ্যপালনীয় বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।'

মু'আয ইবন্ জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) যখন তাকে ইয়েমেনে পাঠান তখন তাকে বলেছিলেন,
"...তাদের জানিয়ে দিয়ো যে, আল্লাহ তাদের সম্পদের যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলক করেছেন। আর এই যাকাত তাদের মধ্যকার ধনীদের থেকে নিয়ে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হবে..." (সহীহ বুখারী, খন্ড ৫, অধ্যায় ৫৯, হাদিস নং-৬৩৪)

ইসলামী শরীয়তে যাকাত ব্যবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকগণ ধনীদের নিকট থেকে হিসাব মোতাবেক যাকাত আদায় করবে এবং যাকাতের অর্থ দরিদ্র, অক্ষম, অভাবগ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত, বেকার, এতীম ও অন্যবিধ দুর্দশাগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করবে।

একমাত্র যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা হয় এবং সকলেরই সচ্ছলতা আসে।

রাসূলুল্লাহর (সা.) যুগেই সুষ্ঠু যাকাত ব্যবস্থা কায়েম হয়। বিত্তবানদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে তা অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করা হতো।

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় একমাত্র যাকাতের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক বৈষম্যহীন একটি সমাজ গঠন সম্ভব।
অবশ্যপালনীয় বিধান যাকাতের বাইরেও আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন সাধারণ দান-সদকাহ করতে।
আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা সদকাহ করো, এটা তোমাদের জন্যই ভালো; যদি তোমরা জানতে।' (আল-বাকারাহ, ২: ২৮০)

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের এমন অভূতপূর্ব দিক-নির্দেশনা কেবল ইসলামী শরীয়তেই পাওয়া যায়। কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করলে এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

৪। ইসলামী শরীয়তে শাস্তির বিধান:

'ইসলামের শাস্তি আইন'- 'মানব জাতির কল্যাণ সাধন ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাই যার লক্ষ্য'

ইসলামের শাস্তি আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্য-

১। জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং তাদের মান-সম্মান ও ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করা।

২। সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা।

৩। সমাজে অন্যায় ও যুলুমের বিস্তার ও ব্যাপকতা প্রতিরোধ করা।

৪। শাস্তি কার্যকর করার পর ইসলাম অপরাধীকে তার দোষ থেকে মুক্ত মনে করে এবং একইসাথে তাকে পরিশুদ্ধ করে তার পরকালীন আযাব থেকে তাকে রক্ষা করে এবং সমাজে তার হারানো মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে।

ইসলামের শাস্তি আইন প্রয়োগের পূর্বশর্ত-

১। অপরাধ শতভাগ প্রমাণিত হওয়া, অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহের অবকাশ না রাখা।

২। ইসলামের শাস্তি আইন প্রয়োগ করতে হবে ইসলামী রাষ্ট্রে, অন্য কোথাও নয়।

৩। ইসলামের শাস্তি আইন প্রয়োগের পূর্বে ইসলামী সরকারের কর্তব্য- ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ সংক্রান্ত কর্মগুলো জনগণকে ভালোভাবে অবহিত করা। যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তৈরি করাও ইসলামী আইন প্রয়োগের পূর্বশর্ত, যাতে কোনো ব্যক্তি অভাবের তাড়নায় নিজেকে অসৎ পথে পরিচালিত না করে। তদুপরি ইসলামী আইন প্রয়োগের পূর্বে ইসলামী সরকারের কর্তব্য- যৌন উত্তেজক উপকরণ, অশ্লীল বিনোদন সমাজ থেকে নির্মূল করা, যেন কেউ অবৈধ যৌন কর্মে জড়িয়ে না পড়ে। সর্বোপরি মানুষের জন্য অপরাধমুক্ত জীবন যাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা ও প্রতিটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন; যেমন- ক্ষুধার্তের জন্য অন্ন, বস্ত্রহীনদের জন্য বস্ত্র, রুগ্ন ব্যক্তির জন্য চিকিৎসা প্রভৃতি প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ইসলামের শাস্তি আইন প্রয়োগের পূর্বশর্ত।

৪। অপরাধী প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হওয়া।

৫। অপরাধী মুসলিম বা ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী অমুসলিম নাগরিক হওয়া। যদি কোনো অমুসলিম হাদ্দ জাতীয় কোনো অপরাধে (যেমন-চুরি, ডাকাতি, যিনা ও যিনার অপবাদ আরোপ প্রভৃতি) লিপ্ত হয়, তাহলে তাদেরকে ঐ সকল অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি ভোগ করতে হবে। এক্ষেত্রে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য আইন সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। তবে ইসলাম ধর্মে মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কোনো অমুসলিমের উপর মদ্যপানের শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে না। কারণ মদ্যপান তাদের ধর্মমতে বৈধ। অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কার্যকলাপ

তাদের ধর্মমত অনুযায়ী সম্পন্ন হয় বিধায় যেসব কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ এবং তাদের ধর্মে বৈধ, তা তারা তাদের আবাসিক এলাকায় করতে পারে। তবে তারা যদি মাদক সেবন করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে তাদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। কেননা নেশা করা প্রত্যেক ধর্মেই নিষিদ্ধ। যদি তারা মুসলিম জনপদের মধ্যে প্রকাশ্যে মদ সেবন করে, তাহলেও তাদেরকে সাধারণ দণ্ড দেয়া যাবে।

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্য হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। যদি কোনো মুসলিম কোনো অমুসলিমকে কিংবা কোনো অমুসলিম অপর কোনো অমুসলিমকে অথবা কোনো মুসলিমকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তাহলে হত্যাকারীর শাস্তি হল- মৃত্যুদণ্ড। এক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে কোনো রূপ বৈষম্য করা যাবে না। অমুসলিমের মাল মুসলিম চুরি করলে কিংবা মুসলিমের মাল অমুসলিম চুরি করলে উভয় অবস্থাতেই চোরের হাত কাটা হবে। কোনো মুসলিম কোনো অমুসলিম নারীর সাথে কিংবা কোনো অমুসলিম কোনো মুসলিম নারীর সাথে ব্যাভিচার করলে উভয় অবস্থাতেই একই শাস্তির বিধান প্রযোজ্য হবে।

ইসলামের শাস্তি আইন প্রয়োগের অধিকারী কে?

ইসলামের শাস্তি আইন কার্যকর করার একমাত্র দায়িত্বশীল হচ্ছেন সরকার প্রধান কিংবা তার প্রতিনিধিগণ (যেমন- প্রশাসন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ)।

হদ্দ ও হদ্দযোগ্য অপরাধ:

হদ্দ একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- রোধ করা। কোন কোন শাস্তিকে হদ্দ বলা হয় এজন্য যে, শরীয়তের দণ্ড হদ্দ এসব অপরাধকে রোধ করে। ফকীহগণের মতে, হদ্দ একটি নির্দিষ্ট দণ্ড, যা আল্লাহর হক বিনষ্টের কারণে ওয়াজিব হয়।

যেসব অপরাধে হদ্দ ওয়াজিব হয় সেগুলো হল- চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ, মদ্যপান, ধর্মদ্রোহিতা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা। অবশ্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার ব্যাপারে ভিন্নমত রয়েছে।

ইসলামের শাস্তি আইন (কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত বিভিন্ন অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তি)-

১। চুরির শাস্তি:

চুরির দণ্ড প্রদানের একটি শর্ত হল- চুরিকৃত সম্পদের ন্যূনতম নেসাব পরিমাণ মূল্যমান থাকতে হবে।

কুরআনে চুরির দণ্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে- হস্ত কর্তন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

“পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তারা যা উপার্জন করেছে তার প্রতিফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্ত। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (সূরা আল-মায়েদা: আয়াত ৩৮)

চার মাযহাবের ইমামগণের মতামত অনুযায়ী, প্রথমবার চুরির শাস্তি- ডান হাত কবজি পর্যন্ত কর্তন। কেননা, ডান হাত দ্বারাই চুরির কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাই চুরির অপরাধে ডান হাত কর্তন করাটাই অধিকতর যথার্থ শাস্তি।

২। ডাকাতির শাস্তি:

ইসলামী শরীয়তে সশস্ত্র ডাকাত ও পথদস্যুদের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে চার ধরনের শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হল- হত্যা করা, শূলবিদ্ধকরণ, হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা এবং দেশ থেকে চির নির্বাসন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن
يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ
ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

"যেসব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে তাদের শাস্তি হচ্ছে- তাদের হত্যা করা হবে বা শূলে চড়ানো হবে কিংবা তাদের হাত ও পা বিপরীত পরম্পরায় কেটে ফেলা হবে। কিংবা তাদের নির্বাসিত করা হবে। এই অপমান তো তাদের জন্য দুনিয়ায় আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।" (সূরা আল-মায়েদাঃ আয়াত ৩৩)

শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতামত অনুসারে, অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা অনুযায়ী এ শাস্তিসমূহের যেকোনো একটি প্রয়োগ করতে হবে। যেমন- যে হত্যাকাণ্ড ঘটাল এবং সম্পদ লুট করল তাকে শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। আর যে হত্যা করল; কোনো সম্পদ লুট করল না, তাকে শুধু মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করতে হবে। আর যদি শুধু সম্পদ লুট করে, হত্যা না করে থাকে, তাহলে তার ডান হাত ও বাম পা কর্তন হবে। আর যদি শুধুমাত্র ত্রাস সৃষ্টি করে; হত্যা বা ধন-সম্পদ লুট না করে থাকে, তবে তাকে দেশান্তর করা হবে।

পক্ষান্তরে হানাফী ও মালিকী ইমামগণের মতামত অনুযায়ী, বিচারকের এ এখতিয়ার রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে উল্লিখিত চারটি শাস্তির যেকোনো একটি, এ পর্যায়ের যেকোনো অপরাধে তাঁর সুবিবেচনা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে পারেন।

৩। যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তিঃ

ইসলামী শরীয়তে ব্যভিচারীর সংজ্ঞা হল-
এমন কোনো জীবিত নারীর সাথে সঙ্গম করা, যে নারী তার বিবাহিতা স্ত্রী কিংবা মালিকানাধীন দাসী নয়। নারীকে তখনই ব্যভিচারিণী বলা যাবে, যখন সে স্বেচ্ছায় এমন পুরুষকে সঙ্গমে সম্মতি দেবে।

হযরত ‘উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

“তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো, তোমরা আমার নিকট থেকে গ্রহণ করো। আল্লাহ তা‘আলা তাদের জন্য একটি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তা হলো, অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন এবং বিবাহিতদের জন্য একশত বেত্রাঘাত ও প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা।”[১৬]

অবিবাহিতের যিনার শাস্তি:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

“ব্যভিচারী পুরুষ ও ব্যভিচারিণী নারী- তাদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত (দোররা) করো।” (সূরা আন-নূর: আয়াত ২)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

“অবিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলে একশত বেত্রাঘাত।”[১৭]

অবিবাহিত ব্যভিচারীকে বেত্রাঘাতের বিষয়ে ইমামগণ সকলেই একমত। তবে শাস্তির অংশ হিসেবে অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরুষকে একশ দোররা মারার পাশাপাশি এক বছরের জন্য দেশান্তর করা হবে কিনা- এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর মতে, অবিবাহিত ব্যভিচারীকে (নারী হোক বা পুরুষ)- শুধু একশ দোররা মারতে হবে; আর কিছু নয়। তাঁদের মত হলো, পবিত্র কুরআনে তাদের শাস্তি হিসেবে কেবল বেত্রাঘাতের কথাই উল্লেখ রয়েছে।

---

১৬. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৯০; আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৪৪১৫।

১৭. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৯০; আবূ দাউদ, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ৪৪১৫।

ইমাম শাফিঈ (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এর মতে, ব্যভিচারীকে (পুরুষ হোক বা নারী)- একশ দোররা মারার সাথে সাথে দেশান্তর করাও ওয়াজিব। এই দেশান্তরের অর্থ হল- তাদেরকে এতটুকু দূরত্বে পাঠাতে হবে যেখানে যেতে অন্তত একদিন এক রাতের সময় অতিবাহিত হয়। তাঁদের প্রধান দলীল হল, ইতোঃপূর্বে বর্ণিত হযরত ‘উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) বর্ণিত হাদীস।

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, শুধুমাত্র ব্যভিচারী পুরুষকেই এক বছরের জন্য দেশান্তর করা হবে, ব্যভিচারী নারীকে নয়। তাঁর মত হল- কোনো ব্যভিচারী নারীকে দেশান্তর করা হলে সে সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত হয়ে যাবে এবং তার চারিত্রিক স্খলনের আশঙ্কাও আরো বেড়ে যাবে। অপরদিকে কোনো মুহরামকে তার সাথে নির্বাসিত করা হলে, তা হবে- যে অপরাধী নয় তাকে শাস্তি প্রদান করা। ইমাম মালেক (রহ.) এর এ অভিমত অধিকাংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

বিবাহিতের যিনার শাস্তিঃ

বিবাহিত অবস্থায় যিনা করলে- পুরুষ হোক বা নারী- তার জন্য সাব্যস্ত দণ্ড হল- ‘রজম’ তথা প্রস্তর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, মনীবের স্ত্রীর সাথে জনৈক মজুরের যিনার ঘটনায় রাসূল (সা.) হযরত উনায়স আল-আসলামী (রা.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন-

“যদি মেয়েটি স্বীকার করে, তাহলে তুমি তাকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দাও।” মেয়েটি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে এবং তাকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।[১৮]

যিনাকারীদের পরকালীন শাস্তিঃ

রাসূল (সা.) বলেছেন, “আমি স্বপ্নে একটি চুলা দেখতে পেলাম যার উপরের অংশ ছিল চাপা আর নিচের অংশ ছিল প্রশস্ত আর যেখানে আগুন উত্তপ্ত হচ্ছিল। ভিতরে নারী পুরুষরা চিল্লাচিল্লি করছিল। আগুনের শিখা

---

১৮. সহীহ আল বুখারী, (কিতাবুশ শুরুত), হা.নং: ২৫৭৫; সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৬৯৭।

উপরে উঠলে তারা উপরে উঠছে, আবার আগুন স্তিমিত হলে তারা নিচে যাচ্ছিল, সর্বদা তাদের এ অবস্থা চলছিল। আমি জিবরীল (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? জিবরীল (আ.) বললো "তারা হল অবৈধ যৌনাচারকারী নারী ও পুরুষ।" (সহীহ বুখারী)

৪। সমকামিতার শাস্তিঃ

"যে ব্যক্তি লূত সম্প্রদায়ের ন্যায় কুকর্ম করবে। কুকর্মকারী ও যার সাথে কুকর্ম করা হয়েছে তাকে মেরে ফেলা হবে।" (সুনান ইবনু মাজাহ, হা.নংঃ ২৫৬১)

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, কিয়ামতের দিন সমকামীদেরকে বানর ও খিনযীরের (শুয়ার) আকৃতিতে উঠানো হবে।

মুজাহিদ (রহ.) বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি লূত সম্প্রদায়ের ন্যায় কুকর্মে লিপ্ত হয়ে আসমানে যত ফোঁটা পানি আছে তা সব দিয়ে গোসল করে আর যমীনের পানি দিয়ে নাপাকী দূর করে তবুও তার নাপাকী দূর হবে না।

জাবের বিন যায়েদ বলেন, সমকামীকে প্রস্তরাঘাত করা হবে।

ইমাম আহমাদ, যুহরী, মালেক, শাফিঈ প্রমুখ তাবেয়ীগণও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ সমকামীকে প্রস্তরাঘাত করা হবে। সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত হোক।

সমকামীদের ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত শাস্তিগুলো হলো- ভূমি ধ্বসে যাওয়া, পাথর নিক্ষেপ, জাহান্নামে প্রবেশ করা।

পুরুষদের সমকামিতার শাস্তিঃ

যদি দু'জন পুরুষ সমকামিতার মত ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হয়, তবে এক্ষেত্রে দণ্ড প্রদানে হানাফী ফকীহগণের মত হল- তাদেরকে তা'যীর করতে হবে এবং বন্দী অবস্থায় রাখতে হবে; যতদিন না তারা তাওবা করে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনে ফিরে আসে নতুবা মৃত্যুবরণ করে। যদি কেউ সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে বিচারক রাষ্ট্রের স্বার্থ বিবেচনা করে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারবে- হোক সে বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত। তবে

তাদের ওপর যিনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে না, যেহেতু এ অপরাধ যিনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ এবং হাম্বলী ফকীহগণের মতে, সমকামী দুজনের ওপরই যিনার হদ্দ কায়েম করতে হবে। যদি তারা অবিবাহিত হয়, তাহলে তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হবে। আর যদি বিবাহিত হয়, তাহলে তাদেরকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

মালিকী ফকীহগণের মতে, সমকামীদেরকে সর্বাবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে; হোক তারা বিবাহিত কিংবা অবিবাহিত।

শাফিঈ ফকীহগণের মতে, সমকামী কর্তার ওপর যিনার হদ্দ প্রযোজ্য হবে আর অপরজনকে বেত্রাঘাত এবং নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হবে, সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত।

মহিলাদের সমকামিতার শাস্তি:

মহিলাদের সমকামিতাও একটি ঘৃণ্য ও গর্হিত অপরাধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “মহিলাদের সমকামিতাও যিনাবিশেষ।”[১৯]

ইবনু হাজর আল আসকালানী (রহ.) এ অপরাধকে কবীরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করেছেন। তবে ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ অপরাধ যেহেতু যিনার সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না, তাই এ অপরাধের জন্য যিনার হদ্দ প্রদান করা হবে না। এক্ষেত্রে তা'যীর[২০] করা হবে।

---

১৯. আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, খ.২৪, পৃ.২৫২।

২০. যে সব অপরাধের জন্য শরীয়ত নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি নির্ধারণ করে দেয়নি সে সব অপরাধের শাস্তিকে তা'যীর বলা হয়। যেমন- বেগানা মহিলাকে চুমো দেয়া, যিনা ব্যতিরেকে কাউকে অন্য কোনো অপরাধের অপবাদ দেয়া, বিনা হেফাযতের মাল চুরি করা, খাদ্যে ভেজাল দেয়া, মাপে কম দেয়া, গালি-গালাজ করা, মারধর করা, প্রতারণা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও ঘুষ খাওয়া প্রভৃতি।

এক্ষেত্রে অপরাধ, অপরাধী, সময় ও পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচারক যতটুকু ও যেরূপ শাস্তি দান করা যৌক্তিক মনে করবেন, ততটুকুই দেবেন।

তা'যীরী শাস্তির বিভিন্ন ধরন- মৃত্যুদণ্ড, বেত্রাঘাত, বন্দী করা, নির্বাসন, বয়কট, সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা, আর্থিক দণ্ড ইত্যাদি।

৫। ‘কাযাফ’ তথা অপবাদ-এর শাস্তিঃ

যদি কেউ কোন পুরুষ বা নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার বা সমকামিতার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং তা যদি উপযুক্ত চারজন সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণিত না হয়, তবে উক্ত অভিযোগকে ‘কাযাফ’ হিসেবে গণ্য করা হয়।

আল্লাহ তা’আলা বলেন-

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ
جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ٤ اِلَّا الَّذِيْنَ
تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥

“যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি যিনার অভিযোগ আরোপ করে, পরে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কোড়া মারো। উপরন্তু, তাদের সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণ করবে না। তারা ফাসিক। তবে যারা এরপর তাওবা করবে এবং নিজেদের সংশোধন করে নেবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ (তাদের জন্য) ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।” (সূরা আন-নূরঃ আয়াত ৪-৫)

এ আয়াতে শুধু মহিলাদের প্রতি যিনার অভিযোগের কথা বলা হলেও পুরুষদের প্রতি অভিযোগের ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

উদ্ধৃত আয়াত হতে দুনিয়াতে ‘কাযাফ’-এর দু’প্রকারের শাস্তির বিধান নির্ধারিত রয়েছে। একটি শাস্তি হল- ৮০টি বেত্রাঘাত। অপর শাস্তি হল- চিরদিনের জন্য অপবাদ দানকারীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান।

অপবাদ আরোপকারীর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান

ইমামগণ সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, অপবাদ দানকারীর তাওবা ব্যতীত তার কোনো সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে জীবনের বাকি সময় ফাসিক হিসেবেই পরিগণিত হবে। যদি সে তাওবা করে, তবুও সে সারা জীবন ফাসিক হিসেবে পরিগণিত হবে কিনা এবং তার কোনো সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে কিনা- এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে ভিন্নমত লক্ষণীয়।

হানাফী ফকীহগণের মতে, তাওবা করলে অপবাদ আরোপকারীর উপর থেকে ফাসিকের কলঙ্ক মুছে যাবে; তবে তার সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণযোগ্য

হবে না। তাঁদের মত হলো, وَّلَا تَقۡبَلُوۡا لَهُمۡ شَهَادَةً اَبَدًا "কখনো তাদের কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করো না।"- বলে কুরআন দ্ব্যর্থহীন ফায়সালা দিয়েছে। হাদিসেও বর্ণিত হয়েছে, "এক মুসলমান অপর মুসলমানের জন্য সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে খুবই ন্যায়নিষ্ঠ, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় যারা মিথ্যা অপবাদ আরোপের অপরাধে দণ্ডিত হয়েছে।"

অন্যান্য ইমামগণের মত হল- তাওবার পর ফাসিকের কলঙ্ক মুছে যাবে এবং একইসাথে তাদের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। তাদের মত হল, তাওবা করার মাধ্যমে যাবতীয় পাপ মুছে যায়।

রাসূল (সা.) বলেছেন, "পাপকর্ম থেকে তাওবাকারী এমন ব্যক্তির মতো হয়ে যায়, যার কোনো পাপ নেই।"[২১]

এ হাদীসের প্রেক্ষিতে তাদের অভিমত হল, কুফরী অপবাদ থেকেও বড় অপরাধ। কাফির তাওবা করে মুসলিম হওয়ার পর যদি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তবে মুসলিম তাওবা করলে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম শা'বী ও দাহ্হাকের অভিমত হল- স্বীকারোক্তি দ্বারা অপবাদ আরোপ প্রমাণিত হওয়ার পর অপবাদ দানকারী খালিস তাওবাহ করলে সেক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যদি তার আচরণে তাওবার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৬। মদ সেবনের শাস্তি:

ঈমামগণ সকলেই একমত যে, মদ্যপায়ীর শাস্তি হল- বেত্রাঘাত। তবে বেত্রাঘাতের সংখ্যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

হানাফী ও মালিকী ফকীহগণের মতে, মদ্যপানের শাস্তি হল- আশিটি বেত্রাঘাত। তাঁদের মত হল, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদক দ্রব্য সেবনের অপরাধে খেজুরের দুটি ডালি দিয়ে চল্লিশটি আঘাত দিতেন। আবূ বকর (রা.)ও তা-ই করেছেন এবং উমর (রা.) মদ্যপায়ীদের শাস্তি নির্ধারণের জন্য সাহাবীগণের নিকট থেকে পরামর্শ চাইলেন। তখন হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.) বললেন, "তার শাস্তি হালকাতম হদ্দ- আশিটি

---

২১. ইবনু মাজাহ, (বাবঃ যিকরুত তাওবাহ), হা.নং: ৪২৫০; বায়হাকী, আস-সুনান আল-কুবরা, হা.নং: ২০৩৪৮, ২০৩৪৯।

বেত্রাঘাতই নির্ধারণ করুন।" তখন হযরত উমর (রা.) এ দণ্ডই কার্যকর করতে নির্দেশ দিলেন।[২২]

শাফিঈ ও হাম্বলী ফকীহগণের মতে, মদ্যপানের নির্ধারিত শাস্তি হল- চল্লিশটি বেত্রাঘাত। তবে বিচারকের এ এখতিয়ার রয়েছে যে, তিনি অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে অপরাধীকে ৮০টি পর্যন্ত বেত্রাঘাত করতে পারবেন।

তাঁদের দলীল হল, রাসূল (সা.) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন এবং হযরত আবূ বাকর (রা.)ও তা-ই কার্যকর করেছেন। হযরত উসমান (রা.) অপরাধীর অবস্থা ও অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে কখনো ৪০টি, আবার কখনো ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করতেন।

এছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রে বিভিন্ন ছোটখাটো অপরাধের শাস্তিস্বরূপ নিম্নলিখিত শাস্তিগুলো প্রদান করতে পারে। যেমন, বেত্রাঘাত, বন্দী করা, সম্পদ বাজেয়াপ্ত, আর্থিক দণ্ড ইত্যাদি।

কিসাস

'কিসাস' শব্দের উৎপত্তি 'কাসসা' থেকে। 'কাসসা' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'কর্তন করা'। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় কিসাস অর্থ- যখম, অঙ্গহানি কিংবা হত্যার কারণে অপরাধীকেও শাস্তিস্বরূপ যখম করা, অঙ্গহানি কিংবা হত্যা করা অর্থাৎ অপরাধীকে তার অপরাধ সদৃশ শাস্তি প্রদান।

শরীয়ত মানুষের জীবন রক্ষার জন্য কাসাসের বিধান দিয়েছে। জীবনের মত মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিরাপত্তা বিধানও গুরুত্বপূর্ণ।

কিসাসের হুকুমঃ

কিসাস হলো- কোন ব্যক্তির হক বিনষ্টের পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান, যা ওয়াজিব।

---

২২. সহীহ মুসলিম, (কিতাবুল হুদূদ), হা.নং: ১৭০৬।

কোনো ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে, তবে হত্যাকারীকেও হত্যার বদলায় হত্যা করা কিসাসের অন্তর্ভুক্ত। তবে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেয়ার এখতিয়ার রয়েছে অথবা তারা ইচ্ছে করলে দিয়াত নিয়ে কিসাস ক্ষমা করে দিতে পারে।

অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় যখম করলে অথবা দেহের কোনো অঙ্গ বা তার অংশবিশেষ বিচ্ছিন্ন করে ফেললে হত্যাকারী ব্যক্তিকে অপরাধ সদৃশ শাস্তি প্রদান কিসাসের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

"তাদের জন্য আমরা তাতে বিধান নির্ধারণ করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমসমূহের বদলে অনুরূপ যখম। আর যে ক্ষমা করে দেয়, তা তার পাপের জন্য কাফফারা হবে।" (সূরা আল-মায়েদা: আয়াত ৩৪)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"যার কোনো ব্যক্তি নিহত হবে, তার দুটি ইখতিয়ার রয়েছে। সে ইচ্ছে করলে রক্তমূল্যও নিতে পারবে, ইচ্ছে করলে কিসাসও গ্রহণ করতে পারবে।"[২৩]

কিসাস প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি শর্ত হলো- যে অঙ্গের কিসাস নেওয়া হবে, সেই অঙ্গটি অপরাধীর অঙ্গের সদৃশ হতে হবে। যেন কিসাস নিতে গিয়ে অপরাধীর প্রতি জুলুম করা না হয়। অনুরূপ অঙ্গই শাস্তি হিসেবে কাটা যাবে। ডান হাতের বদলে বাম হাতে বা বাম হাতের বদলে ডান হাতে, উপরের দাঁতের বদলে নিচের দাঁতে, নিচের দাঁতের বদলে উপরের দাঁতে, সামনের দাঁতের বদলে মাড়ির দাঁতে, মাড়ির দাঁতের বদলে সামনের দাঁতে, বৃদ্ধাঙ্গুলির বদলে তর্জনীতে, তর্জনীর বদলে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে কিসাস নেয়া যাবে না।

---

২৩. সহীহ বুখারী, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং: ৬৪৮৬; আবূ দাউদ (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং: ৪৫০৫।

উল্লেখ্য, যেসব ক্ষেত্রে যখমের সমপরিমাণ বদলা নেয়া সম্ভব, কেবল সেসব ক্ষেত্রেই কিসাস প্রযোজ্য হবে এবং যে ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয় (যেমন, কারো হাত বা পা ভেঙ্গে ফেললে, কিসাসস্বরূপ কর্তনকারীর হাত বা পা কাটা যাবে না, কারণ এক্ষেত্রে অপরাধের সাথে সমতা রক্ষা করে অপরাধীর হাত বা পা কাটা সম্ভব নয়) সেক্ষেত্রে দিয়াত অথবা অন্য কোনো সাধারণ দণ্ড কার্যকর হবে।

অর্থাৎ কোন গ্রন্থিসন্ধি থেকে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হলেই কেবল সেক্ষেত্রে কিসাস প্রযোজ্য হবে।

দিয়াত

দিয়াত হল- খুনের দায়ে হত্যাকারীর ওপর কিংবা মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্ষতিসাধনের দায়ে অপরাধীর ওপর আরোপিত সুনির্দিষ্ট পরিমাণ প্রদেয় সম্পদ।

ভুলবশত হত্যার দিয়াত-

ভুলবশত হত্যার কোনো কিসাস নেই। তবে এক্ষেত্রে হত্যাকারী ও তার বংশের পুরুষ লোকদের ওপর দিয়াত বাধ্যতামূলক হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“ভুলবশত হত্যার দিয়াত পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। এগুলো হল- এক বৎসর বয়সের বিশটি উট ও বিশটি উষ্ট্রী, দু’বৎসর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী, তিন বৎসর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী এবং চার বৎসর বয়সের বিশটি উষ্ট্রী।” (ইবনু ‘আবদিল বারর, আত-তামহীদ, খ.৪, পৃ.৬৪, খ.১৭, পৃ.২৫০)

দিয়াতস্বরূপ উটের পরিবর্তে এক হাজার দীনার বা দশ হাজার দিরহাম অথবা এর সমপরিমাণ যেকোনো অর্থসম্পদও আদায় করা যাবে।

ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত-

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

“যে ব্যক্তি অপরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করল, তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের কাছে সমর্পণ করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করবে অথবা ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করবে। দিয়াতের পরিমাণ হল- ত্রিশটি তিন বৎসর বয়সের, ৩০টি চার বৎসর বয়সের এবং ৪০টি গর্ভবতী উষ্ট্রী। আর যদি তারা সমঝোতা করে তবে যে পরিমাণের বিনিময়ে সমঝোতা হয়েছে, তা-ই তারা পাবে। এ বিধান দিয়াতে কঠোরতা সৃষ্টির জন্য আরোপ করা হয়েছে।”[২৪]

উল্লেখ্য, পূর্ণ দিয়াতের পরিমাণ হল- একশ উট বা তার সমতুল্য মূল্য। (আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ. ৬৮)

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতিসাধনের দিয়াত-

শরীরে যে সব অঙ্গ দু'টি রয়েছে (যেমন- হাত, পা, চোখ, কান, ওষ্ঠ, ভ্রূ, স্তন, অণ্ড, চোয়াল), অপরাধী দুটিই কর্তন করলে অথবা তার কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দিলে পূর্ণ দিয়াত প্রযোজ্য হবে। আর কোনো একটি কর্তন করলে কিংবা বিচ্ছিন্ন করলে অথবা তার কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দিলে অর্ধেক দিয়াত প্রযোজ্য হবে।

হাত কিংবা পায়ের সব আঙ্গুলে ক্ষতিসাধন করলে পূর্ণ দিয়াত প্রযোজ্য হবে। এক-একটি আঙ্গুলে ক্ষতিসাধনের জন্য এক-দশমাংশ দিয়াত ধার্য হবে। (আস-সারাখসী, আল-মাবসূত, খ.২৬, পৃ.৭১)

ইসলামের শাস্তি আইন যেমন কঠোর করা হয়েছে তেমনি তার প্রয়োগ অনেক শর্তসাপেক্ষ করা হয়েছে, যেন নিরপরাধ কোন ব্যক্তি কোনোভাবেই শাস্তি না পায়। অপরাধ শতভাগ প্রমাণিত হওয়া, অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ ওযর না থাকা এবং অপরাধের শাস্তিযোগ্যতার পর্যায় নিশ্চিত হওয়া ইসলামের শাস্তি আইন প্রয়োগের অন্যতম পূর্বশর্তগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সামান্য সন্দেহ হলে বিচারক অপেক্ষাকৃত হালকা শাস্তি প্রদান করবেন, যেন অপরাধীর ওপর সামান্যতম যুলুম না হয়।

ইসলামী আইনই একমাত্র আইন, যা সকল অপরাধ নির্মূল করে মানুষকে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে সক্ষম। এ আইন সর্বদাই মানব রচিত

---

২৪. ইবনু মাজাহ, (কিতাবুদ দিয়াত), হা.নং: ২৬২৬।

আইনের ঊর্ধ্বে। মানব রচিত আইন সর্বযুগে-সর্বকালে রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে মদিনায় মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল দিক থেকে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করতে সক্ষম হন। তিনি মদিনায় গড়ে তোলেন নিরাপত্তা ও পবিত্রতার এক অতুলনীয় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা।

বিদায় হজ্জের দিন রাসূল (সা.) বলেন, 'আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। আমার মাধ্যমে ওয়াহীর পরিসমাপ্তি হতে যাচ্ছে। আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এই দুটি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবেনা। একটি **আল্লাহর কিতাব** ও অপরটি **রাসূলের (সা.) সুন্নাহ**।'

৫। বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণ

ইসলামী সমাজে শ্রেণীবিভেদ, জন্মগত বা সামাজিক বৈষম্য ও পার্থক্যের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান মর্যাদা ও সমান সম্মানের অধিকারী। নবী করীম (সা.) বলেছেন,

"কারো উপর কারো কোনো শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই। তা প্রতিপন্ন হতে পারে একমাত্র দ্বীন ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞান, কর্ম ও তাকওয়ার কম বেশীর কারণে। সব মানুষই আদমের সন্তান; আর আদম মাটি হতে সৃষ্ট। আরববাসীর অনারবের উপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আনারবদেরও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই আরববাসীদের উপর। তদানুরূপ শ্বেতাংগের কৃষ্ণাংগের উপর এবং কৃষ্ণাংগেরও শ্বেতাংগের উপর কোনোই শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই।.... কারো শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার হতে পারে একমাত্র তাকওয়ার কারণে।"

কুরআনুল কারীমে ইবরাহীম (আ.) ও তার প্রত্যাবর্তন

وَاِذۡ قَالَ اِبۡرٰهِيۡمُ لِاَبِيۡهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصۡنَامًا اٰلِهَةً ۚ اِنِّىۡۤ اَرٰىكَ وَقَوۡمَكَ فِىۡ ضَلٰلٍ
مُّبِيۡنٍ. وَكَذٰلِكَ نُرِىۡۤ اِبۡرٰهِيۡمَ مَلَكُوۡتَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَلِيَكُوۡنَ مِنَ
الۡمُوۡقِنِيۡنَ. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيۡهِ الَّيۡلُ رَاٰ كَوۡكَبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِّىۡ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَاۤ
اُحِبُّ الۡاٰفِلِيۡنَ. فَلَمَّا رَاَ الۡقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىۡ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَ قَالَ لَئِنۡ لَّمۡ
يَهۡدِنِىۡ رَبِّىۡ لَاَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡقَوۡمِ الضَّآلِّيۡنَ. فَلَمَّا رَاَ الشَّمۡسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا
رَبِّىۡ هٰذَاۤ اَكۡبَرُ ۚ فَلَمَّاۤ اَفَلَتۡ قَالَ يٰقَوۡمِ اِنِّىۡ بَرِىۡٓءٌ مِّمَّا تُشۡرِكُوۡنَ. اِنِّىۡ وَجَّهۡتُ
وَجۡهِىَ لِلَّذِىۡ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ حَنِيۡفًا وَّمَاۤ اَنَا مِنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ.

অর্থ: স্মরণ করো, যখন ইবরাহিম তার পিতা আযরকে বলেছিল, 'তুমি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহরূপে গ্রহণ করছ? নিশ্চয় আমি তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট গোমরাহীতে দেখছি'। আর এভাবেই আমি ইবরাহিমকে আসমানসমূহ ও যমিনের পরিচালন ব্যবস্থা দেখাই, যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। যখন রাতের অন্ধকার তার ওপর সমাচ্ছন্ন হলো, সে একটি তারকা দেখল, সে বলল, এটা আমার রব। অতঃপর যখন তা অস্ত গেল, তখন সে বলল, আমি ভালোবাসি না অস্তগামীদের। অতঃপর যখন সে চাঁদ উজ্জ্বলরূপে উদীয়মান দেখল, সে বলল, এটি আমার রব। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো, সে বলল, যদি আমার রব আমাকে হিদায়াত না করেন, নিশ্চয় আমি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর যখন সে সূর্য উজ্জ্বলরূপে উদীয়মান দেখল, সে বলল, এটিই আমার রব, এটি সবচেয়ে বড়। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয় আমি তা থেকে মুক্ত, যা তোমরা শরিক করো।' নিশ্চয়ই আমি একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তাভিমুখী, যিনি আসমানসমূহ

ও যমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আল-আন'আম, আয়াত:৭৪-৭৯)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَآ اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ
مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ. قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ.
قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ. قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ
مِنَ اللّٰعِبِيْنَ. قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ ز وَاَنَا
عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ. وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا
مُدْبِرِيْنَ. فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ. قَالُوْا مَنْ
فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ. قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ
اِبْرٰهِيْمُ. قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ. قَالُوْٓا ءَاَنْتَ
فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ. قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ ۖ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ
كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ. فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ. ثُمَّ
نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ ۚ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ. قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُرُّكُمْ. اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ. قُلْنَا
يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ. وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ
الْاَخْسَرِيْنَ.

অর্থ: (৫১) আর আমি ইতঃপূর্বে ইবরাহীমকে সরল পথের জ্ঞান দান করেছিলাম আর আমি তার সম্পর্কে ছিলাম অবগত। (৫২) যখন সে তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'এই মূর্তিগুলো কী, যেগুলোর সামনে তোমরা পূজায় রত?' (৫৩) তারা বলল, 'আমরা পেয়েছি আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এগুলোর পূজা করা অবস্থায়।' (৫৪) সে বলল, 'তোমরা

এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আছো স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে।' ৫৫। তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ আগমন করেছ, নাকি তুমি কৌতুককারীদের অন্তর্ভুক্ত?' ৫৬। সে বলল, 'বরং তোমাদের রব তো আসমানসমূহ ও যমীনের রব, যিনি সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। আর আমি এই বিষয়ের সাক্ষ্যদাতা।' ৫৭। 'আর আল্লাহর কসম! তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব।' ৫৮। অতঃপর সে সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল; সেগুলোর বড়টি ছাড়া, যেন তারা সেটির কাছে ফিরে আসে। ৫৯। তারা বলল, 'আমাদের উপাস্যদের সাথে এই কাজ কে করল? নিশ্চয় সে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।' ৬০। তারা বলল, 'আমরা শুনেছি এক যুবকের কথা, সে তাদের সমালোচনা করে; তাকে ডাকা হয় ইবরাহীম (নামে)।' ৬১। তারা বলল, 'তাকে উপস্থিত করো জনসম্মুখে, যেন তারা সাক্ষ্য দিতে পারে।' ৬২। তারা বলল, 'হে ইবরাহীম, তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এটা করেছ?' ৬৩। সে বলল, 'বরং তাদের এ বড়টিই এটা করেছে, তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, যদি তারা কথা বলতে পারে।' ৬৪। তখন তারা ফিরে এলো নিজেদের মনের কাছে (আত্মসমালোচনায়) এবং (একে অপরকে) বলল, 'তোমারাই তো সীমালঙ্ঘনকারী।' ৬৫। অতঃপর তাদের মাথা অবনত হয়ে গেল এবং বলল, 'অবশ্যই তুমি তো জানো, এরা কথা বলতে পারে না।' ৬৬। সে বলল, 'তাহলে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদাত করো, যা তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে না এবং কোনো ক্ষতিও করতে পারে না?' ৬৭। 'ধিক তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যেগুলোর ইবাদাত করো, ওগুলোর প্রতি। তোমরা কি বুঝবে না?' (৬৮) তারা বলল, 'তোমরা তাকে পুড়িয়ে দাও আগুনে এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও।' (৬৯) আমি বললাম, 'হে আগুন, তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য।' ৭০। আর তারা তাঁর বিরুদ্ধে করতে চাইল এক চক্রান্ত, কিন্তু আমি তাদেরকেই করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৫১-৭০)

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ . اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ . فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ. فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ. فَتَوَلَّوْا

عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ. فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ. مَا لَكُمْ لَاتَنْطِقُوْنَ. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ. فَاَقْبَلُوْٓا اِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ. قَالَ اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ.

অর্থ: যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কিসের ইবাদাত করছো?' 'তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে মিথ্যা ইলাহ কামনা করছো?' 'তাহলে বিশ্বজগতের রব সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী?' অতঃপর সে একবার তারকারাজির দিকে তাকালো। এবং বলল, 'আমি অসুস্থ।' অতঃপর তারা তাকে পেছনে রেখে চলে গেল। অতঃপর সে তাদের দেবতাদের কাছে গিয়ে বলল, 'তোমরা খাচ্ছো না কেন?' 'তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা কথা বলছো না?' অতঃপর সে তাদের ওপর সজোরে আঘাত হানলো। তখন লোকজন তার দিকে ছুটে আসলো। সে বলল, 'তোমরা কি সেগুলোর উপাসনা করো, যা তোমরা নিজেরা (পাথর) খোদাই করে তৈরি করো?' 'অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা নির্মাণ করো তা-ও।' (সূরা আস্-সাফ্‌ফাত, আয়াত: ৮৫-৯৬)

وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: আর স্মরণ করো ইবরাহীমকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাঁকে ভয় করো। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে।' (সূরা আল-আনকাবূত, আয়াত: ১৬)

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْـًٔا.

অর্থ: যখন সে তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা, তুমি কেন এমন জিনিসের ইবাদাত করো যা শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোনো উপকারে আসে না?' (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৪২)

وَاِذۡ قَالَ اِبۡرٰهِیۡمُ لِاَبِیۡهِ وَقَوۡمِهٖۤ اِنَّنِیۡ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعۡبُدُوۡنَ. اِلَّا الَّذِیۡ فَطَرَنِیۡ فَاِنَّهٗ سَیَهۡدِیۡنِ.

অর্থ: আর স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা যেগুলোর ইবাদাত করো, নিশ্চয় আমি সেগুলো থেকে সম্পর্কমুক্ত।' 'তবে (তিনি ছাড়া) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আর নিশ্চয় তিনিই আমাকে শীঘ্রই হিদায়াত দান করবেন।' (সূরা আয্-যুখরুফ, আয়াত: ২৬-২৭)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِیۡهِمۡ اُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنۡ كَانَ یَرۡجُوا اللّٰهَ وَالۡیَوۡمَ الۡاٰخِرَ ؕ وَمَنۡ یَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الۡغَنِیُّ الۡحَمِیۡدُ.

অর্থ: তোমরা যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রত্যাশা করো, নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে তাদের [ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর অনুসারী] মধ্যে উত্তম আদর্শ, আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে জেনে রাখুক), নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত। (সূরা আল-মুমতাহিনা, আয়াত: ৬)

ইসলাম মানবতার ধর্ম- ‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, তোমরা সবাই মুক্ত’

রাসূল (সা.) মক্কায় বনী হাশেম বংশে ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আউয়াল মাসে, সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। সীরাত বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ ৯ই রবিউল আউয়াল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

তরুণ বয়সে রাসূল (সা.) বকরী চরাতেন। তিনি বনী সা’দ গোত্রে এবং মক্কাতেও বকরী চরিয়েছিলেন। (ইবনে হেশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৬২,১৬৬)

নবী (সা.) ছিলেন সবার চেয়ে উত্তম চরিত্রের অধিকারী, অধিক সত্যবাদী ও সর্বাধিক পবিত্র পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী। স্বজাতির লোকদের দূর্বল শেরেকপূর্ণ আকীদা বিশ্বাসের সাথে তাঁর মানসিক চিন্তার দূরত্ব ছিল অনেক প্রশস্ত। জাহেলিয়াতপূর্ণ সমাজে তিনি নিঃসঙ্গতাপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তার বয়স যখন চল্লিশ বছরের কাছাকাছি, তখন তিনি হেরা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে সময় কাটাতে থাকলেন।

নবী (সা.) চল্লিশ বছর বয়সে হেরা গুহায় নবুওয়্যাত লাভ করেন। ফেরেশতা হয়রত জিবরীল (আ.) মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হুকুমে হাজির হন।

অতঃপর নাযিল হলো পবিত্র কুরআনুল কারীমের প্রথম ৫ আয়াত-

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ١ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٢ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ
الْاَكْرَمُ ٣ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ٥

অর্থ: ‘পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পড়, আর তোমার রব মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।’ (সূরা আল-আলাক, আয়াত: ১-৫)

এরপর কিছুকাল ওহী স্থগিত থাকার পর পুনরায় নবী (সা.) ওহীপ্রাপ্ত হন। এসময় আল্লাহ তা'য়ালা নাযিল করেন সূরা মোদদাসসের-এর শুরু থেকে 'ওয়াররুজযা ফাহজুর' পর্যন্ত।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤
وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ٥

অর্থ: হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠ, অতঃপর সতর্ক কর। আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। তোমার পোশাক পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ। আর অপবিত্রতা বর্জন কর। (সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ১-৫)

এ ঘটনার পর থেকে ক্রমাগত ওহী নাযিল হতে থাকে। বিস্তারিত জানতে দেখুন সহীহ বোখারীতে অধ্যায়- 'কিভাবে ওহী নাযিল হয়েছিল' এবং অধ্যায়- 'ওয়ার রুজযা ফাহজুর'।

আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে ওহীপ্রাপ্ত হওয়ার পর রাসূল (সা.) মানুষকে শিরকের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে এক স্রষ্টাকে ইবাদাতের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন। সর্বপ্রথম নবীজির দাওয়াত কবুল করে ইসলামের ছায়াতলে আসলেন তার সহধর্মিনী উম্মুল মোমেনীন খাদিজা (রা.)। এরপর যায়দ ইবনে সাবেত, হযরত আলী (রা.), হযরত আবু বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে ইসলামের দাওয়াত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো এবং দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলো।

মক্কার সর্বত্র ইসলামের আলোচনা চলতে থাকে এবং দিন দিন ব্যাপকতা লাভ করে।

কোরায়শরা বুঝতে পারলো আরবের লোকদের উপর তাদের ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব নিশ্চিহ্ন হতে যাচ্ছে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের (সা.) ইচ্ছাই হবে চূড়ান্ত।

তারা নবী (সা.)-কে ঠাট্টা, উপহাস করা শুরু করলো, তাকে মিথ্যাবাদী, যাদুকর, জ্যোতিষী, পাগল, গণক, কবি বলে অপবাদ দিল, কোরআনকে পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী বলে প্রচার করতে শুরু করলো।

কোরায়শ সর্দার আবু লাহাব নবীজি (সা.)-কে পাথরও নিক্ষেপ করতো। এতে তাঁর পায়ের গোড়ালি রক্তাক্ত হয়ে যেতো। (জামে তিরমিযী)

ওকবা ইবনে আবু মোয়ায়ত রাসূল (সা.) নামাজে সেজদারত অবস্থায় তার উভয় কাঁধের মাঝখানে উটের নাড়িভুঁড়ি ফেলেছিল।

এছাড়া রাসূল (সা.) যখন নামাজ আদায় করতেন তখন তাদের কেউ বকরীর নাড়িভুঁড়ি খুঁজে এমনভাবে ছুঁড়ে মারতো, যা সোজা তাঁর গায়ে গিয়ে পড়তো। রাসূল (সা.) পরে নিরাপদে নামাজ আদায়ের জন্যে বাধ্য হয়ে ঘরের ভেতর জায়গা করে নিয়েছিলেন।

ওকবা একবার নিজের চাদর রাসূল (সা.) এর গলায় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করতে চাচ্ছিলো। হযরত আবু বকর (রা.) ওকবাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন। (সহীহ বুখারী, ১ম খন্ড)

যারা ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করছিলো তাদের সাথেও নানা ধরনের যুলুম অত্যাচারপূর্ণ আচরণ করা হচ্ছিলো।

হযরত ওসমান (রা.)-কে খেজুরের চাটাইয়ের মধ্যে জড়িয়ে নীচে থেকে ধুঁয়া দেওয়া হতো।

মোসয়াব (রা.)-কে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিলো। বেলাল (রা.)-কে উত্তপ্ত বালির উপর অভুক্ত, পিপাসার্ত অবস্থায় রাখা হতো। কখনো তাকে উত্তপ্ত রোদে বালুকার উপর শুইয়ে বুকের উপর ভারি পাথর চাপা দিয়ে রাখা হতো।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)-কেও উত্তপ্ত রোদে বালুকাময় প্রান্তরে শুইয়ে রেখে কষ্ট দেয়া হতো।

হযরত আম্মারের মা হযরত সুমাইয়া (রা.)-এর লজ্জাস্থানে আবু জাহল বর্শা নিক্ষেপ করে। এতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন এবং ইসলামের প্রথম নারী শহীদের মর্যাদা লাভ করেন।

খাব্বাব (রা.)-কে জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিলো।

কোনো কোনো সাহাবীকে উট এবং গাভীর কাঁচা চামড়ার ভেতর জড়িয়ে রোদে ফেলে রাখা হতো। কাউকে কাউকে লোহার বর্ম পরিয়ে জ্বলন্ত পাথরের উপর শুইয়ে রাখতো। আল্লাহর পথে যারা অত্যাচার নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু হয়েছিলো, প্রকৃতপক্ষে তাদের তালিকা খুবই দীর্ঘ এবং বড়োই বেদনাদায়ক। সবশেষে মোশরেকরা রাসূল (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

তখন রাসূল (সা.) এর চাচা আবু তালেব- হাশেম এবং মোত্তালেবের বংশধরদের একত্রিত করে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে রক্ষা ও সহায়তা করার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। আরবের গোত্রীয় মর্যাদাবোধের প্রেক্ষিতে হাশেম ও মোত্তালেবের বংশধরদের কাফের মুসলিম নির্বিশেষে সবাই সাড়া দেয়। আবু তালেবের এ আহবানে শুধু তার ভাই আবু লাহাব ভিন্নমত পোষণ করে।

মোশরেকরা একত্র হয়ে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালেবের সাথে বেচা-কেনা, মেলামেশা বন্ধ করে সর্বাত্মক বয়কটের ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। এর পরিণামে আবু লাহাব ব্যতীত বনু হাশেম ও বনু মোত্তালেবের মুসলিম-অমুসলিম, নারী-পুরুষ, শিশু সবাই শে'বে আবু তালেবে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এটা নবুয়তের সপ্তম বছরের ঘটনা।

অবরুদ্ধদের অবস্থা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। গাছের পাতা এবং চামড়া খেয়ে তাদের জীবন ধারণ করতে হয়। অতি কষ্টে তাদের কাছে কোনো খাদ্যসামগ্রী পৌঁছাতো। এ অবস্থায় পুরো তিন বছর কেটে যায়। এরপর নবুয়তের দশম বর্ষে এ অত্যাচার নির্যাতনমূলক বয়কটের অবসান ঘটে।

উল্লিখিত ভয় শংকাপূর্ণ অবস্থায় কোরআনের এমন সব সূরা এবং আয়াত নাযিল হচ্ছিলো, যেখানে মুসলমানদের অনুরাগ অনুভূতিকে সাহসিকতা ও অবিচলতায় উদ্দীপিত করা হচ্ছিলো। সে সকল আয়াতে মুসলমানদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত, সন্তুষ্টি ও স্থায়ী নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছিলো।

পাশাপাশি এমন সব আয়াত নাযিল হচ্ছিলো যেসব আয়াতে কাফের মোশরেকদের বিভিন্ন প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছিলো।

নবুয়তের দশম বর্ষে নবীজি (সা.) তায়েফে গমন করেন এবং সেখানের গোত্র সর্দারদের কাছে পৌঁছে তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য এবং ইসলামের সাহায্য করার আহবান জানান। তিনি একেক করে তায়েফের প্রত্যেক নেতৃস্থানীয় লোকের কাছে যান এবং তাদের সাথে কথা বলেন, কিন্তু সবার একই জবাব- তুমি আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও।

অতঃপর রাসূল (সা.) ফেরার সংকল্প করলে দুর্বৃত্তরা তাকে গালাগাল করলো। নবী (সা.) এর চলার পথে তারা পাথর ছুড়তে থাকে। এতে তাঁর দু'পায়ের গোড়ালি রক্তাক্ত হয়ে জুতা রক্তে ভিজে যায়।

আল্লাহ তা'য়ালা পাহাড়ের ফেরেশতাদেরকে পাঠালেন। তারা রাসূল (সা.)-কে সালাম জানিয়ে বললো, 'আপনি যদি চান তবে আমরা এদের দুই পাহাড়ের মধ্যে রেখে পিষে দেবো।'

তিনি বললেন, 'না, আমি আশা করি আল্লাহ তা'য়ালা তাদের বংশধরদের মধ্যে থেকে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন, যারা শুধু এক আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।' (সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ.৪৫৮)

নবুয়তের একাদশ বর্ষে হজ্জ মওসুমে ইয়াসরেবের ছয় জন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা রাসূল (সা.) এর সাথে ওয়াদা করেছিলেন, নিজেদের কওমের কাছে ফিরে গিয়ে তাঁর রেসালাতের তাবলীগ করবেন।

পরবর্তী বছর নবুয়তের দ্বাদশ বর্ষে হজ্জ মওসুমে ১৩ জন লোক রাসূল (সা.) এর কাছে আসেন। তাদের ৫ জন গত বছরও এসেছিলেন।

তারা সবাই মিনায় আকাবার কাছে রাসূল (সা.) এর সাথে সাক্ষাত করে কয়েকটি বিষয়ে তাঁর কাছে বায়াত করেন, যা ছিল প্রথম বায়াতে আকাবা।

বায়াত পুরো হয়ে গেলো এবং হজ্জও শেষ হলো। রাসূল (সা.) ইয়াসরেব থেকে আগত লোকদের সাথে মোসয়াব ইবনে উমায়ের (রা.)-কে দূতের দায়িত্ব দিয়ে ইয়াসরেবে প্রেরণ করেন। মুসলমানদের ইসলামের বিধি বিধান শেখানো এবং যারা এখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানোই ছিলো দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য।

মোসআব ইবনে উমায়েরের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মদিনায় মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে এবং পরবর্তী হজ্জ মৌসুম আসার আগে এমন অবস্থা হয় যে মদিনার প্রতিটি বাড়িতে একজন হলেও ইসলাম গ্রহণ করে।

নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে মদিনা থেকে ৭০ জন মুসলমান হজ্জ পালনের জন্যে মক্কায় আগমন করেন। তারা আকাবার ঘাটিতে রাসূল (সা.) এর সাথে গোপনে একত্রিত হন এবং তার কাছে কয়েকটি বিষয়ে বায়াত করেন।

হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনার কাছে কি কি বিষয়ের ওপর বায়াত করবো? তিনি বললেন, নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর ওপর-

১. ভালোমন্দ সকল অবস্থায় আমার কথা শুনবে এবং মানবে।
২. স্বচ্ছলতা অস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায়ই ধন-সম্পদ ব্যয় করবে।
৩. সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।
৪. আল্লাহর পথে উঠে দাঁড়াবে এবং তাঁর ব্যাপারে কারো ভর্ৎসনা তিরস্কারের পরোয়া করবে না।
৫. তোমাদের কাছে যাওয়ার পর আমাকে সাহায্য করবে এবং যেভাবে নিজেদের প্রাণ ও সন্তানদের হেফাযত করো, সেভাবে আমারও হেফাযত করবে, এতে তোমাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত।

এটি ছিল দ্বিতীয় বায়াতে আকাবা। এর মূলে ছিলো আল্লাহর প্রতি, রাসূল (সা.) এর প্রতি এবং কোরআনের প্রতি ঈমান।

কোরায়শরা এ বায়াতে আকাবার খবর পাওয়ার পর দিশেহারা হয়ে পড়ে। কেননা এ বায়াতের সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলো।

দ্বিতীয় বায়াতে আকাবা সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে ইসলাম নিজের একটি আবাসভূমির বুনিয়াদ স্থাপনে সফল হয়। তখন রাসূল (সা.) মুসলমানদেরকে নিজেদের নতুন দেশে হিজরত করে চলে যাওয়ার অনুমতি দেন। মোশরেকরা তাদের যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। শেষমেষ তারা আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হয়।

অতঃপর হযরত জিবরীল (আ.) ওহী নিয়ে হাজির হন এবং আল্লাহর রাসূল (সা.)-কে কোরায়শদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করেন।

এ খবর পাওয়ার পর রাসূল (সা.) আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে মদিনার পথে হিজরত করেন।

নবুয়তের চতুর্দশ বছরের ৮ই রবিউল আউয়াল, সোমবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোবায় অবতরণ করেন।

মুসলমানরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের খুশীতে তাকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে বেরিয়ে পড়েন। অতঃপর তারা পতংগের মতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে একত্র হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মদিনায় প্রবেশ

বনু সালেম ইবনে আওফের মহল্লায় জুমার নামায আদায়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় গমন করেন।

এদিন মদিনার অলিগলিতে আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা ধ্বনি গুঞ্জরিত হচ্ছিলো। আনসারদের কন্যা শিশুরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে গান গাইছিলো।

রাসূল (সা.)-ই ছিলেন এ নতুন সমাজ রূপায়ণ ও বিনির্মানের ইমাম, নেতা এবং পথপ্রদর্শক।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববী নির্মাণের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্মিলন ও মিল মহব্বতের একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। এতে মুসলমানরা ইসলামের শিক্ষা ও হেদায়াতের পাঠ গ্রহণ করতেন।

রাসূল (সা.) এর কিছু হাদিস

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতোক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" (সহীহ বুখারী, হা.নং: ১৩; সহীহ মুসলিম, হা.নং: ৪৫)

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,
"যেই ব্যক্তি তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হিফাজতের যামিন হবে আমি তার জান্নাতের যামিন হবো।" (সাহ্ল ইবনু সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত; সহীহুল বুখারী)

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। (সহীহ বুখারী)

আতিয়া সা'আদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "বান্দাহ ততোক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকিদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না, যতোক্ষণ না সে গুনাহের কাজে নিমজ্জিত হবার আশংকায় ঐ সব কাজও পরিত্যাগ করে, যাতে কোনো গুনাহ নেই।" (তিরমিযী শরীফ)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,
"পূর্ণ মুমিন তাঁরাই যাদের চরিত্র মহান ও সুন্দরতম।" (আবূ দাউদ)

“হিংসা থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয়ই হিংসা নেক কাজগুলোকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন লাকড়ীকে খেয়ে থাকে।” (আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত; সুনানে আবু দাঊদ)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,
“বলবান সে নয় যে কুস্তিতে অন্যকে পরাজিত করে বরং বলবান সে যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।” (আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, সহীহুল বুখারী)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যথাযথভাবে আদায় করে, রমযানে রোযা রাখে, লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে, স্বীয় স্বামীর অনুগত থাকে, শেষ বিচারের দিন তাকে বলা হবে, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি তা দিয়ে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো।” (ইবনে হিব্বান, আলবানীর সম্পাদিত সহীহ আল জামে’ আস্‌সাগীর, ৩য় খণ্ড, হাদীস নংঃ ৬৭৩)

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, “তিন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না- পিতা-মাতার অবাধ্য, দাইউস ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলা।” (হাকেম, কিতাবুল জামে আস্‌সাগীর লি আলবানী, ৩য় খণ্ড, হাদীস নংঃ ৩০৫৮)

হারেসা বিন ওহাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, “অশ্লীলভাষী ও বদমেজাজী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না।” (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, যাব ফি হুসনিল খুলক- ৩/৪০১৭)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, “যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব তাহরীমুল কিবর)

আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন,
“যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।” (আবদুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রা.) থেকে বর্ণিত। সহীহ মুসলিম, সুনানে তিরমিযী)

“যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই (তার ঈমান অপূর্ণ)।” (আহমাদ)

“রক্তের সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যার চরিত্র উত্তম।” (সহীহ বুখারী)

নবী করীম (সা.) আরও বলেছেন,

“নিশ্চয়ই আল্লাহ অশালীন ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন।” (তিরমিযী)

“সকল সৃষ্টিই আল্লাহ তা'য়ালার পরিজন। সৃষ্টির মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় যে তাঁর পরিজনের প্রতি সদয়।” (বায়হাকী)

ইবনু ‘উমার (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মুসলিম মুসলিমের ভাই, সে তার ওপর অত্যাচার করবে না এবং তাকে অত্যাচারীর হাতে ছেড়ে দিবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করবে, মহান আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কোনো এক বিপদ দূর করে দিবে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বহু বিপদের একটি বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, মহান আল্লাহ কিয়ামতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। (সহীহ বুখারী, হা.নং: ২৪৪২; সহীহ মুসলিম হা.নং: ২৫৮০)

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, “মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের ওপরই কায়েম থাকে। কাজেই তোমরা কাকে বন্ধু বানাও তা প্রত্যেকই ভেবে-চিন্তে নাও।”

এছাড়া এ মসজিদের মর্যাদা ছিলো একটি সংসদের মতো, যেখানে মজলিসে শূরা (পরামর্শ সভা) এবং মজলিসে এন্তেযামিয়া (ব্যবস্থাপনা পরিষদ)-এর অধিবেশন বসতো।

মুসলমানরা কাফেরদের কবল থেকে বেরিয়ে গেছে এবং মদিনায় নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে, এটা দেখে কাফেরদের ক্রোধ আরো বেড়ে যায়।

কোরায়শরা মুসলমানদের খবর পাঠালো, তোমরা মনে করো না, মক্কা থেকে গিয়ে নিরাপদে থাকবে; আমরা ইয়াসরেব পৌঁছে তোমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বো।

যুদ্ধের অনুমতি

এ শংকাজনক পরিস্থিতি মদিনার মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্যে ছিলো বিশেষ হুমকি।
আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনের আয়াত নাযিল করেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ 39

'যাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা হল, কেননা তারা মজলুম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।' (সূরা আল-হাজ্জ: আয়াত ৩৯)

হিজরি দ্বিতীয় বছরের ১৭ রমজান বদর প্রান্তরে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

উভয় বাহিনী একে অপরের মুখোমুখি

মোশরেক বাহিনী যখন ময়দানে আবির্ভূত হয় এবং উভয় বাহিনী পরস্পরকে দেখতে থাকে, এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আল্লাহ তায়ালা, কোরায়শরা পরিপূর্ণ অহংকারের সাথে তোমার বিরোধিতায় এবং তোমার রাসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করতে এগিয়ে এসেছে। হে আল্লাহ তায়ালা, আজ তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্যের বড়ো বেশি প্রয়োজন। হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি আজ ওদের ছিন্ন ভিন্ন করে দাও।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের কাতারবন্দী করেন। তাঁর হাতে ছিলো একটি তীর। সেটির সাহায্যে তিনি কাতার সোজা করছিলেন।

বদরের যুদ্ধে আওফ বিন হারেস জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.), আল্লাহ তা'য়ালা বান্দার কোন কাজে (খুশী হয়ে) মুচকি হাসেন। তিনি বললেন, বান্দা খালি শরীরে (প্রতিরক্ষা বর্ম না পরে) নিজের হাত শত্রুর মাঝে সেঁধিয়ে দিলে এ কাজে খুশী হয়ে আল্লাহ তায়ালা মুচকি হাসেন। একথা শুনে আওফ নিজের শরীর থেকে বর্ম খুলে ফেলেন এবং তলোয়ার নিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান।

মেকদাদ বিন মা'দী কারিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "শহীদের জন্য আল্লাহর নিকট ছয়টি ফযিলত রয়েছে-

১। শহীদের সমস্ত গুনাহ মাফ।

২। কবরের আযাব থেকে তাকে সংরক্ষণ করা হয়।

৩। শেষ বিচারের দিন দুশ্চিন্তা থেকে তাকে রক্ষা করা হবে।

৪। তার মাথায় সম্মানের এমন এক তাজ রাখা হবে যার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও তার মাঝে বিদ্যমান প্রত্যেক জিনিসের চেয়ে মূল্যবান হবে।

৫। জান্নাতে ৭২ জন হুরেইনের সাথে তার বিয়ে হবে।

৬। আর সে তার সত্তরজন নিকটাত্মীয়ের জন্য সুপারিশ করবে।”

(তিরমিযী, সহীহ জামে’ তিরমিযী; আলবানী, দ্বিতীয় খণ্ড, হাদীস নং: ১৩৫৮)

আল্লাহ তা’য়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ.

অর্থ: হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? (সূরা আস্-সফ, আয়াত: ১০)

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থ: (তা এই যে), তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং জিহাদ করবে আল্লাহর পথে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; যদি তোমরা জানতে। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন জান্নাতে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং (প্রবেশ করাবেন) চিরস্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য। (সূরা আস্-সফ, আয়াত: ১১-১২)

বদরের যুদ্ধ ছিলো মুসলমান এবং মোশরেকদের মধ্যে প্রথম সশস্ত্র সিদ্ধান্তমূলক সংঘর্ষ। এতে মুসলমানরা ‘ফাতহে মুবিন’ অর্থাৎ সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করেন। সমগ্র আরব জাহান এ বিজয় প্রত্যক্ষ করেছে।

এ যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো ৩১৩ জন। অপরদিকে মক্কী বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিলো ১৩০০। এ বাহিনীর অধিনায়ক ছিল আবু জাহল।

এ যুদ্ধে মোশরেকদের ৭০ জন নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। মুসলমানদের মধ্যে ১৪ জন শাহাদাত বরণ করেন।

আল্লাহ তায়ালা বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আনফাল নাযিল করেন।

দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে মুসলমানরা প্রথমবারের মতো ঈদ উদযাপন করেন। বদরের যুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয়ের পর এ ঈদ উদযাপিত হয়েছিলো। মুসলমানদের মাথায় বিজয় ও সম্মানের মুকুট রাখার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের এ ঈদ উদযাপনের সুযোগ দেন।

উহুদের যুদ্ধ

বদর যুদ্ধে মক্কাবাসীদের পরাজয় ও অবমাননা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকের নিহত হওয়ার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিলো। এ কারণে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রোধে ফুঁসছিলো। বদর যুদ্ধের পর তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরেকটি যুদ্ধ করে নিজেদের মনের জ্বালা জুড়ানোর এবং ক্রোধ প্রশমণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

হিজরি তৃতীয় বছরের ৭ই শাওয়াল উহুদ পর্বত সংলগ্ন স্থানে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

সহীহ বোখারীতে বর্ণিত আছে, উহুদ যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোবায়ী দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং মাথায় আঘাত করা হয়। সে সময় তিনি মুখমন্ডল মুছছিলেন আর বলছিলেন, সে কওম কি করে সফল হতে পারে, যারা নিজেদের নবীর চেহারা যখম করেছে, তার দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। অথচ তিনি তাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন।

হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমরা পৌঁছে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মোবারক যখম হয়ে গেছে। শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া চোখের নীচে চেহারায় গেঁথে গেছে। আমি সেগুলো বের করতে চাইলে আবু ওবায়দা (রা.) বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে ওগুলো আমাকে বের করতে দিন। এরপর তিনি দাঁত দিয়ে একটি কড়া কামড়ে ধরে ধীরে ধীরে বের করতে লাগলেন, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম ব্যথা কম পান। শেষ পর্যন্ত তিনি একটি কড়া বের করেন। এতে হযরত আবু ওবায়দার নীচের মাঢ়ির একটি দাঁত পড়ে যায়। দ্বিতীয় কড়াটি আমি বের করতে চাইলাম, কিন্তু আবু ওবায়দা (রা.) বললেন, আবু বকর (রা.), আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে বের করতে দিন। এরপর তিনি দ্বিতীয় কড়াটিও ধীরে ধীরে টেনে বের করেন। এতে তাঁর নীচের মাঢ়ির আরেকটি দাঁত ভেঙ্গে গেলো। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের ভাই তালহাকে সামলাও। সে নিজের জন্যে জান্নাত ওয়াজেব করে নিয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এরপর আমরা হযরত তালহা (রা.)-এর প্রতি মনোনিবেশ করি। তার দেহে দশটির বেশি আঘাত লেগেছিলো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তীর নিক্ষেপ করছিলেন। হযরত কাতাদা ইবনে নো'মান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ধনুক থেকে এতো তীর নিক্ষেপ করেছিলেন, যাতে ধনুকের এক কিনারা ভেঙ্গে গিয়েছিলো।

উহুদের যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান শহীদ হন।

খন্দকের যুদ্ধ

হিজরি পঞ্চম বছরের শাওয়াল মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে ইয়াহুদী ও কোরায়শদের প্রচেষ্টায় ১০ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী মদিনার পাশে সমবেত হয়।

রাসূল (সা.) তাদের রওয়ানা হওয়ার খবর অবহিত হওয়ার সাথে সাথে সর্বোচ্চ সামরিক পরামর্শ সভার সদস্যদের সাথে বৈঠকে বসেন। হযরত সালমান ফারেসী (রা.)পরিখা খননের পরামর্শ দিলে রাসূল (সা.) এ প্রস্তাব অনুমোদন করে অবিলম্বে খননের কাজ শুরুর নির্দেশ দেন। তিনি নিজেও পরিখা খননে অংশ নেন।

দশ হাজার শত্রুসেনা তিন দিক থেকে মদিনা আক্রমণ করে। মাঝে ছিল গভীর ও প্রশস্ত খাল। তীরের লড়াই চলতে থাকে। প্রায় একমাস এ অবরোধ স্থায়ী হয়। অবশেষে আল্লাহ তা'য়ালা মোশরেকদের জোটে ভাঙ্গন, তাদের মাঝে হতাশা ও পারস্পরিক অবিশ্বাস তৈরির মাধ্যমে তাদের মনোবল ভেংগে দেন। অবরোধ তুলে নিয়ে তারা মক্কার দিকে রওয়ানা হয়। আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলিমরা বিজয় লাভ করেন।

আরব জাহানের পরিস্থিতি মুসলমানদের প্রায় অনুকূলে এসে গিয়েছিলো। পর্যায়ক্রমে ইসলামী দাওয়াতের সাফল্য এবং বড়ো ধরনের বিজয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিলো।

কোরায়শরা পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করতে পেরে হিজরি ষষ্ঠ বছরে হুদাইবিয়া নামক স্থানে মুসলমানদের সাথে একটি সন্ধি চুক্তি করতে চায়। রাসূল (সা.) এ চুক্তি গ্রহণ করেন। এ সন্ধির চুক্তিসমূহের মধ্যে একটি ছিল- উভয় পক্ষ দশ বছর যাবত যুদ্ধ বন্ধ রাখবে।

খায়বার যুদ্ধ

খায়বার ছিল ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মূল কেন্দ্র। খায়বারের অধিবাসীরাই খন্দকের যুদ্ধে সকল মোশরেক গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে সমবেত করেছিলো।

এরাই বনু কোরায়যা গোত্রের লোকদের বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্দীপিত করেছিলো।

হিজরি সপ্তম বছরের মহররম মাসে রাসূল (সা.) খায়বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

খায়বারে ছিলো ৬টি দূর্গ। এ সকল দূর্গে ছিলো ২০ হাজার ইহুদী যোদ্ধা। মুসলিম বাহিনী দূর্গগুলো অবরোধ করে। বিশদিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। অবশেষে আল্লাহ তা'য়ালা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন। এ যুদ্ধে ৯৩ জন ইহুদী নিহত হয়। ১৫ জন মুসলমান শহীদ হন।

খায়বারের জমি মুসলমানদের দখলে আসে। রাসূল (সা.) ইহুদীদের অনুরোধে তাদেরকে খায়বার থেকে নির্বাসিত না করে খায়বারের জমিতে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক মুসলমানরা পাবেন- এ শর্তে তাদেরকে খায়বারের জমি চাষাবাদের অধিকার প্রদান করেন।

মক্কা বিজয়

হিজরি অষ্টম বছরের শাবান মাসে বনু বকর গোত্র বনু খোযায়া গোত্রের উপর হামলা চালায়। কোরায়শরা এ হামলায় বনু বকর গোত্রকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে এবং এভাবে তারা হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ করে।

এ বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম উপলব্ধি করে কোরায়শরা সন্ধি নবায়নের চেষ্টা করে। তবে তা গ্রহণ করা হয় না।

হিজরি অষ্টম বছরের ১০ রমজান রাসূল (সা.) মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ১০ হাজার সাহাবী। এ অভিযানের সময় মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে উদ্যত হলে কোরায়শদের বারো জন মোশরেক নিহত হয়।

মসজিদে হারামে প্রবেশ এবং মূর্তি অপসারণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মোহাজেরদের সঙ্গে নিয়ে মসজিদে হারাম বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করেন। প্রথমে তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। এরপর তিনি কাবাঘর তাওয়াফ করেন। সে সময় তাঁর হাতে একটি ধনুক ছিলো।

কাবা ঘরের আশেপাশে এবং ছাদের ওপর সে সময় তিনশ ষাটটি মূর্তি ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের ধনুক দিয়ে সেসব মূর্তিকে গুঁতো দিচ্ছিলেন আর উচ্চারণ করছিলেন, সত্য এসেছে, অসত্য চলে গেছে, নিশ্চয়ই অসত্য চলে যাওয়ার মতো।

কোরায়শরা মসজিদে হারামে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিলো।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কোরায়শদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি বললেন, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই।

তিনি বললেন, হে কোরায়শ, তোমাদের কি ধারণা, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো বলে তোমরা মনে করো? সবাই বললো, আপনি ভালো ব্যবহার করবেন, এটাই আমাদের ধারণা। আপনি দয়ালু ভাই, দয়ালু ভাইয়ের পুত্র। এরপর তিনি বললেন, তাহলে আমি তোমাদের সে কথাই বলছি, যে কথা হযরত ইউসুফ (আ.) তার ভাইদের বলেছিলেন,

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ. اذْهَبُوْا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

'লা তাছরিবা আলাইকুমুল ইয়াওম...' "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। যাও! তোমরা মুক্ত।" (ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবীয়্যাহ, খ.৪,পৃ.৬১; কাদী 'ইয়াদ, আশ-শিফা, খ.১,পৃ.১১০)

রাসূল (সা.) হিজরতের দশম বছরে বিদায় হজ্জ পালন করেন। এই হজ্জেই রাসূল (সা.) মুসলিম উম্মতের উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত ভাষণ প্রদান করেন।

নবী (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন-

'আমি শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। আমার মাধ্যমে ওয়াহীর পরিসমাপ্তি হতে যাচ্ছে। আমি তোমাদের জন্য দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এই দুটি বস্তু আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হবেনা। একটি **আল্লাহর কিতাব** ও অপরটি **রাসূলের (সা.) সুন্নাহ**।

প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে আমার কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেয়। হতে পারে, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকবে যারা উপস্থিত শ্রোতার চাইতে আমার কথাগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারবে।'

তিনি ভাষণ শেষ করার পর আল্লাহ তা'য়ালা জিবরীল (আ.) এর মাধ্যমে কুরআনের আয়াত নাযিল করেন-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

‘আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণাংগ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।’ (সূরা মায়েদা, আয়াতঃ ৩)

‘সকল কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা মহাবিশ্বের একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহর জন্য,
যিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের রব।’
‘সালাত ও সালাম তাঁর সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম এর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর।’

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জি

১। ইযহারুল হক (ত্রিত্ববাদখন্ডন)- আল্লামা রাহমাতুল্লাহ, ইবন্ খলীলুর রহমান কীরানবী

২। খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্ব ও ইসলাম- আহমদ দীদাত

৩। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টা- ডা. জাকির নায়েক

৪। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মাদ (সা.)- ডা. জাকির নায়েক

৫। কুরআনের আলোকে বিজ্ঞান- মুহাম্মদ ইব্রাহীম

৬। বেদ-পুরাণের আলোকে শান্তির পথ- মুশাহিদ আলী চমকপুরী

৭। ধর্মগন্থের আলোকে খৃষ্টানদের জন্য জান্নাতের পথ- মুশাহিদ আলী চমকপুরী

৮। সহজ উত্তর- মুশাহিদ আলী চমকপুরী

৯। ইসলামী দণ্ডবিধি- ড. আবদুল আযীয আমের

১০। ইসলামের শাস্তি আইন- ড. আহমদ আলী

১১। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা- ড. আহমদ আলী

১২। আর-রাহিকুল মাখতুম- সফিউর রহমান মোবারকপুরী

১৩। শান্তিপথ- সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী

14. The MacArthur Daily Bible by John F. MacArthur, Jr.

15. THE NEW OXFORD ANNOTATED BIBLE. copyright 2010 by Oxford University Press, Inc.

16. THE Gospel of Buddha BY PAUL CARUS. copyright by The Open Court Publishing Co.chicago, illinois, 1894.

17. Sri Guru Granth Sahib Translated by MANMOHAN SINGH.

18. RIGVEDA-English translation by Dr. Tulsi Ram M.A., Ph.D. London, U.K.

19. YAJURVEDA-English translation by Dr. Tulsi Ram M.A., Ph.D. London, U.K.

20. THE UPANISHADS translated by F. Max Muller.
21. The Upanishads Translated by Eknath Easwaran.
22. NINE UPANISHADS with *English Translation* by Prem Nath Chadha.
23. "The Upanishads- A New Translation" by Swami Nikhilananda.
24. Kena and Other Upanishads by Sri Aurobindo.
25. The Bhagavad Gītā (Twenty-fifth Edition) Translated by WINTHROP SARGEANT. Published by State University of New York Press, Albany